প্রকাশক ঃ
শ্রীনীলোৎপল চক্রবর্ত্তী
এ সি ৬৫ সল্টলেক সিটি
সেকটর ওয়ান
কলিকাতা ঃ ৭০০০৬৪

প্রচ্ছদশিল্পী ঃ বিশ্বনাথ দাস

অলংকরণ ঃ ভূপেন সেন

প্রথম প্রকাশ ঃ ২৫শে বৈশাখ, ১৩৬৭

মুদ্রক ঃ
শ্রীগোপাল চন্দ্র পাল
স্টার প্রিন্টিং প্রেস
২১/এ রাধানাথ বোস লেন
কলিকাতা ঃ ৭০০০০৬

ভূমিকা

শ্রেষ্ঠ চীনা গল্পসংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হল। প্রথম খণ্ড বহু পূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল। দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশে অপ্রত্যাশিত বিলম্ব ঘটায় আমি দুঃখিত।

দ্বিতীয় খণ্ডের বৈশিষ্ট্য : এ-তে ল্যু স্যুন, মাও ত্যুন থেকে শুরু করে সংস্কৃতি-বিপ্লব এবং সংস্কৃতি-বিপ্লবোত্তর অত্যাধুনিক কালের লেখকদের গল্পও সঙ্কলিত করেছি। এই একটি খণ্ড হাতে নিয়ে পাঠক আধুনিক চীনা গল্প-সাহিত্যের একটি সামগ্রিক রূপরেখার সঙ্গে পরিচয় লাভ করতে সমর্থ। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য, এই সঙ্কলনে আমি নিজে সব গল্প অনুবাদ করিনি; সুযোগ্য এবং সুপণ্ডিত বিভিন্ন লেখককে দিয়ে অধিকাংশ গল্প অনুবাদ করিয়ে নিয়েছি। তৃতীয় বৈশিষ্ট্য, গল্পের শুরুতে প্রত্যেক লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দিয়েছি। চতুর্থ বৈশিষ্ট্য, প্রত্যেকটি গল্পে চীনা-শিল্পাঙ্গিকের আদলে বিভিন্ন অলংকরণ দিয়ে সাজিয়ে বইটিকে অধিকতর আকর্ষণীয় করে তুলতে চেষ্টা করেছি।

এই সঙ্কলনের গল্প অনুবাদ এবং সম্পাদনা কালে বারবার আমার মনে হয়েছে : আধুনিক চীনা-সাহিত্য 'শিল্পের জন্য শিল্প' এই কুহকে মতিভ্রান্ত নয়, 'জীবন শিল্পে' আস্থাশীল। একজন লেখকও নিছক গল্প লেখার জন্য কলম ধরতে রাজী নন। তাঁদের কলম যেন অস্ত্র। তাঁরা সর্বতোভাবে এই সত্যে নির্দ্বিধ যে : দি পেন ইজ মাইটার দ্যান দি সোর্ড। শিল্পই জীবন, কিন্তু জীবনের চেয়ে শিল্প বড়ো নয়; তাই প্রত্যেক লেখকই জীবন-শিল্পী। এই আধুনিক গল্পধারার প্রবক্তা ও শিক্ষক অবশ্যই ল্যু স্যুন। ল্যু স্যুন সাহিত্যের যে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিলেন, উত্তরসূরীরা তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন এবং সেই আদর্শ সর্বথা তাঁদের মধ্যে অনুপ্রেরণার কাজ করেছে। বক্তব্য, প্রচার-মনস্কতা, সংগ্রামী মানসিকতা ইত্যাদি ব্যাপার গল্পের শিল্পগত রসহানি না ঘটিয়ে কীভাবে গল্পে নতুন মাত্রা যোগ করতে পারে, সঙ্কলনের গল্প-

গুলি পাঠ করলে পাঠক হাড়ে হাড়ে তা টের পাবেন। এরকম তীব্র ও তীক্ষ্ণ গল্প বাংলায় মাত্র জগদীশ গুপ্ত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অল্প কয়েকজন গল্পকারের হাত থেকেই পেয়েছি। যাঁরা গল্পের মধ্যে 'জীবন' খোঁজেন, মানুষের সার্বিক কল্যাণ ও শুভের কথা ভাবেন, তাঁদের এই সঙ্কলনের গল্পগুলি যে নিবিড় উত্তাপ, উদ্দীপনা ও প্রেরণা জোগাবে তা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়।

শ্রেষ্ঠ চীনা গল্পসংগ্রহের দুটি খণ্ডে আমরা প্রাচীন ও আধুনিক চীনা গল্প-সাহিত্যের একটি সুষম ও প্রোজ্জ্বল রূপরেখা তুলে ধরতে পেরেছি বলে আমাদের বিশ্বাস। যদি কোথাও কোনো ত্রুটি ঘটে গিয়ে থাকে তার জন্য আমরা দুঃখিত। পাঠক-সাধারণের প্রীতিময় পরামর্শ পেলে পরবর্তী সংস্করণে আমরা সঙ্কলন দুটিকে সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত করতে চেষ্টা করব।

সবশেষে আমি এই গ্রন্থের প্রকাশক, মুদ্রক এবং আমার সহকারী অনুবাদকবৃন্দকে তাঁদের আন্তরিক সহযোগিতার জন্য গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই। নিবেদন ইতি—

চন্দননগর　　　　　　　　　　　　　　　　　সম্পাদক

সূচীপত্র

লু্যু সুনের জন্ম চাং চিয়াং প্রদেশের শাও-সিও-এ, ১৮৮১ সালে। মৃত্যু ১৯শে অক্টোবর, ১৯৩৬। জাপানে চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করবার সময় থেকে চীনের লাঞ্ছিত জন-মানসের মুক্তি-আকাঙ্ক্ষা তাঁকে সাহিত্য প্রাণ করে তোলে। তার সম্পর্কে মাও-সে-তুন বলেছেন, "ল্যু সুন ছিলেন একাধারে সাহিত্যিক, চিন্তাশীল ও বিপ্লবী। তিনি ছিলেন সাংস্কৃতিক বিপ্লবের নিরলস নেতা। দৃঢ়চেতা এই পুরুষ কখনো কোন চাটুকারী করতে অভ্যস্ত ছিলেন না। সামন্ততান্ত্রিক, অসামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় ল্যু সুন তাই এক দুর্লভ রত্ন। সাহিত্যকে হাতিয়ার করে জনগণের বৃহত্তম অংশের অগ্রবর্তী সৈনিকের ভূমিকা গ্রহণ করেন। এবং সাহস, প্রত্যয় ও হৃদয়ের উষ্ণতা নিয়ে ধ্বংস করেন শত্রুর অজেয় দুর্গ।" তাঁর রচিত গল্পগুলোর মধ্যে এক পাগলের ডায়েরি, আশীর্বাদ, আ-কিউ-এর আসল কাহিনী, আমার পুরনো ভিটে—অত্যন্ত সুখ-পাঠ্য।

পাগলের রোজনামচা



ল্যু সুন

দুই ভাই—প্রয়োজন নেই বলে এখানে তাদের নাম উল্লেখ করছি না। হাইস্কুলে পড়ার সময় তাদের দুজনের সঙ্গেই আমার বন্ধুত্ব হয়েছিল। কিন্তু বহু বছরের অদর্শনে ধীরে ধীরে আমাদের মধ্যে একটা ব্যবধান গড়ে ওঠে; যোগাযোগ ছিল না। কিছুদিন আগে আমি লোকমুখে শুনি যে তাদের একজন গুরুতর অসুস্থ। আমি আমার দেশের বাড়িতেই তখন ফিরছিলাম, যাত্রাবিরতি করে তাদের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। গিয়ে তাদের একজনের দেখা পেলাম এবং তার কাছেই শুনলাম যে তারই ছোটভাই অসুস্থ হয়েছিল।

"আমাদের সঙ্গে দেখা করার জন্যই এতটা রাস্তা পার হয়ে এসেছো জেনে বড় খুশী হলাম," বলল সে, "কিন্তু কিছুদিন আগে আমার ভাই সুস্থ হয়েছে এবং সে এখন সরকারী চাকরী নিয়ে এক জায়গায় গেছে।"

তারপর সে হেসে তার ভাইয়ের ডায়েরীর দুটো খণ্ড দেখালো আমাকে। বলল যে, এ থেকেই তার ভাই-এর যে অসুখ হয়েছিল তার প্রকৃতি বোঝা যাবে। এবং সে আরও বলল, এক পুরোনো বন্ধুকে ডায়েরী দেখানোয় কোন ক্ষতি নেই।

সে ডায়েরী আমি নিলাম এবং পড়লাম আদ্যোপান্ত। পড়ে বুঝলাম যে, সে এক বিশেষ ধরনের মানসিক নির্যাতন ভোগ করছিল। বিভ্রান্তি-কর এবং অসংলগ্ন তার লেখা এবং অনেক লাগাম-ছাড়া মন্তব্য সে করেছে। তাছাড়া সে কোন তারিখ দিতেও ভুলে গেছে। শুধু বিভিন্ন রঙের কালি এবং লেখার তারতম্য থেকে বোঝা যায় যে পুরোটা একবারে লেখা নয়। তা সত্ত্বেও কিছু কিছু অংশ পুরোপুরি খাপছাড়া নয় এবং তার অংশবিশেষ টুকে রাখলাম যা ভবিষ্যতে চিকিৎসা-বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণার বিষয়বস্তু হতে পারে। আমি তার লেখার কোন অযৌক্তিক অংশও বাদ দিলাম না, কেবলমাত্র নামগুলি পাল্টে দিলাম যদিও উল্লিখিত মানুষগুলি সবাই গ্রামের সাধারণ মানুষ, যারা এ পৃথিবীতে অখ্যাত, এবং এই নাম-পরিবর্তনের কোন তাৎপর্যও নেই। এ লেখার নামকরণও ডায়েরী-লেখকের এবং সে সুস্থ হবার পর এই নামকরণ করেছে। আমি তা আর পাল্টালাম না।

১.

ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় আলোকিত আজকের রাত। ত্রিশ বছরেরও বেশী হবে, এমন উজ্জ্বল চাঁদ আমি দেখিনি। তাই আজ যখন দেখলাম ঐ চাঁদ, আমার অন্তরে অনুভূত হলো এক অনন্য প্রেরণা। টের পেতে শুরু করি যে বিগত ত্রিশ বছর ধরে আমি এক তমসায় আবৃত ছিলাম। কিন্তু এখন? এখন আমাকে ভীষণ সতর্ক হতে হবে। আচ্ছা, কেন চাও-বাড়ির কুকুরটা আমার দিকে তাকিয়েছিল? এবং দুবার! আমার ভয় পাবার যুক্তি আছে।

২.

আজ আকাশে চাঁদ নেই, আদৌ নেই। আমি জানি, চাঁদের এই অনুপস্থিতির জন্যই আমি অসুস্থ হতে পারি।

আজ সকালে যথেষ্ট সতর্ক হয়ে বেরিয়েছিলাম। দেখলাম এক অদ্ভুত চোখে মিঃ চাও আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। দেখে মনে হলো যেন তিনি আমাকে দেখে ভয় পেয়েছেন বা তিনি আমাকে খুন করতে চান। আরও সাত আট জন ছিল। তারা আমার সম্পর্কে ফিসফিস করে কি যেন বলছিল। তবে আমি যে তাদের দেখছি তা বুঝতে পেরে বেশ ঘাবড়ে গেল তারা। রাস্তায় আজ যে কজন লোক দেখেছি সবাই একই রকম, ওদের মতো। ওদের মধ্যে ভয়ঙ্করতম যে সে আমার দিকে তাকিয়ে দাঁত বার করে হাসল। তাই দেখে আমার সারা শরীর কেঁপে উঠল এবং বুঝলাম তাদের সব আয়োজন শেষ।

আমি কিন্তু তা সত্ত্বেও ভয় পাইনি। এবং সেই পথেই হেঁটে গেলাম। সামনে একগুচ্ছ বাচ্চা ছেলেমেয়ে চোখে পড়ল। তারাও আমার কথা আলোচনা করছিল। এবং তাদের চোখের চাহনি মিঃ চাও-র মতো। তাদের সব কজনের মুখও ভয়ানক পাণ্ডুর। আমি বুঝে পাই না এই বাচ্চাগুলোর আমার ওপর কী রাগই বা থাকতে পারে? আমি চিৎকার করে বললাম তাদের, "আমাকে বলো" এবং না বলে পারলাম না।

কিন্তু তারা সবাই দৌড়ে পালাল।

আমি অবাক হয়ে ভাবি, কেন মিঃ চাও আমার ওপর চটা? রাস্তার ঐ লোকগুলোই বা কেন ক্ষেপে আছে আমার ওপর? আমি তো কিছুই করিনি। একবার অবশ্য, বছর কুড়ি আগে, কু চিউর[১] কাগজপত্র আমি পা দিয়ে সরিয়েছিলাম—পুরোনো হিসাবপত্রের কাগজ। এবং কু তাতে দারুণ অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। চাও কিন্তু কু-কে চেনেন না। তবে, নিশ্চয়ই তিনি এ কথাটা কারো কাছে শুনেছেন এবং সেজন্য প্রতিশোধ নিতে চান। আর তাই তিনি তাঁর চক্রান্তে রাস্তার ঐ লোকগুলোকে পর্যন্ত টেনেছেন। কিন্তু শিশুরা কেন এই ষড়যন্ত্রে? ওদের কেউতো তখনও জন্মায়নি, তাহলে? তাহলে তারা কেন অমন অদ্ভুত চোখে আজ

আমার দিকে তাকিয়েছিল ? তারা কি ভয় পেয়েছিল আমাকে দেখে, নাকি তারাও আমাকে খুন করতে চায় ?

ওরা সত্যি আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে। আমি হতভম্ব এবং বিপর্যস্ত বোধ করছি।

বুঝেছি ! ওরা নিশ্চয়ই ওদের বাবা-মার কাছে সব শুনেছে !

রাতে আমার ঘুম আসে না।

যদি ব্যাপারটা কেউ বুঝতে চায় তাহলে তাকে তা খুব ভালো করে খতিয়ে দেখতে হবে।

কাল যে লোকগুলোকে দেখলাম তাদের মধ্যে কাউকে কাউকে ম্যাজিস্ট্রেট আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে, কাউকে কাউকে স্থানীয় ভদ্রলোকেরা গালে চাপ্পড় মেরে অপমান করেছে। তাদের কারো কারো বউকে ধরে নিয়ে গেছে পেয়াদায় আর কারো কারো বাপ-মা পাওনাদারের তাড়ায় অবশেষে আত্মহত্যা করেছে। সে সব দুর্দিনেও তাদের মুখে কালকের মতো আতঙ্কের ছায়া ছিল না। তাদের চোখে কাল যে হিংস্রতা দেখেছি সেই সব দিনেও ছিল না সে-হিংস্রতা।

কাল রাস্তায় যে ঘটনাগুলি ঘটতে দেখেছি তার মধ্যে সবচেয়ে অস্বাভাবিক সেই মহিলার আচরণ। মহিলাটি তার ছোট্ট ছেলেটার গালে চড় মেরে বলল, "শয়তান ! তোর শরীরের মাংস কয়েক খাবলা ছিঁড়ে নি যদি তবে গে' আমার হাড় জুড়োয়।" বলছিল বটে তার ছেলেকে কিন্তু সারাটা সময় চোখ ছিল আমার দিকে। আমি নিজেকে সামলাতে পারিনি, আচমকা দোড় শুরু করি এবং তাই দেখে সবুজমুখো, দাঁতাল লোকগুলো হাসতে শুরু করল, মজা আর কি। চেনবুড়ো ঝট-পট এগিয়ে এলো এবং আমাকে বাড়ি পৌছে দিল।

সে একরকম জবরদাস্তি করেই আমাকে বাড়ী পৌছে দিল।

আমার বাড়ীর লোকেরা এমন ভাব করল যেন চেনেই না আমাকে। অন্য সবার চাহনি এবং তাদের চাহনিতে কোন তফাত ছিল না, একই। আমি আমার পড়ার ঘরে ঢোকা মাত্র তারা বাইরে থেকে সে ঘরে তালা লাগিয়ে দিল। যেন তারা কোন মুরগী বা হাঁসকে খোঁয়াড়ে পুরল। এ ঘটনায় আমি আরও হতভম্ব হয়ে পড়লাম।

নেকড়ে-শাবক গ্রাম থেকে কিছুদিন আগে আমাদের এক প্রজা এসেছিল। সে আমার দাদাকে বলছিল শস্যহানির কথা। কথায় কথায় সে বলল তাদের গ্রামের একটি কুখ্যাত লোকের কথা যাকে তাদের গ্রামের লোক পিটিয়ে মেরেছে। শুধু তাই না, তাকে মেরে ফেলার পর কিছু লোক তার হৃৎপিণ্ড আর যকৃৎ ছিঁড়ে নিয়ে তেলে ভেজে খেয়েছে এবং এটা নাকি সাহস বাড়ানোর একটা পদ্ধতি—সেজন্য তারা তা করেছে। যখন এসব কথায় বাধা দিয়ে আমি কিছু বলতে গেছিলাম সেই প্রজাটি এবং দাদা দুজনেই সেদিন আমার দিকে তাকিয়েছিল অদ্ভুত দৃষ্টিতে। আজ বুঝতে পারছি যে রাস্তার লোকগুলো আজ আমার দিকে যেভাবে তাকিয়েছিল তেমনই অদ্ভুতভাবে দাদারা সেদিন তাকিয়েছিল আমার দিকে।

চিন্তাটা মাথায় আসা মাত্র আমার মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত ভীষণ কেঁপে উঠল।

ওরা মানুষ খায়, অতএব ওরা আমাকেও খেতে পারে। সেই মহিলা যে বলল "তোর শরীরের মাংস কয়েক খাবলা ছিঁড়ে নি যদি" এবং সেই সবুজমুখো দাঁতাল লোকগুলোর হাসি আর সেদিনের সেই প্রজার গল্প—সবই আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি, সবই গূঢ় সংকেত। আমি বুঝতে পারছি তাদের কথাতে বিষ লুকিয়ে আছে, হাসিতে লুকিয়ে আছে ছুরি। তাদের দাঁতগুলো সব সাদা, ঝকঝকে এবং তারা সবাই নরখাদক।

আমার মনে হচ্ছে, (যদিও আমি লোক খারাপ না), যেদিন আমি মিঃ কুর হিসেবের কাগজপত্র পা দিয়ে মাড়িয়েছিলাম সেদিন থেকেই এই তৎপরতার শুরু। মনে হয় তারা কিছু গোপন করতে চায়। আমি সঠিক অনুমান করতে পারছি যে তা নয়, তবু মনে হচ্ছে। এবং ওরা তো একবার ক্ষিপ্ত হলেই যে কোন লোককে বদলোক আখ্যা দিতে পারে।

আমার মনে পড়ে, আমার দাদা আমাকে রচনা লেখা শেখাত। আমি যদি কোন ভালো লোকেরও—সে যত ভালোই হোক না কেন, বিরোধিতা করে কোন রচনা লিখতাম তাহলে দাদা সে লেখাটার নানা জায়গায় দাগ দিত। এভাবেই বোঝা যেত যে দাদা সে লেখাটা অনুমোদন করেছে। আমি যখন কোন বদলোককে আমার রচনায় ক্ষমা করতাম তখন দাদা বলত, "চমৎকার। তোমার মৌলিকতা এতে ফুটেছে বেশ।"

ওরা গোপনে কী ভাবছে, আমি তা কেমন করে জানাব—বিশেষতঃ ওরা যখন নরমাংস খেতে প্রস্তুত ?

যদি সত্যি কেউ বুঝতে চায় ব্যাপারটা তবে তাকে তা খুব ভালো করে খতিয়ে দেখতে হবে।

প্রাচীন কালে, আমার যদ্দূর মনে পড়ে, লোকে প্রায়শঃই নরমাংস খেত। তবে এ বিষয়ে আমার কোন স্পষ্ট ধারণা নেই। আমি পিছু ফিরে দেখার চেষ্টা করি, স্মৃতি হাতড়াই। কিছু ইতিহাসের সন-তারিখের পারম্পর্য আমার মনে থাকে না। স্মৃতি হাতড়ে দেখি, সব পাতা জুড়ে অস্পষ্ট অক্ষরে লেখা শুধু দুটি শব্দ : "মহত্ব এবং নীতি।"

আমার ঘুম আসে না এবং সেজন্য ইচ্ছে করেই আমি মাঝরাত অব্দি বই পড়ে কাটাই। পড়ি যতক্ষণ না লেখাগুলো তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়, যতক্ষণ না সারা বইজুড়ে সেই শব্দ দুটো কিলবিল করে। সেই শব্দ দুটো : "নরমাংস খায়।"

বইয়েব সব কটি শব্দ, সেই প্রজার মুখে উচ্চারিত সব শব্দ, আমার দিকে তাকিয়ে থাকে আর হাসে—দুর্বোধ্য হাসি।

আমিও তো একটা মানুষ এবং তারা আমাকে খেতে চায় !

৪.

সকালে খুব শান্ত হয়ে কিছুক্ষণ বসে ছিলাম। চেনবুড়ো দুপুরের খাবার নিয়ে এলো—এক বাটি সবজি, এক বাটি ভাপানো মাছ। মাছের চোখদুটো কি সাদা আর শক্ত এবং ঐ হ্যাঁ-করা মুখটা সেই লোকগুলোর

মতো যারা নরমাংস খেতে চায়। কয়েক গ্রাস মুখে তোলার পর আমি বুঝলাম কি খাচ্ছি—মাছ না মানুষের মাংস? বমি করে ফেললাম।

চেনবুড়োকে বললাম, "দাদাকে বল, এখানে আমার একেবারে দম-বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আমি বাগানে একটু বেড়াতে চাই।"

কিছু না বলে বেরিয়ে গেল চেনবুড়ো এবং ফিরে এলো সে একটু পরেই। দরজা খুলে দিল।

নড়লাম না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম ওরা আমার প্রতি কেমন আচরণ করে এবং নিশ্চিত বুঝলাম, ওরা ছাড়বে না। আমি সুনিশ্চিত। আমার দাদা এলো এবং তার পিছু পিছু এক বুড়ো। সে বুড়োর চোখে এক খুনে দৃষ্টি এবং পাছে তা আমার নজরে আসে সেই ভয়ে সে মাথাটা নামিয়ে নিল। চশমার ফাঁক দিয়ে চোরা চাহনিতে সে আমার দিকে তাকাচ্ছিল।

"মনে হচ্ছে যেন আজ তুমি বেশ ভালো আছো," দাদা বলল। আমি বললাম, "হ্যাঁ।"

"মিঃ হোকে আমি আজ ডেকেছি", দাদা বলল, "তোমাকে পরীক্ষা করে দেখার জন্য।"

"বেশ তো," বললাম আমি।

প্রকৃতপক্ষে আমি পরিষ্কার জেনে গেছি যে এই বুড়ো লোকটাই ছদ্মবেশী ঘাতক।

ও যে আমার নাড়ী পরীক্ষা করছিল সেটা নিছকই ভান। আসলে ও দেখছিল কত মোটা আমি। কেননা আমাকে খুন করার জন্য ও-ও তো আমার মাংসের ভাগ পাবে। তবু আমি ভয় পাইনি। আমি যদিও নরমাংস খাই না তবু আমার সাহস ওদের চেয়ে বেশী। মুষ্টিবদ্ধ হাত দুটো ওর দিকে এগিয়ে দিলাম কি করে তা দেখার জন্য। বুড়ো মানুষটা পাশে বসল, চোখ বুঁজে কিছুক্ষণ নাড়ী খুঁজল এবং তারপর কিছুক্ষণ নির্বাক রইল। খানিকক্ষণ পর সে চোখ মেলল—ধূর্ত চোখ।

সে বলল, "ভেবে ভেবে অধীর হোয়ো না। কয়েকদিন শান্ত হয়ে বিশ্রাম নাও, দেখবে ঠিক সুস্থ হয়ে উঠবে।"

"ভেবে ভেবে অধীর হোয়ো না!. কয়েকদিন শান্ত হয়ে বিশ্রাম নাও !"—অর্থাৎ কিনা শরীরে আমার আরও মাংস জমুক এবং তাহলে স্বাভাবিকভাবেই তারা আরও বেশী খাবার পাবে। কিন্তু তাতে আমার কোন্ উপকার হবে এবং সে আবার কোন্ দেশী 'ঠিক হওয়া' ?

এরা সবাই মানুষের মাংস খেতে চায় এবং একই সঙ্গে এরা চোরের মতো মুখ মোছার চেষ্টা করে। দ্রুত কিছু করার সাহস এদের নেই। দেখে শুনে হাসিতে আমার পেট ফেটে যাবার জোগাড়। আমি এতই মজা পেলাম এদের দেখে যে হোহো করে হেসে উঠলাম। আমি জানি আমার হাসিতে ফুটে উঠল সাহস এবং চারিত্রিক দৃঢ়তা। দাদা এবং বুড়ো লোকটার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। আমার সাহস আর চারিত্রিক দৃঢ়তা দেখে তারা বেশ ঘাবড়েই গেল।

কিন্তু আমি সাহসী বলেই তো আমাকে খেতে ওরা আরও বেশী উৎসুক এবং ওরা ভাবছে আমার মাংস খেলে আরও সাহস ওরা অর্জন করবে। বুড়ো লোকটা দরজার বাইরে গেল। কিছুটা দূরে গিয়ে নিচুস্বরে দাদাকে বলল, "একবারে খেতে হবে।" এবং দাদা মাথা নাড়ল। তার মানে দাদাও এই দলে! এই আবিষ্কার, এই দারুণ আবিষ্কার আমাকে আহত করল। এবং এমনটা তো আমি আশংকা করেইছিলাম। তবু, আমাকে খাবার ষড়যন্ত্রকারী আমারই দাদা !

নরমাংস-খাদক আমার দাদা !

আমি এক নরমাংস- শিকারীর ছোটভাই !

আমার মাংস ওরা খাবে! কিন্তু, সে যা হোক, আমি একজন নরখাদকের ছোটভাই !

৫.

এ ক'দিন ধরেই আমি নতুন করে ভাবছি। ধরা যাক, বুড়ো লোকটা ছদ্মবেশী ঘাতক নয়, সত্যি একজন ডাক্তার। তা যদি হয়ও, তবু সে নর-মাংস খাদক। ওর পূর্বসূরি লি শি-চেনের[২] লেখা ঐ যে ভেষজ বিজ্ঞানের বইটা, তাতে তো স্পষ্ট লেখা আছে যে মানুষের মাংস সেদ্ধ করা যায়

এবং খাওয়াও যায়। তবে? এর পরেও কি সে বলতে পারে যে সে নরখাদক না?

আমার দাদার ব্যাপারটা কী? তাকে আমার সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ আছে। যখন সে আমাকে পড়াত, সে নিজের মুখে একদিন আমাকে বলেছে, "খাওয়ার জন্য লোকেরা নিজেদেব সন্তান নিজেদের মধ্যে বদলা-বদলি করে।"

এবং একবার একটি খারাপ লোকের আলোচনাপ্রসঙ্গে সে বলেছিল, "শুধু খুন নয়, ওর ছাল-চামড় তুলে ডুগডুগি বাজানো উচিত এবং ওর মাংস ছিঁড়ে খাওয়া উচিত[৩]।"

আমি তো তখনও ছোট এবং একথা শুনে আমার হৃদস্পন্দন বেশ কিছুদিনের জন্য বেড়ে গিয়েছিল। সেদিন আমাদের সেই প্রজাটি যখন বলছিল যে তাদের নেকড়ে-শাবক গ্রামের লোকে একটি লোকের হৃৎপিণ্ড আর যকৃৎ খেয়েছে তখন দাদা সে গল্প শুনে বিস্মিত তো হয়ইনি বরং ঘাড় নাড়ছিল থেকে থেকে। স্পষ্টতঃই সে তখনও যেমন ছিল এখনও তেমনই নিষ্ঠুর। সন্তান বদলাবদলি করে যদি খাওয়া সম্ভব হয় তবে তো কিছুই অসম্ভব নয় এবং সকলেই খাদ্য হতে পারে। আগে দাদা যা বোঝাত তাই বুঝতাম, এখন তো তা নয়। এখন তো আমি জানি যে যখন ও আমাকে বোঝাত এইসব তখন ওর দাঁতের ফাঁকে লেগে থাকত মানুষের চর্বির টুকরো। সে মনপ্রাণ দিয়ে খেত নরমাংস।

গাঢ় অন্ধকার। আমি জানি না এখন দিন না রাত। চাও-বাড়ির কুকুরটা ফের চিৎকার শুরু করেছে।

একটা সিংহের হিংস্রতা, একটা ইঁদুরের ভীরুতা, একটা শেয়ালের ধূর্ততা……

৭.

আমি ওদের পদ্ধতি জানি। ওরা সরাসরি কাউকে খুন করতে চায় না। সে সাহসও তাদের নেই, কেননা সরাসরি খুনের পরিণাম সম্পর্কে তারা ভীত। তার বদলে তারা একটা চক্র গড়েছে, সর্বত্র ফাঁদ পেতেছে এবং এমনভাবে তারা চাপ দিচ্ছে যাতে আমি নিজেই নিজেকে মেরে ফেলি। সেদিন রাস্তায় সেই লোকগুলো এবং মহিলাদের যে আচরণ, এবং গত কয়েকদিন আমার দাদার যে আচরণ, তা থেকে সবই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। ওরা সবচেয়ে বেশী খুশী হয় যদি একটা লোক নিজেই নিজের কোমরের বেল্টের সাহায্যে গলায় ফাঁস দিয়ে কড়িকাঠে ঝুলে পড়ে। তাহলে তাদের মনস্কামনা পূর্ণ হয়, আবার এজন্য তাদের কেউ খুনী বলে অপবাদ দিতেও পারে না। এমনটা যদি ঘটে তাহলেই তারা প্রাণ খুলে হাসতে পারে। অথবা, ভীত বা আতঙ্কিত হয়ে একটা লোক যদি শুকিয়েও মরে, তাতেও তারা প্রীত হতে পারে।

তারা শুধু মৃতের মাংস খায়। কোথায় যেন পড়েছি এক বন্য জন্তুর কথা। কুৎসিত তার দৃষ্টি, নাম হায়েনা। হায়েনা মৃতের মাংস খায় প্রায়ই। বড় বড় হাড়ও সে চিবিয়ে গুঁড়ো করে, এবং গেলে। ওঃ, সে কথা ভাবতেও শিউরে ওঠে শরীর। হায়েনা নেকড়ের সগোত্র এবং নেকড়ে হিংস্র শ্বাপদ গোষ্ঠীভুক্ত। সেদিন চাও বাড়ীর কুকুরটা বারবার আমার দিকে তাকাচ্ছিল। স্পষ্টতঃই ওটাও এই চক্রান্তে আছে। আর বুড়ো লোকটা মাথা নামিয়ে ফেলেছিল ঠিকই, কিন্তু আমাকে ঠকাতে পারেনি।

তবে সবচেয়ে নিন্দার্হ আমার দাদা। সেও তো একটা মানুষ, তবে সে ভীত নয় কেন? সে কেন আমাকে খুন করার চক্রান্তে অন্যদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে? লোকে এ কাজ করে যখন অভ্যস্ত হয়ে যায় তখন তারা আর এ কাজটাকে অপরাধ বলে গণ্য করে না? নাকি, তার হৃদয় এতই নির্মম হয়ে গেছে যে সে জেনেশুনেও আর অন্যায় কাজে পিছপা নয়?

ঐ সব নরখাদকদের অভিসম্পাত দিতে হবে, নিরস্ত্র করতে হবে এবং আমি জানি এ নিয়ে দাদার সঙ্গে এবার আমার লাগবে।

আসলে যুক্তি দিয়ে যদি ওদের বোঝানো যেত তাহলে তো হতোই, অনেক আগেই হতো।

হঠাৎ একজন ঘরে ঢুকল। বয়স তার বছর কুড়ি মাত্র এবং তার চেহারাটা আমি খুব স্পষ্ট দেখতে পেলাম না। তার মুখে একটা মৃদু হাসি। সে যখন আমাকে নমস্কার করল তখন ঐ হাসিটা দেখলাম এবং দেখে হাসিটা আসল বলে মনে হলো না। ওকে জিজ্ঞেস করলাম, "নরমাংস খাওয়া ভালো কী?"

সে হাসিমুখে জবাব দিল, "দুর্ভিক্ষ তো দেখা দেয়নি তবে কেন মানুষ নরমাংস খাবে?"

তদ্দণ্ডেই বুঝলাম, এও তাদেরই একজন। তবু সাহস সঞ্চয় করে ঐ প্রশ্নটা আবার করলাম, "এটা উচিত কী?"

"এ প্রশ্ন করছেন কেন? আপনি সত্যিই···, মজাদার লোক···, আজকের দিনটা খুব সুন্দর।"

"সত্যি সুন্দর এবং কী উজ্জ্বল চাঁদ! কিন্তু আমি জানতে চাই, এটা উচিত কী?"

তাকে বেশ বিব্রত দেখাল, বিড়বিড় করে উত্তর দিল, "না ...."

"না? তাহলে এখনও তা খায় কেন তারা?"

"আপনি কী বলছেন?"

"আমি কী বলছি? নেকড়ে-শাবক গ্রামের লোকেরা আজকাল নরমাংস খাচ্ছে এবং বই খুললে তুমি দেখতে পাবে, তাজা লাল-কালিতে লেখা আছে, সব পাতায়।"

তার মুখের চেহারা পাল্টে গেল, ভীষণ বিবর্ণ দেখাল তাকে।

"হতে পারে," সে বলল, যাই হোক, সব সময়ই এরকম কিছু ঘটে···"

"সব সময় ঘটে এরকম—তাবলে এটা ঠিক কী?"

"আমি আপনার সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলতে চাই না। যাই হোক না কেন, এ বিষয়ে কথা বলবেন না। যারা এ নিয়ে আলোচনা করে তারা ঠিক করে না।"

আমি লাফিয়ে উঠলাম এবং ভালো করে তাকে দেখার আগেই সে উধাও হয়ে গেল। আমার সারা শরীর ভিজে গেল ঘামে। লোকটা আমার দাদার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। কিন্তু সেও এর মধ্যে আছে। নিশ্চয়ই ওর বাবা-মা ওকে এই শিক্ষা দিয়েছে। এবং আমার আশঙ্কা ও ইতোমধ্যে ওর ছেলেকেও তা শিখিয়েছে। সেজন্যই শিশুরাও ও-ভাবে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল।

৯.

নরমাংস খেতে চায়, অথচ ভয়—তারা নিজেরাই বুঝি অন্যের খাদ্য হয়ে যায়। ওরা সবাই সবার দিকে তাকায় গভীর সন্দেহ নিয়ে......

এই বাতিক থেকে যদি ওরা মুক্তি পেত কী সুন্দর জীবনই না ওদের হতো! স্বচ্ছন্দে ঘুরতো, ফিরতো, খেতো, ঘুমোতো। ওদের তো মাত্র এই একটি কাজই করার আছে। তবু বাপ-ছেলে, স্বামী-স্ত্রী, ভাই, বন্ধু, শিক্ষক-ছাত্র, জাত শত্রু, এমনকি বিদেশীরাও এই চক্রান্তে যোগ দিয়েছে এবং একে অন্যকে অন্য পথে যেতে বাধা দিচ্ছে, নিরুৎসাহিত করছে।

১০.

আজ ভোরে আমি দাদাকে খুঁজতে বেরিয়েছিলাম। হলঘরের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে দাদা তখন আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিল। আমি তার পেছনে গিয়ে দাঁড়ালাম—দরজা আর দাদার মাঝখানে। খুব শান্ত ও ধীর গলায় আমি তাকে বললাম, "দাদা, তোমাকে আমার কিছু কথা বলার আছে।"

"বেশ, বল কী বলবে ?" আমার দিকে ফিরে মাথা নেড়ে দাদা জিজ্ঞেস করল।

"খুব সামান্য কথা, কিন্তু বলাটা খুব শক্ত। দাদা, শুরুতে সম্ভবতঃ সমস্ত আদিম মানুষই নরমাংস খেত। পরে, যেহেতু তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টায়, তাদের কেউ কেউ খাওয়া বন্ধ করে এবং যেহেতু তারা চেষ্টা করে ভালো হবার, তাই তারা মানুষ হয়ে ওঠে—মানুষের মতো মানুষ ; কিন্তু কেউ কেউ এখনও খায়—ঠিক সরীসৃপের মতো। বিবর্তনের গুণে কেউ কেউ মাছ, পাখি, বানর এবং অবশেষে মানুষ হয়েছে। কিন্তু যেহেতু ভালো হবার চেষ্টাই করেনি, এখনও কিছু মানুষ সরীসৃপই থেকে গেছে। যারা নরমাংস খায় তারা যখন যারা খায় না তাদের সঙ্গে নিজেদের তুলনা করে—তাদের কি দারুণ লজ্জা পাবার কথা, তাই না ? ঠিক যেমন বানর দেখে সরীসৃপ লজ্জা পায়।

অনেক কাল আগে ই য়া নিজের ছেলের মাংস সেদ্ধ করে খাইয়েছিল চিয়ে এবং চৌকে—সেই পুরোনো গল্পে আছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টির শুরু থেকে—সেই যখন পান কু স্বর্গ ও মর্ত্য রচনা করলেন, তখন থেকে মানুষ একে অন্যকে খাচ্ছে। ই য়া-র ছেলের গল্প কাল থেকে শু শি-লিনের যুগ পর্যন্ত[৪] এবং শু শি-লিনের যুগ থেকে নেকড়ে-শাবক গ্রামে ধরা-পড়া লোকটির কাল পর্যন্ত বিস্তৃত এ ইতিহাস। গতবছর তারা এ শহরে একটা অপরাধীকে হত্যা করল এবং একজন রক্তচোষা একটুকরো পাঁউরুটি সেই লোকটির রক্তে ভিজিয়ে চুষে খেল।

তারা এখন খেতে চায় আমাকে। অবশ্য তুমি একা কিছুই করতে পার না কিন্তু তুমি ওদের সঙ্গেই বা হাত মেলাবে কেন ? ওরা নরখাদক, ওরা সবই পারে। ওরা যদি আমাকে খায়, তোমাকেও খেতে পারে। কিন্তু তোমরা যদি তোমাদের পথটা পাল্টাও তাহলে তো সকলেই শান্তি পায়। যদিও স্মরণাতীত কাল থেকে এটা হয়ে আসছে, তবু আজ থেকে আমরা সবিশেষ চেষ্টা করতে পারি এবং আমরা বলতে পারি, এ সব আর চলবে না ! আমি নিশ্চিত যে তুমি এরকমটা বলতে পারো। এই তো সেদিন যখন আমাদের প্রজাটি তার খাজনা কমাতে

চাইল তুমি বললে, এটা করা যাবে না।

প্রথমে দাদা শুধুমাত্র ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসছিল। তারপর তার চোখে দেখলাম এক খুনে হাসি এবং যখন আমি তার গোপন কথা ফাঁস করে দিলাম তার মুখটা রক্তশূন্য হয়ে গেল।

ফটকের বাইরে একদল লোক দাঁড়িয়ে ছিল এবং তাদের মধ্যে মিঃ চাও এবং তার কুকুরটাও ছিল। তারা সবাই ভিতরে আসার জন্য গুঁতোগুঁতি করছিল। আমি তাদের সবার মুখ দেখতে পাচ্ছিলাম না কেননা বেশ কিছু মুখ মুখোশ-আঁটা মনে হচ্ছিল এবং কেউ কেউ খুব চেষ্টা করছিল হাসি চাপার—সেই মুখগুলো বিবর্ণ পাণ্ডুর। আমি জানি এরা সকলেই একই পথের পথিক, সকলেই নরখাদক। কিন্তু আমি এও জানি এরা সবাই একভাবে ভাবে না। এদের মধ্যে একদল ভাবে, যেহেতু বরাবরই মানুষে মানুষের মাংস খায়, এখনও খাওয়া উচিত। অন্যদল ভাবে যে মানুষের মাংস তাদের খাওয়া উচিত নয়, তবু তারা তা খেতে চায়। এবং তাদের ভয় পাছে লোকে তাদের নিগূঢ় কথাটি আবিষ্কার করে ফেলে। তাই তারা যখন আমার বক্তব্য শুনল, ভীষণ ক্রুদ্ধ হলো ঠিকই, কিন্তু তবু ঠোঁট চেপে বিদ্রূপের হাসি হাসল।

হঠাৎ দাদা রাগে একেবারে অগ্নিশর্মা হয়ে চিৎকার করে বলে উঠল: "বেরিয়ে যান সবাই এখান থেকে, বেরোন! পাগলকে দেখার কী আছে?"

তখন আমি তাদের ধূর্ততার কিছুটা টের পেলাম। এরা কখনই নিজেদের পাল্টানোর চেষ্টা করবে না এবং তাদের পরিকল্পনা তারা ছকে ফেলেছে। এরা আমাকে চিহ্নিত করেছে পাগল হিসেবে। ভবিষ্যতে যখন আমাকে খাওয়া হবে তখন তা নিয়ে কোন গোলমাল তো হবেই না, এবং লোকেরা সম্ভবতঃ এজন্য এদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে। আমাদের প্রজাটি যে বলছিল যে তাদের গাঁয়ের লোক একটা বদ-লোককে খেয়ে ফেলেছে—ঐ, সেও ঐ একই পদ্ধতি। এই তাদের পুরোনো প্যাঁচ।

চেনবুড়োরও মেজাজ বিগড়েছিল, সেও এল, কিন্তু তারা কেউ আমার মুখ বন্ধ করতে পারল না। ঐ লোকগুলোকে আমায়

বলতেই হলো :

"আপনাদের অবশ্যই দরকার পরিবর্তনের, অন্তরের পরিবর্তন !" আমি বললাম।—"আপনাদের অবশ্যই জানা দরকার যে আগামী দিনের পৃথিবীতে নরখাদকদের কোন স্থান নেই। আপনারা যদি নিজেদের না শোধরান, এমনও হতে পারে যে আপনারা সকলেই একে অন্যের খাদ্য হবেন। যদিও জন্ম নিচ্ছে অসংখ্য তবু সত্যিকারের মানুষেরা এদের বিদেয় করবে—যেমন শিকারীরা নেকড়েদের সাবাড় করে। ঠিক যেভাবে সরীসৃপ সাবাড় হয়ে যাচ্ছে।"

চেনবুড়ো হাটিয়ে দিল সবাইকে। দাদা কোথায় গা-ঢাকা দিল। চেনবুড়ো আমাকে উপদেশ দিল নিজের ঘরে যাওয়ার জন্য।

ঘরটায় গাঢ় অন্ধকার। আমার মাথায় ওপরে কেঁপে উঠল ঘরের কড়ি-বরগা। কিছুক্ষণ কাঁপার পর সেগুলি হয়ে উঠল বিশাল এবং সেগুলি আমার ঘাড়ে চেপে বসল। ওজন এত বেশী যে আমি নড়তে পারলাম না। তারা এমন চাপ সৃষ্টি করেছিল যেন আমি মরেই যাই। কিন্তু আমি জানতাম যে জোরটা মিথ্যে তাই আমি লড়ে গেলাম। সারা শরীর ভিজে গেল ঘামে। তবু আমাকে বলতেই হলো :

"আপনাদের অবশ্যই এক্ষুনি দরকাব পরিবর্তনের, অন্তরের পরিবর্তন। আপনাদের অবশ্যই জানা দরকার যে আগামী দিনের পৃথিবীতে নর-খাদকদের কোন স্থান নেই······"

খাবার কাঠি আমি হাতে নিয়েছি এবং ভেবেছি আমার দাদার কথা। এখন আমি জানি কী করে আমার বোন মারা গেল। ঐ মেরেছে।

১১.

সূর্যালোক আসে না, দরজা খোলে না, প্রতিদিন আসে তুবেলার খাবার।

আমার বোনের বয়স তখন মাত্র পাঁচ। আমার বোন, আমার

এখন মনে আছে, খুব আদরের ছিল, যদিও তাকে খুব বিষণ্ণ দেখাত। মা দিনরাত কাঁদত কিন্তু দাদা মাকে কাঁদতে মানা করত। কেন? কারণ, সম্ভবতঃ দাদা নিজেই আমার বোনকে খেয়েছে এবং সেজন্য মায়ের কান্নায় সে লজ্জা পেত। তার যদি কোনরকম লজ্জাবোধ থাকত······

দাদা খেয়েছে আমার বোনকে। কিন্তু আমি জানি না মা সেটা বুঝতে পেরেছিলেন কী না।

আমার মনে হচ্ছে, মা জানতেন কিন্তু যখন তিনি কাঁদতেন সে কথা তিনি সরাসরি বলতেন না। তিনি বোধ হয় একথা না বলাই ঠিক বলে মনে করতেন। আমার মনে পড়ে, তখন আমার চার কি পাঁচ বছর বয়স। একটা ঠাণ্ডা হলঘরে বসে ছিলাম। দাদা বলেছিল যে কারো বাবা-মা যদি অসুস্থ হয় তাহলে নিজের গায়ের এক টুকরো মাংস কেটে তাদের তা সিদ্ধ করে খাওয়াতে হয়, অবশ্য যদি সে সুপুত্র বলে বিবেচিত হতে চায়। এবং মা দাদার কথার বিরোধিতা করেননি। যদি একটুকরো খাওয়া যায় তাহলে পুরোটাই খাওয়া যায়। এবং তবু সেই শোকের কথা চিন্তা করলেও আমার হৃদয় রক্তাক্ত হয় এবং সেটাই একটা অসাধারণ ব্যাপার।

১২.

আমি এ ব্যাপারে ভাবতেও পারছি না। আমি শুধু এটুকুই বুঝেছি যে আমি এমন এক জায়গায় এতদিন বাস করেছি যেখানে ওরা চার হাজার বছর ধরে মানুষের মাংস খেয়ে আসছে। যখন আমার বোন মারা যায় তখন এ বাড়ীর কর্তৃত্ব হাতে তুলে নিয়েছিল আমার দাদা এবং এমন হতেও পারে যে সে আমাদের ভাতে, আমাদের অন্য খাবারের সাথে মিশিয়ে দিয়েছিল আমার বোনের মাংস। এইভাবেই সে হয়ত আমাদের অজ্ঞাতসারে আমাদের তা খাইয়েছিল।

এমনও হতে পারে যে আমি আমার অজ্ঞাতসারে আমাদের বোনের মাংসের কয়েক টুকরো খেয়েছি এবং এইবার আমার পালা······

চারশ' বছরের নরমাংস ভক্ষণের ইতিহাস। আমি অবশ্য প্রথমে তা জানতাম না, তবু এই ইতিহাসের বাহক হয়ে আমার মতো একজন মানুষ কেমন করে আশা করে যে সে একজন মানুষের মতো মানুষের দেখা পাবে ?

১৩.

সম্ভবতঃ এখনও এমন কিছু শিশু আছে মরা মানুষের মাংস খায়নি। আছে তো ?

যদি থাকে, সেইসব শিশুদের বাঁচাও……

অনুবাদ : অশোকেন্দু সেনগুপ্ত

১. কু চিউ শব্দের অর্থ "প্রাচীন কাল।" লু শুনের মনে ছিল চীনের সামন্ততান্ত্রিক অত্যাচারের দীর্ঘ ইতিহাস।

২. একজন বিখ্যাত ভেষজ বিজ্ঞানী (১৫১৮-১৫৯৩). বেন কাও-গাং-মু, মেটিরিয়া মেডিকা গ্রন্থের প্রণেতা।

৩. প্রাচীন মহাকাব্য 'জুয়ো ঝুয়ান' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত।

৪. পুরোনো দলিল পত্র ঘেঁটে পাওয়া যায় যে ই য়া নিজের পুত্রের মাংস রান্না করে চি'র ডিউক হুয়ানকে খাইয়েছিল। ডিউক হুয়ানের রাজত্বকাল খৃঃ পূঃ ৬৮৫ থেকে খৃঃ পূঃ ৬৪৩। এরও আগের যুগে চিয়ে এবং চেই নামে দুজন অত্যাচারী লোক ছিল। পাগলটির এখানে একটু ভুল হয়েছে।

আমার পুরোনো ভিটে



লু্য সুন

তীব্র শীতের মধ্যে দু-হাজার লি অতিক্রম করে আমি আমার পুরনো বাড়ির উদ্দেশে রওনা হয়েছি। কুড়িবছর পরে আমি গ্রামে ফিরছি।

শীতের শেষ। আমরা যতোই গ্রামের নিকটবর্তী হচ্ছি, আকাশ ততোই মেঘাচ্ছন্ন হয়ে উঠছে। আমাদের নৌকার গলুইয়ের মধ্যে ঠাণ্ডা বাতাস ঢুকে পড়ছে। বাঁশের গলুইয়ের ছোটো ছোটো ছিদ্র দিয়ে আমরা কয়েকটি নির্জন গ্রাম দেখতে পাচ্ছি, জনপ্রাণীর সাড়া নেই,—বিষণ্ণ হলুদ আকাশের নিচে গ্রামগুলো এখানে সেখানে ছড়িয়ে আছে। আমি বিমর্ষ না হয়ে পারলাম না।

আঃ! গত কুড়ি বছর ধরে আমি যে পুরনো বাড়ির কথা স্মরণ করে আসছি, নিশ্চয় সেই পুরনো বাড়ি এগুলোর মত নয়।

যে পুরনো বাড়ির কথা আমার মনে আছে তা আদৌ এরকমটি ছিল না। আমার পুরনো বাড়ি এর চেয়ে অনেক ভালো ছিল। তবে তুমি যদি এর বিশেষ কোনো মাধুর্য বা সৌন্দর্যের বর্ণনা দিতে বলো, আমি হয়তো সে-সম্পর্কে কোনো পরিষ্কার ধারণা দিতে পারব না, তা বর্ণনা করার ভাষাও আমার নেই।

অতঃপর এইভাবে আমি মনে মনে যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করলাম যে : পুরনো বাড়ি এরকমটাই ছিল, এবং যদিও তার কোনো উন্নতি হয়নি, তথাপি আমি যেমনটা ভাবছিলাম তা ততোখানি হতাশা-জনকও নয়। আসলে আমার মেজাজটাই বদলে গেছে, কারণ এখন আমি কোনোরকম মোহ না নিয়েই 'দেশে' ফিরছি। মনে হয় এ সম্পর্কে এখন শুধু এইটুকু বলা যায়, এবার আমি চির-বিদায় জানাতেই গ্রামে আসছি। যে পুরনো বাড়িতে আমাদের বংশের লোকেরা বছরের পর বছর বাস করে এসেছে, সেটা অন্য পরিবারের লোকদের ইতিপূর্বে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে এবং বছর শেষ হওয়ার আগেই সেটা হাত বদল করে দেওয়া হবে। তাই, সেই চিরপরিচিত পুরনো বাড়িটাকে চির-বিদায় জানাতে নববর্ষ দিবসের আগেই আমাকে ছুটে যেতে হচ্ছে। পুরনো বাড়িটাকে শুধু চির-বিদায় জানানোই নয়, আমার জন্মভূমি থেকে অনেক দূরে, অন্যত্র—যেখানে আমি চাকরি করি মূলত সেখানে আমার পরিবারবর্গকে স্থানান্তরিত করার জন্যেই দীর্ঘকাল পরে আমার আবার ঘরে ফেরা।

দ্বিতীয় দিনে ভোরবেলায় আমাদের গ্রামের প্রবেশদ্বারে পৌঁছে গেলাম। শুকনো খড়ো চালের ভাঙা খুঁটি বাতাসে নড়বড় করছে। এ দেখেই বোঝা যায় এই পুরনো বাড়ি হাতবদল থেকে কেন রেহাই পায়নি। আমাদের বংশের কয়েকটি শাখা হয়তো ইতোমধ্যে অন্যত্র সরে গেছে। তাই বাড়িটা অস্বাভাবিক শান্ত। আমি অল্প কিছু আসবাব কিনেছি ; নতুন আরো কিছু জিনিস কেনার জন্যে বাড়ির সমস্ত আস-বাবই বিক্রি করে দেওয়া দরকার। মা রাজী হলেন, এবং জানালেন যে পৌঁটলা-পুঁটলি সবই বাঁধা-ছাঁদা হয়ে গেছে, এবং যে-সব আসবাব সহজে বয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না সেগুলো এর মধ্যে বিক্রি করেও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এখন লোকজনের কাছ থেকে সে-গুলোর দাম আদায় করাই দুষ্কর হয়ে দাঁড়িয়েছে।

"তুমি দু-একদিন বিশ্রাম নাও, এবং আমাদের আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করো, তারপর আমরা যেতে পারি," মা বললেন।

"হ্যাঁ।"

"তাছাড়া রুন্‌টু আছে। যখনই সে আসে, সবসময় সে তোমার খোঁজ নেয়, এবং তোমাকে একবার দেখতে চায়। আমি তাকে তোমার বাড়ি আসার সম্ভাব্য তারিখ জানিয়েছি। সে যে-কোনো সময়ই এসে পড়তে পারে।"

এই মুহূর্তে একটি ছবি হঠাৎ আমার মনে ভেসে উঠল : সুনীল আকাশে সোনালি চাঁদ ঝুলে আছে, তার নিচে সমুদ্র-সৈকত—জসম*-সবুজ তরমুজের মতো আদিগন্ত ছড়িয়ে আছে : তার মাঝখানে বসে আছে রুপোর বালা-পরা একটা এগারো-বারো বছরের ছেলে, হাতে একটা লম্বা হাতলঅলা কাঁটা আঁকড়ে-ধরা—সমস্ত শক্তি দিয়ে সে একটা 'ঝা'-কে সজোরে ঠেলছে, 'ঝা'-টা হঠাৎ সরে গিয়ে এড়ানোর চেষ্টা করে পা তুলে পালিয়ে যাচ্ছে।

এই ছেলেটাই রুন্‌টু। আমি যখন তাকে প্রথম দেখি তখন তার বয়েস দশ বছরের কিছু বেশি—ত্রিশ বছর আগেকার ব্যাপার, সে সময় আমার বাবা বেঁচে আছেন, আমাদের পরিবারও তখন বেশ সঙ্গতিসম্পন্ন, সেজন্য আমি বাস্তবিক নষ্টই হয়ে গিয়েছিলাম। সে-বছর বংশপরম্পরা-গত বলিদান-উৎসবের পালি আমাদের : খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। প্রথম মাসে পূর্বপুরুষদের প্রতিমূর্তিগুলি প্রতিষ্ঠিত করা হল, এবং নৈবেদ্যাদি দেওয়া হল। যেহেতু যজ্ঞের পাত্রাদি খুবই মূল্যবান এবং ভক্তের সংখ্যা ছিল অগুণতি, সেহেতু সেগুলো চুরি না হয়ে যায় সেজন্য পাহারার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আমাদের পরিবারে কেবল একজন আংশিক সময়ের চাকর ছিল। (আমাদের জেলায় আমরা চাকরদের তিন-শ্রেণীতে বিভক্ত করে থাকি : যারা কোনো পরিবারে সারা বছর কাজ করে তাদের বলা হয় পূর্ণসময়ের চাকর ; যাদের একদিনের জন্য ভাড়া করা হয় তাদের বলা হয় একদিনের চাকর; এবং যারা নিজেদের জমি নিজেরা চাষ করে এবং নববর্ষে, উৎসবাদিতে বা যখন খাজনা আদায় করা হয় তখন কেবল একটি পরিবারে কাজ করে, তাদের বলা হয়

* জেড [পাথর]

আংশিক সময়ের চাকর।) এবং যেহেতু অনেক কাজ, আমাদের আংশিক-সময়ের চাকর বাবাকে বলল যে যজ্ঞীয় পাত্রাদি দেখাশোনার জন্যে সে তার ছেলে রুনট্‌কে পাঠিয়ে দেবে।

যখন বাবা সম্মতি দিলেন, আমি যৎপরোনাস্তি খুশি হলাম, কারণ আমি অনেকদিন থেকে রুনট্‌র কথা শুনে আসছি, এবং আমি জানতাম সে প্রায় আমারই বয়সের এবং ত্রয়োদশ মাসে* তার জন্ম। যখন তার কোষ্ঠী বিচার করা হয়, দেখা গিয়েছিল পাঁচটি উপাদানের মধ্যে একটি উপাদান ছিল না, তাই তার বাবা তার নাম দিয়েছিলেন রুনট্‌। সে ফাঁদ পেতে ছোটো ছোটো পাখি ধরতে পারত।

আমি নববর্ষ দিবসের জন্য প্রত্যেকদিন উন্মুখ হয়ে থাকতাম, কেননা ওই দিনে রুনট্‌ এসেছে, আমি ছুটে তাকে দেখতে গেলাম। সে রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে ছিল। তার মুখটা গোল এবং গাঢ় লাল। সে মাথায় একটা পশমের টুপি পরেছিল, গলায় রুপোর হাঁসুলি; পাছে সে মারা যায় এই ভয়ে তার বাবা দেব-দেবী এবং বুদ্ধদের কাছে তার জন্য মানত করে গলায় হাঁসুলিতে একটা মাদুলি আটকে দিয়েছিলেন। সে খুব লাজুক, এবং একমাত্র আমাকেই ভয় করছিল না। যখন কাছে-পিঠে কেউ ছিল না, তখন সে আমার সঙ্গে গল্প শুরু করে দিল এবং কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আমরা ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে গেলাম।

আমরা তখন কি নিয়ে গল্প করেছিলাম, মনে নেই। কিন্তু আমার মনে আছে রুনট্‌ খুব খোশ-মেজাজে ছিল, আমাকে বলেছিল শহরে আসার পরে সে অনেক নতুন নতুন জিনিস দেখেছে।

পরের দিন আমি তাকে পাখি ধরতে বললাম।

"কিছুতেই ধরা যাবে না," সে বলল, "কেবল ঘন বরফ পড়ার পরই পাখি ধরা সম্ভব। বরফ পড়ার পর আমি আগে বালির ওপর খানিকটা জায়গা ঝাট দিয়ে নিই, একটা ছোটো কাঠিকে ঠেকনো করে তার ওপর একটা বড়ো ঝুড়ির একটা দিক উঁচু করে ঠেকিয়ে রেখে দিই,

---

* ৩৬০ দিনে চীনা চান্দ্র বৎসর, এবং প্রত্যেকটি মাস ২৯ বা ৩০ দিনে, কখনো ৩১ দিনে হয় না। সেজন্য কয়েক বৎসর অন্তর ত্রয়োদশ মাসে বৎসর গণনা করা হয়।

এবং নিচে ধান বা গমের তূষ ছড়িয়ে দিই। ঠেকনোর সঙ্গে সুতো বেঁধে আমি খানিকটা দূরে বসে সুতোর একটা দিক ধরে থাকি, যেই পাখিরা তূষ খেতে আসে অমনি সুতো ছেড়ে দিই, পাখিরা ঝুড়ির মধ্যে ধরা পড়ে। অনেক রকমের পাখি : বুনো তিতির, কাঠ-ঠোকরা, বুনো পায়রা, লেজঝোলা……”

তদনুসারে আমি আগ্রহ সহকারে তুষারপাতের জন্য অপেক্ষা করে রইলাম।

“এখন খুব ঠাণ্ডা,” একসময় রুনটু বলল, “কিন্তু গরমকালে তুমি আমাদের বাড়ি যেও। দিনের বেলায় আমরা সমুদ্রের ধারে ঝিনুক কুড়োতে যাবো,—সবুজ লাল কতো রকমের ঝিনুক পাওয়া যায়। যখন বিকেলবেলায় বাবা আর আমি তরমুজের ক্ষেত দেখতে যাব, তুমিও আমাদের সঙ্গে যাবে।”

“চোরদের ধরবার জন্যে ?”

“না। পথিকেরা তেষ্টা পেলে তরমুজ তুলে খায়, আমাদের অঞ্চলের লোকেরা তাকে চুরি বলে মনে করে না। আমাদের বেজি, শজারু এবং ঝা-দের খুঁজে বের করতে হবে। চাঁদের আলোয় যখন তুমি কড়মড় শব্দ শুনতে পাবে, তখন বুঝে নেবে ঝা-রা তরমুজ খাচ্ছে, তখন তুমি একটা সাঁড়াশি হাতে নিয়ে চোরের মতো হামাগুড়ি দিয়ে…”

তখন ঝা কাকে বলে সে-সম্বন্ধে আমার কোনো ধারণা ছিল না—এবং এখনো আমি ওই প্রাণীটি সম্পর্কে স্পষ্ট কিছুই জানি না—তবে কিভাবে আমার ধারণা হয়েছে যে, ঝা ছোটো কুকুরের মতো, এবং খুব হিংস্র।

“তারা লোকজনকে কামড়ায় না ?”

“তোমার কাছে সাঁড়াশি থাকবে। তুমি পাশ দিয়ে যেতে যেতে, যে-ই চোখে পড়বে সঙ্গে সঙ্গে ওটা দিয়ে তাকে আঘাত করবে। জন্তুটা খুবই ধূর্ত, দেখামাত্র তোমার দিকে তেড়ে আসবে এবং তোমার দু-পায়ের মাঝখানে থেমে পড়বে। ওদের লোমগুলো তেলের মতো পিছল।”

এ-ধরনের অদ্ভুত জীবের যে অস্তিত্ব আছে, তা আমি আদৌ

জানতাম না। আমি জানতাম সমুদ্রের বেলাভূমিতে রামধনু রঙের ঝিনুক বা শাঁখই থাকে। তরমুজের এরকম একটা মারাত্মক ইতিহাস আছে, তা ত জানতাম না। আগে আমি জানতাম সব্জি-বিক্রেতার দোকানেই কেবল তরমুজ বিক্রি হয়।

"যখন জোয়ার আসে তখন আমাদের জমিতে অনেক লাফানে মাছ পাওয়া যায়, মাছগুলোর ব্যাঙের মতো দুটো পা থাকে ......"

রুনটুর মন ছিল এই ধরনের অদ্ভুত জ্ঞানের একটি ধনাগার। আমাদের জ্ঞাতি-গোষ্ঠির কেউ এতো খবর রাখতনা। তারা এসব বিষয় সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল, এবং রুনটু যখন সমুদ্রতীরে বাস করত, তখন তারা উঁচু চার দেয়ালের ওপরে আকাশের চারটি কোনাই কেবল দেখতে পেত।

দুর্ভাগ্যক্রমে নববর্ষের একমাস পরে রুনটুকে বাড়ি যেতে হল। আমি খুব কান্নাকাটি করলাম, সে কাঁদতে কাঁদতে রান্নাঘরের মধ্যে লুকিয়ে পড়েছিল, শেষ পর্যন্ত তার বাবাই তাকে সেখান থেকে টেনে আনল। পরে সে আমাকে তার বাবার হাত দিয়ে এক প্যাকেট ঝিনুক এবং অনেকগুলি ভারি সুন্দর পাখির পালক পাঠিয়ে ছিল, আমিও তাকে একবার বা দুবার উপহার পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু আর কখনো আমরা পরস্পর পরস্পরকে দেখিনি।

এখন মা তার কথা তুললেন, বিদ্যুতের ঝলকানির মতো তার স্মৃতি জীবন্ত হয়ে উঠল, এবং আমি আমাদের অতীতের সেই পুরনো বাড়িটি দেখতে পাচ্ছি বলে মনে হল। সেইজন্যে আমি উত্তর দিলাম :

"চমৎকার! এবং সে—সে কেমন আছে?"

"সে?......তার অবস্থা একদম ভালো নয়," মা বললেন। এবং তারপর দরোজার বাইরের দিকে চেয়ে : "সেই লোকগুলো আবার এসেছে। তারা বলছে তারা আমাদের পুরনো আসবাবগুলো কিনবে। আসলে তারা দেখতে এসেছে কি কি তারা কুড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে। আমাকে যেতে হবে এবং তাদের ওপর লক্ষ্য রাখতে হবে।"

মা দাঁড়ালেন, তারপর চলে গেলেন। বাইরে বেশ কয়েকজন

মহিলার গলা শোনা যাচ্ছিল। আমি হোঙার-কে কাছে ডাকলাম এবং তার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলাম। জানতে চাইলাম সে লিখতে পারে কিনা, এবং এখান থেকে গিয়ে সে খুশি হবে কিনা।

"আমরা কি ট্রেনে যাব ?"

"হ্যাঁ, আমরা ট্রেনে যাব।"

"এবং নৌকায় ?"

"প্রথমে আমরা একটা নৌকা নেব।"

"ও! সেই ছেলে! তার এরকম লম্বা গোঁফও গজিয়েছে!" হঠাৎ একটা অদ্ভুত তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর বেজে উঠল।

আমি মুখ তুলে তাকালাম, প্রায় পঞ্চাশ বছরের এক মহিলাকে দেখতে পেলাম, তাঁর গালের হাড়গুলো উঠে আছে,—পাতলা ঠোঁট; আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন, হাত দুটো কোমরের ওপরে রেখেছেন, স্কার্ট না পরে বেশি-ঘেরের পাজামা পরেছেন—তাঁকে দেখতে ঠিক জ্যামিতি-বাক্সের কম্পাসের মতো।

আমি হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম।

"আমাকে চিনতে পারলে না? আমি তোমাকে কোলে নিয়ে কতো ঘুরেছি!"

আমি আরো ঘাবড়ে গেলাম। ভাগ্যিস্ সেই সময় মা এসে পড়লেন এবং বললেন, "ও কতোদিন এখানে ছিল না। তুমি এই বিস্মরণের জন্যে নিশ্চয় ওকে ক্ষমা করবে।"

"তোমার মনে পড়া উচিত", তিনি আমাকে বললেন, "আমি রাস্তার ওপরের শ্রীমতী ইয়াঙ—আমার একটা দইয়ের দোকান আছে।"

তারপর, নিশ্চিত হয়ে, আমি তাঁকে চিনতে পারলাম। যখন আমি শিশু ছিলাম শ্রীমতী ইয়াঙ তাঁর দইয়ের দোকানে প্রায় সারাদিন বসে থাকতেন, সকলে তাঁকে দধি-সুন্দরী বলে ডাকত। তখন তিনি পাউডার মাখতেন, তাঁর গালের হাড়গুলো এরকম বেরনো ছিল না, ঠোঁটগুলোও এতো পাতলা ছিল না। তিনি সারাক্ষণই বসে থাকতেন, কাজেই কম্পাসের সঙ্গে তাঁর মিলটা কখনো আমার চোখে পড়েনি।

সেকালে লোকে বলত,—তাঁকে ধন্যবাদ, যে তাঁর দইয়ের দোকানটা ভালোই চলত। কিন্তু আমি তখন খুব ছেলেমানুষ ছিলাম বলে তাঁর কথা বেমালুম ভুলে গিয়েছিলাম। যা হোক শ্রীমতী কম্পাস আমার ওপর রুষ্ট হয়েছিলেন, তিনি ঘৃণাসূচক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন—যেমন নেপোলিয়নের নাম শোনে নি এমন একজন ফরাসী অথবা ওয়াসিংটনের নাম শোনে নি এমন একজন আমেরিকানের দিকে কেউ তাকিয়ে থাকে, তিনিও সেইরকম ব্যঙ্গের হাসি মুখে ফুটিয়ে আমাকে বললেন :

"তুমি ভুলে গেছ? তার মানে আমি তোমার চোখে এতো তুচ্ছ হয়ে গেছি······"

"মোটেই না···আমি···", আমি কিছুটা উত্তেজিত স্বরে উত্তর দিলাম।

"তাহলে আমার কথায় কান দাও, শ্রীমান্ স্যুন। তুমি আজ অনেক টাকা-পয়সার মালিক হয়েছ, এবং অতো টাকা-পয়সা নাড়া-চাড়া করা তোমার পক্ষে বেশ কঠিন : সুতরাং সম্ভবত তোমার পুরনো আসবাবগুলোর দরকার নেই। ওগুলো নিয়ে যাওয়ার চেয়ে আমাকে দিয়ে দাও। আমাদের মতো গরিব লোকের ওগুলো অনেক কাজ দেবে।"

"আমি বড়োলোক হইনি। নতুন আসবাব কেনার জন্য এগুলো আমাকে বেচতে হবে···"

"ও, তাহলে বলি, তুমি এখন একটি সার্কিটের পরিচালক হয়েছ ; তা সত্ত্বেও তুমি বলছ—তুমি বড়োলোক হওনি? এখন তোমার তিন-তিনটে উপপত্নী, এখন তুমি কোথাও গেলে আট-বাহকের বড়ো পালকী-চেয়ার চড়ে যাও, তা সত্ত্বেও তুমি বলবে তুমি বড়োলোক হওনি? হা! তুমি আমার কাছে কিছুই লুকোতে পারবে না।"

আমার কিছুই বলার নেই বুঝে আমি চুপ করে থাকলাম।

"এখন শোনো, বাস্তবিকই মানুষ যতো পয়সা উপার্জন করে, ততোই সে কৃপণ হয়ে পড়ে", কম্পাস বললেন। এবং রুষ্টভাবে ঘুরতে ঘুরতে

আস্তে আস্তে এগোতে লাগলেন, এবং যেন অন্যমনস্কতাবশে মায়ের দস্তানাটা কুড়িয়ে নিয়ে তাঁর পকেটে ঢোকালেন এবং চলে গেলেন।

এরপর পাড়ার বেশ কয়েকজন আত্মীয় দেখা করতে এলেন। তাঁদের আসা-যাওয়ার মাঝখানে আমি কিছু কিছু জিনিস বাঁধা-ছাঁদা করে নিলাম, এবং এইভাবে তিন চারটে দিন কেটে গেল।

একদিন ভয়ানক ঠাণ্ডা পড়েছিল, দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সেরে আমি চা খাচ্ছিলাম। সেই সময় যেন কেউ এল বলে মনে হল, আমি কে তা দেখার জন্য মাথা ঘুরিয়ে প্রথমটায় খানিকটা অগ্রাহ্যভরেই তাকিয়েছিলাম, পরক্ষণে চটপট উঠে দাঁড়ালাম এবং তাকে স্বাগত জানাতে ছুটে গেলাম।

আগন্তুক ছিল রুন্‌টু। প্রথম দর্শনেই রুন্‌টুকে চিনতে পেরেছিলাম. কিন্তু এ রুন্‌টু সে রুন্‌টু নয়। সে আগের চেয়ে দ্বিগুণ বড়ো হয়েছে। তার আগের লাল গোলগাল মুখটা এখন হলুদ হয়ে গিয়েছে, এবং সেখানে অনেকগুলো রেখা ও খাঁজ পড়েছে, চোখগুলো তার বাবার চোখগুলোর মতো ফোলা-ফোলা এবং লাল হয়ে উঠেছে। চেহারাটা সমুদ্রের ধারে যারা কাজ করে এবং সামুদ্রিক হাওয়ায় সারাদিন খালি গায়ে থাকে সেইসব কৃষকদের মতো দেখাচ্ছে। সে মাথায় একটা পশমের পুরনো টুপি এবং গায়ে পাতলা তুলোর একটা জ্যাকেট পরেছে। ফলে শীতে সে আপাদমস্তক কাঁপছিল। তার হাতে ছিল কাগজের একটা মোড়ক এবং একটা লম্বা পাইপ, যে পুরন্ত লাল হাতের কথা আমার মনে আছে, এ-হাত সে-হাত নয়, এখন তার হাতদুটো খসখসে এবং বিশ্রী—পাইনগাছের ছালের মতো

আমি এতো খুশি হয়েছিলাম যে কিভাবে নিজেকে প্রকাশ করব তা বুঝতে পারছিলাম না, এবং আমি কেবল বলতে পারলাম :

"ও! রুন্‌টু – তুমি ?..."

এরপর ওর সঙ্গে অনেক কিছু সম্পর্কে কথা বলতে চাইলাম, যেগুলো সুতোয় গাঁথা পুঁতির মতো একসঙ্গে নিঃসারিত হতে চায় : বনমোরগ, লাফানে মাছ, ঝিনুক, ঝা...কিন্তু আমার জিব কেউ যেন টেনে রেখেছে ;

যে কথাগুলো আমি চিন্তা করছিলাম সেগুলো ভাষায় প্রকাশ করতে পারলাম না।

সে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকল, তার মুখে আনন্দ ও বিষাদের ছায়া মাখামাখি। তাঁর ঠোঁট নড়ল, কিন্তু সে একটা কথাও উচ্চারণ করতে পারল না। অবশেষে একটা বিনীত ভঙ্গি করে সে স্পষ্ট ভাষার বলল :

"মালিক !..."

আমার রক্তের মধ্যে একটা কাঁপুনি বয়ে গেল ; আমি মুহূর্তে বুঝতে পারলাম আমাদের দুজনের মধ্যে কি বেদনাদায়ক একটা প্রকাণ্ড দেয়াল গড়ে উঠেছে। তবু আমি কিছু বলতে পারলাম না।

সে মাথা ঘুরিয়ে ডাকল :

"শুইশেঙ, মলিককে প্রণাম করো।" তারপর সে একটি ছেলেকে টেনে সামনে নিয়ে এল, ছেলেটি তার পেছনে লুকিয়ে ছিল, রোগা পাতলা ছেলেটা, এবং তার গলায় রুপোর মাদুলি নেই।

"এ আমার পাঁচ নম্বর সন্তান," সে বলল।

"ও এখনো উঁচু সমাজে চলাফেরা করে নি, সেজন্যে খুব লাজুক আর আড়ষ্ট।"

মা হোঙারকে নিয়ে নিচে নেমে এলেন, হয়তো আমাদের গলা শুনতে পেয়েছিলেন।

"আমি কিছুদিন আগে চিঠি পেয়েছিলাম, মহাশয়া," রুন্টু বলল। "মালিক আসছেন জেনে আমি সত্যিই ভীষণ খুশি হয়েছিলাম..."

"তা তোমরা এরকম চুপ করে আছো কেন? ছেলেবেলায় তোমরা দুজনে খেলার সাথী ছিলে না?" মা উল্লাসের সঙ্গে বললেন, "তুমি আগের মতো ভাই স্যুন বলেই ওকে ডাকো!"

"ও, আপনি সত্যিই খুব...সেটা খুবই অভব্যতা হবে। তখন আমি ছেলেমানুষ ছিলাম এবং বুঝতে পারিনি।" কথা বলার সময় রুন্টু শুইশেঙকে এসে প্রণাম করতে ইঙ্গিত করছিল, কিন্তু ছেলেটা লাজুক, সে বাবার পিছনে অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

"ও-ই শুইশেঙ? তোমার পঞ্চম সন্তান?" মা জিগ্যেস করলেন।

"আমরা সবাই ওর অপরিচিত, কাজেই ওর লজ্জা পাওয়ার জন্যে তুমি ওকে দোষ দিতে পারো না। বরং হোঙার ওকে ডেকে নিয়ে গিয়ে ওর সঙ্গে খেলা করুক।"

যখন হোঙার একথা শুনল, সে শুইশেঙের কাছে গেল এবং শুইশেঙ খুব সহজভাবেই তার সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে গেল। মা রুন্‌টুকে বসতে বললেন, একটু দ্বিধা করে সে বসল। তারপর সে তার লম্বা পাইপটা টেবিলের ওপর রেখে কাগজের মোড়কটা হাতে দিয়ে বলল :

"শীতকালে নিয়ে আসার মতো কিছুই থাকে না ; তবে কিছু শিম আমাদের জন্যে শুকিয়ে রেখেছিলাম, আপনি যদি দয়া করে এগুলো নেন, আর ····

যখন আমি জিগ্যেস করলাম সে কেমন আছে, সে কেবল মাথাটা নাড়ল।

"খুবই খারাপ। আমার ছোটো ছেলেটা পর্যন্ত কাজকর্ম করে, তবু আমরা পেট পুরে খেতে পাই না···তাছাড়া কোনো নিশ্চয়তা নেই··· সব রকমের লোকই টাকা চায় এবং কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম নেই···এবং ফসলও ভালো জন্মায় না। আপনি ফসল ফলান, কিন্তু যখনই আপনি বেচতে যাবেন আপনাকে সবদা কিছু খাজনা দিতে হবে এবং কিছু টাকা খোয়াতেই হবে, যদি বেচতে চেষ্টা না করেন, পরিস্থিতি আরো খারাপ হয়ে দাঁড়াবে···"

সে মাথা নাড়াতেই থাকল ; কিন্তু তার মুখের খাঁজগুলো একেবারেই নড়ে না, সে যেন একটা পাথরের প্রতিমূর্তি। সন্দেহ নেই তার মনটা খুবই তেতো হয়ে উঠেছিল, কিন্তু সে নিজেকে ঠিকমতো প্রকাশ করতে পারছিল না। কিছুক্ষণ চুপ করে সে পাইপটা হাতে নিয়ে নিঃশব্দে ধূমপান করতে লাগল।

তার সঙ্গে কথাবার্তায় মা বুঝতে পারলেন সে খুবই ব্যস্ত এবং পরের দিনই তাকে ফিরে যেতে হবে ; এবং যেহেতু সে তুপুরের খাওয়া সেরে আসেনি, তিনি তাকে রান্নাঘরে গিয়ে তুটো চাল ফুটিয়ে নিতে বললেন।

সে চলে গেলে আমি এবং মা তুজনেই তার তুর্ভাগ্য এবং অভাব

নিয়ে আলোচনা করলাম : অনেকগুলো কাচ্চাবাচ্চা, খাজনা, সৈনিক, ডাকাত, অফিসার, জমিদার সকলেই নিংড়ে নিয়ে তাকে একটা মামিতে পরিণত করেছে। মা বললেন যে-সব জিনিস আমরা নিয়ে যাব না সেগুলো নিজের পছন্দমতো তাকে বেছে নিয়ে যেতে বলবেন।

সেদিন বিকেলে তাকে অনেকগুলো জিনিসই দেওয়া হল : দুটো লম্বা টেবিল, চারখানা চেয়ার, একটা ধূপদানি, একটা পিলসুজ এবং একটা দাঁড়িপাল্লা। সে ছাইগাদার সমস্ত ছাইও নিতে চাইল (আমরা খড় দিয়ে রান্না করে থাকি, বেলে জমিতে ছাই সার হিসেবে ব্যবহার করা যায়,) বলল আমরা চলে গেলে সে এসে নৌকো করে সেগুলো নিয়ে যাবে।

রাত্রেও আমাদের মধ্যে কথাবার্তা হলো, কিন্তু কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে নয়। পরদিন সকালে শুইশেঙকে নিয়ে সে চলে গেল।

আরো ন-দিন পর আমাদের রওনা হওয়ার দিন সকালে রুন্‌টূ এল। এবার শুইশেঙকে সে সঙ্গে আনেনি—তার বছর পাঁচেকের একটা মেয়েকে নৌকা দেখাতে সঙ্গে নিয়ে এসেছে। সারাদিনই আমরা খুব ব্যস্ত ছিলাম এবং তার সঙ্গে কথা বলার ফুরসুতই পাই নি। তাছাড়া অনেকেই আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসছিল,—কেউ কেউ আমাদের বিদায় জানাতে, কেউ কেউ জিনিসপত্র হাতাতে, কেউ কেউ—দু' কাজেই। সন্ধ্যার কাছাকাছি আমরা নৌকোয় উঠলাম, তৎপূর্বেই বাড়ির সমস্ত জিনিসপত্র—তা পুরনো বা ছেঁড়া, বড়ো বা ছোটো, সূক্ষ্ম বা স্থূল যা-ই হোক—সাফ হয়ে গেছে।

আমাদের নৌকো ছেড়ে দিল। নদীর দুই তীরের সবুজ পাহাড়-গুলো ক্রমশ ঘন নীল হয়ে আসছে। নৌকোটা ক্রমশ ধীরে ধীরে দূরে সরে যাচ্ছে।

আমি এবং হোঙার নৌকোর কামরার জানলার ওপর ঝুঁকে বাইরের আবছা দৃশ্যগুলোর দিকে তাকিয়ে আছি, হঠাৎ সে জিজ্ঞেস করল :

"কাকা আমরা কবে আবার ফিরে আসব ?"

"ফিরে আসব ? যেখানে যাচ্ছি—না গিয়েই ফিরে আসব ?"

"বলছিলাম কি, সুইশেঙ তাদের বাড়িতে যাওয়ার জন্য আমাকে নেমন্তন্ন করেছে···" কালো একজোড়া বড়ো বড়ো চোখ মেলে উদ্বিগ্ন স্বরে সে বলল।

আমি এবং মা খুব বিষন্ন হয়ে পড়লাম, এবং তাই রুনটুর নাম আবার মনে পড়ে গেল। মা বললেন, যেদিন থেকে আমরা জিনিসপত্র গোছগাছ শুরু করেছি সেদিন থেকেই শ্রীমতী ইয়াঙ প্রত্যেকদিন আমাদের বাড়ি আসতেন। গত দিন তিনি ছাইগাদা খুঁড়ে এক ডজন থালা ও প্লেট বের করেছেন, তাঁর জোরালো ধারণা ওগুলো রুনটুই লুকিয়ে রেখেছিল; আমরা চলে যাওয়ার পর সে যখন ছাইগাদা থেকে ছাই নিতে আসবে, সেই সময় ওগুলোও নিয়ে যাবে। এই আবিষ্কারের পর শ্রীমতী ইয়াঙ গভীর আত্মপ্রসাদে আমাদের কুকুর-নিরোধক খাঁচাটি নিয়ে মুহূর্তে সরে পড়লেন। (এতদঞ্চলে যারা হাঁস-মুরগী পালন করে তাঁরা এই কুকুর-নিরোধক খাঁচা ব্যবহার করে। এই খাঁচা কাঠ দিয়ে তৈরী করা হয় এবং এর ভেতরে মুরগীর খাবার রাখা হয়—হাঁস বা মুরগীগুলো যখন গলা বাড়িয়ে খাবার খায়, তখন তাদের দিকে তাকিয়ে দেখা ছাড়া রাগী কুকুরগুলোর আর কিছুই করার থাকে না।) তাঁর পায়ের যা আকার তাতে তিনি যে অতো জোরে ছুটতে পারেন তা না দেখলে বিশ্বাস করাই কঠিন।

আমি আমাদের পুরনো ভিটেটা ফেলে ক্রমে ক্রমে পেছনে এগিয়ে যাচ্ছি, সেই সঙ্গে আমার জন্মভূমির পাহাড় এবং নদীগুলোও ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে। কিন্তু আমার মনে কোনো কষ্ট হচ্ছে না। আমি কেবল অনুভব করতে পারছি, আমার চারপাশে অদৃশ্য এক উঁচু দেয়াল আমাকে ঘিরে ছিল, আমার সঙ্গীদের থেকে সরিয়ে রেখেছিল, আমাকে পুরোপুরি হতোদ্যম করে রেখেছিল। গলায় মাদুলি-পরা তরমুজ ক্ষেতের সেই ছোট্ট নায়কের ছবিটি আগে আমার কাছে দিনের মতো উজ্জ্বল ছিল, কিন্তু এখন তা হঠাৎ ঝাপসা হয়ে গেছে, এখন কেবল আমার মনকে ভারাক্রান্ত করে তুলছে।

মা এবং হোঙার ঘুমিয়ে পড়লেন।

আমিও শুনলাম, নৌকোর নিচে জলের কল্‌কল্‌ শব্দ কানে আসছে। আমি সঠিক পথেই এগিয়ে যাচ্ছি। আমি ভাবছিলাম : আমার এবং রুন্‌টুর মধ্যে এরকম একটা পাঁচিল আছে ঠিকই, কিন্তু আমাদের ছেলেপুলেরা তাদের মধ্যে সহজ সম্পর্ক গড়ে তুলবে। একটু আগেই হোঙার শুইশেঙের কথা ভাবছিল না? আমার আশা, তারা আমাদের মতো হবে না, তারা নিজেদের মধ্যে গড়ে তুলতে দেবেনা কোনো পাঁচিল। তাদের আমি পছন্দ করব না যদি তারা আমার মতোই একজন হয়, আমার মতোই বৈচিত্র্যহীন জীবনে অভ্যস্ত হয়, অথবা রুন্‌টুর মতো যন্ত্রণায় মূক হয়ে ক্লেশ সহ্য করে, অথবা আরো অনেকের মতো অসংযত জীবনযাত্রায় নিজেদের সমর্পণ করে। তারা নতুন জীবন লাভ করুক—যে জীবনের আস্বাদ কখনো পাইনি আমরা।

আশা সঞ্চারের শুরুতেই আমি হঠাৎ ভীত হয়ে পড়ি। যখন রুন্‌টু আমার কাছে ধূপদানি এবং পিলসুজগুলো চেয়েছিল আমি মনে মনে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিলাম এই ভেবে যে এখনো সে ব্যক্তিপুজো করে চলেছে এবং মন থেকে এখনো সে মূর্তিগুলো অপসারিত করতে পারে নি। তবু এইমাত্র যাকে আমি 'আশা' বললাম তা আমার নিজের গড়া মূর্তি ছাড়া আর কি? একমাত্র তফাত এইখানে যে সে যা চেয়েছিল তা তার হাতের কাছেই ছিল, আমি যা চেয়েছি তা বাস্তবে রূপায়িত করা সহজ নয়।

আমি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম। জেড-পাথরের মতো সবুজ সমুদ্রতীরের ব্যাপ্তি ছড়িয়ে আছে আমার চোখের সামনে। ওপারে গাঢ় নীল আকাশে সোনালি গোল চাঁদ ঝুলে আছে। আমি ভাবছি : আশা একেবারেই নেই তা যেমন বলা যায় না, তেমনি আশা আছে তা-ও হলফ করে বলা শক্ত। পৃথিবীর আর দশটা পথের মতোই আশাও দূরপ্রসারী। কেন না, প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীতে কোনো পথই থাকে না; যখন বহু মানুষ দলে দলে একটা জায়গার ওপর দিয়ে হেঁটে যায়, তখনই কেবল একটি পথ তৈরি হয়ে থাকে।

অনুবাদ : জগত লাহা

টিঙ্ লিং—খ্যাতনামা লেখিকা, হুনানের লিন্লি জেলায় ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে জন্ম। বর্তমানে চীনা লেখক সমিতির সহ-সভাপতি। নানা উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে আজও তিনি লিখে চলেছেন। তাঁর প্রথম রচনা 'মেঙকে' ও 'কুমারী শাফেই-এর ডায়রী' পিকিং থেকে ১৯২৮ সালে প্রকাশিত ঙ্গম ও পাইক এবং লেখকমহলে সাড়া পড়ে যায়। তাঁর লেখা 'দা সান সাইনস্ ওভার দা সাংগান রিভার' নামক উপন্যাসটি ১৯৫১ সালে স্তালিন পুরস্কার লাভ করে। সংস্কৃতি বিপ্লবের কালে তিনি সমালোচনার মুখোমুখি হন। এখন আবার লিখছেন।

কোনো এক রাত্রে



টিঙ লিং

মচ্, মচ্, মচ্……

বিদ্যুতের নীল আলোয় আলোকিত হলঘর থেকে একদল ছায়ামূর্তি বেরোলো ও চত্বরের দিকে যাত্রা করলো।

জুতো আর বুট পুরু তুষার দৃঢ়ভাবে মাড়িয়ে চললো। শীত-রাতের বন্য হাওয়া তাদের মুখে চাপড় মারতে লাগলো আর ঘুরন্ত তুষার ছুঁড়ে দিল। গত দু'সপ্তাহ ধরে তুষারপাত হয়ে চলেছে, সেই সঙ্গে শিলাবৃষ্টি। হঠাৎ বরফের মতো ঠাণ্ডা বাতাসের আক্রমণে সবাই কেঁপে উঠলো। কিন্তু তারা মচ্মচ্ শব্দে তুষার মাড়িয়ে চললো।

বাতাসের আরো একটি ধাক্কা গর্জন করে উঠলো আবার, নির্দয়ভাবে মানুষগুলোর মুখ ও শরীরের ছাল ছাড়িয়ে নিতে লাগলো। অনেকে যাকে ঘিরে ধরে, মাঝখানে রেখে, ঠেলে নিয়ে চলেছে, সে যেন হঠাৎই জেগে উঠলো। মানুষটি নাতিদীর্ঘ, সুন্দর,—যুবক, কিন্তু চোখ মুখ বসে যাওয়া চেহারা। মনে হয় যেন তার সমস্ত অতীতটা ও এই নতুনভাবে অভিনীত দৃশ্যগুলি যদিও বহু দূরের স্মৃতি, তবুও স্পষ্টতঃ তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে : সেই ধূর্ত গোল মুখ, হুমকি দিচ্ছে ও বিজয়গর্বে তাকাচ্ছে, সাম্রাজ্যবাদীদের পছন্দসই বিশ্রী গোঁফ সে মুখে, হাসির তোড়ে

বন্যার মতো ভেসে যাওয়া সেই বর্বর গলার স্বর। সে যখন মঞ্চের ওপর বসে ছিল তখন কি ঘৃণা অবজ্ঞা নিয়ে এদের দেখছিল।

"তোমার কি আর কিছু বলার আছে", জানতে চেয়েছিল, "তোমার মৃত্যুদণ্ড হল, এই মুহূর্তেই কার্যকর করা হবে।"

যখনই যুবকের এই কথাগুলো স্মরণ হল, তাকে গ্রাস করতে পারে —এমনই তীব্র লেলিহান শিখা তার হৃদয়ে জ্বলে উঠলো। সে সেই মুখটা থেঁতো করে দিতে চাইলো, গলা স্তব্ধ করে দিতে চাইলো! সেই ভীড়ের গাদা থেকে নিজেকে বের করে আনার প্রবল চেষ্টায় সে দ্রুত পা ফেলতে লাগলো। যদিও একটু আগে যখন কোনও বিচার ছাড়াই সহসা তাদের মৃত্যুদণ্ড ঘোষিত হয়েছিল, সে তার সাথীদের মতো প্রশান্তি বজায় রাখতে পারেনি, রাগে ও মনস্তাপে সে জ্ঞান হারিয়েছিল।

সে জীবনের আবেগে আতীব্র এক কবি, সৎ আর পরিশ্রমী। হেই! রাইফেলের কুঁদো তার বুকে এসে ধাক্কা দিল, যে বুক কুড়ি দিনের সূর্য-হীন অন্ধকার জেলখানায় অর্ধাহারে ও অনশনে কাটিয়ে আর" সরু হয়ে গেছে।

"তোর মাকে…! তাড়া কিসের রে? যম তোর জন্যে অপেক্ষা করবে।" খিস্তিতে অন্ধকারেব স্তব্ধতা ভেঙে একজন পাশব-সৈন্য তাকে পিটতে লাগলো। তার এবং অন্যদের হাতের কব্জিতে আর পায়ে শিকলের ঝনঝনানি তার কানে পীড়া দিতে লাগলো। চতুর্দিকে নানা শব্দের এক খিচুড়ি, পুরু তুষারের ওপরে কাঁটাপেরেকের বুটজুতোর ভারি শব্দ।…

এখন তার মাথা সাফ্ হয়ে গেছে, তারা কোথায় যাচ্ছে তা বুঝতে পারলো। তার কল্পনায় অদ্ভুতভাবে মনে হল আরো একজোড়া চোখ যেন তার চোখের ওপর নিবদ্ধ সেই সুন্দর অবিস্মরণীয় চোখদুটি যা তার হৃদয়ের তল পর্যন্ত সর্বদাই দেখতে সক্ষম। সে স্পষ্টতঃ অনুভব করলো কিছু একটা তার হৃদয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে তিলে তিলে ছিঁড়ে ফেলছে, রক্ত পড়ছে ঝরঝর করে। সে ব্যথা প্রচণ্ড যন্ত্রণাদায়ক।

আকাশ ঘন কালো, সেই সীমাহীন অন্ধকার থেকে পড়ছে তুষার

আর শিলা। আঁধারে উত্তুরে হাওয়া গর্জন করছে। পৃথিবী ধূসর আর কুয়াশাচ্ছন্ন। এই রাত্রে ছড়ানো তুষার যেন মৃত্যুর ধূসরতাকে প্রতিফলিত করছে। কালো ছায়ামূর্তিগুলি তুষারের ওপর দিয়ে নিঃশব্দে চলেছে। বন্দীরা আর তাদের পাহারাদারেরা, শিকলের ঝনঝনানি, বেয়নেটে বেয়নেটে শব্দ, কোনও কথা উচ্চারিত হয় না। গোপন চত্বরের দিকে তারা যখন এগিয়ে চললো দৃঢ়ভাবে, কোনও গোঙানী, দীর্ঘশ্বাস বা কান্না শোনা গেল না। চত্বরের একটা কোণ এখন সাময়িক বদ্ধভূমি।

"নরক! আমাদের খুন করতে শুয়াররা আমাদের এতদূর আনলো কেন।"—কোন একজন বিস্ময় প্রকাশ করে বললো।

দ্বিতীয় সারির একটি মেয়ে বন্দী যেন ক্রোধে থেকে থেকে মাথা ঝাঁকাচ্ছিল, তার ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা ঘন চুল বাতাস বারে বারেই তার চোখে মুখে উড়িয়ে ফেলছিল।

যুবক কবি ঠোঁট কামড়ে চেপে রেখেছে তার উন্মত্ত হতাশার কান্না, যা তার গলা ফেটে বেরোতে চাইছিল। তার অন্ধ রাগ প্রকাশ না করতে পারায় সে চারপাশে তাকিয়ে নিরুপায়ভাবে কাঁপছিল, তার চোখ দিয়ে ঘৃণার আগুন বেরোচ্ছিল, যেন সাগ্রহে কিছু খুঁজছিলো। সে প্রতিটি মুখের দিকে খুঁটিয়ে দেখছিল।

তুষারের থেকে বিচ্ছুরিত ক্ষীণ আলো তার সবচেয়ে কাছের লোকগুলির মুখে এসে পড়েছে : একজন চোখ কোঁচকানো সৈন্য, আর একজন উর্দিপরা বর্বর, তার নাকের পাটা ফুলে উঠেছে, মুখ হাঁ-করা; আরো একজন···· তার পরে তার নজরে পড়লো একটি প্রিয় পরিচিত মুখ। সে মুখের ভাব শান্ত ও নম্র, যে কোনও দীর্ঘতম বক্তৃতার থেকেও অনেক বেশী বক্তব্যবাহী, আদর্শের জন্যে যখন সাথীরা মরতে চলেছে, সে-সময় তারা পরস্পরকে যে সুখ ও সাহস যোগাতে পারে, সেই মুখ সেই সুখ আর সাহস জানাচ্ছিল। মুহূর্তে তার প্রায় সব ক্রোধ ও দুঃখ উবে গেল। ভালোবাসা ও আরো কিছু, যা কেবল "জীবন" শব্দটি প্রকাশ করে, তাতে তার ব্যথিত হৃদয় পূর্ণ হয়ে গেল। সেই মুখটিকে নিজের কাছে টেনে এনে চুমু খাবার জন্যে প্রবল বাসনা বোধ করলো সে!

তার সাহস একশো গুণ বেড়ে গেল। সেই মুখের বক্তব্যের উত্তরে সে দৃপ্তভাবে মাথা নাড়লো।

অন্ধকার রাতে তুষারের ওপর মচ্‌মচ্‌ পায়ের শব্দ এখন তাদের চতুর্দিকে বিশেষ কোনও ছন্দ ছাড়াই যুদ্ধের দামামাধ্বনি, যে ধ্বনি এই পঁচিশ জনের কুচকাওয়াজে এগিয়ে চলাকে আশ্রয় করেছে। তাদের মাথার ওপরে গর্জ্যমান বাতাসের নির্ঘোষে মনে হচ্ছে এক বিশাল লাল পতাকা পত পত্‌ করে উড়ছে।

"থাম! এখানেই! তোরা কোথায় যাচ্ছিস ভেবেছিস? কুত্তার বাচ্চারা!"

বন্দুকধারী জল্লাদ বন্দুকে চাপড় দিয়ে উদ্ধতভাবে ষাঁড়ের মতো চেঁচালো।

"এখানেই।"—তাদের হৃদয়ে ভয়ানকভাবে প্রতিধ্বনিত হলো।

"কয়েদীরা লাইন লাগাও। ওদের বেঁধে ফেলো।" জল্লাদের মুখ থেকে আরো জঘন্য হুকুম ছিটকে বেরোলো।

তুলোর মোটা ওভারকোট পরা বিশৃঙ্খল সৈন্যরা তাদের ধাক্কা দিতে লাগলো আর রাইফেলের কুঁদো দিয়ে মারতে লাগলো! তারপরে বন্দীদের বুকের চারপাশ দিয়ে পিছনের কাঠের খুঁটির সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধতে লাগলো। তুষারপড়া জমিতে বুটের ও জুতোর পা-ফেলা আরো বেশী বিশৃঙ্খল হয়ে উঠলো।

তারা একটি কথাও বললো না, তাদের সমস্ত ক্রোধ ধরে রেখেছে নৈঃশব্দ্যে। শত্রুর প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করার কোনও পন্থা নেই বলে। কয়েকদিন আগে পোঁতা খুঁটিতে বাঁধা তারা, হাতে পায়ে শিকল, মৃত্যুর মুখোমুখি তাকিয়ে।

তাদের সামনে অন্ধকার রয়েছে ছড়িয়ে। বাতাস, তুষার আর শিলাবর্ষণ চলেছেই। এই পঁচিশ জনের সমস্ত শীতবস্ত্র হুলবরে আগেই খুলে নিয়েছে, শীত নির্দয় চাবুকের মতো এদের শরীরে কেটে বসে যাচ্ছে। কিন্তু এখন তারা শীতেরও অভেদ্য।

তারা ঘেঁষাঘেঁষি করে সারিতে দাঁড়ালো।

"এদিকে, আরো কাছে। ভালো করে তাক করো।"...রাতের অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে তারা অস্পষ্টভাবে দেখতে পেলো একদল লোক সামনে উঠে দাঁড়াচ্ছে ও কোনও একটা ভারি বস্তু কায়দামাফিক সাজাচ্ছে।

"ঠিক আছে। ওটা এখন রাখো। কয়েদীদের গুণতি করো!"

"এক, দুই, তিন ..." একজন সৈন্য এগিয়ে এসে গুণতে লাগলো।

চোয়াল উঁচু জল্লাদ সৈন্যটার পিছন পিছন আঙুল দিয়ে গুণতে গুণতে চললো। তাব সেই পাশবিক মুখে যেন নিপীড়িতেব প্রতি শাসকশ্রেণীর নিষ্ঠুরতার প্রতিফলন। যুবক কবির হৃদয়ে আবার একবার ঘৃণার আগুন জ্বলে উঠলো, তাতে তার চোখ আর সমস্ত শরীব জ্বলে যেতে লাগলো। তার ইচ্ছে হলো লোকটাকে আঘাত করে, পশুটাকে মেরে ফেলে, কিন্তু তার হাত শক্ত করে পিছমোড়া করে বাঁধা। সে শুধু দাঁতে দাঁত ঘষলো ও ঠাণ্ডা হাওয়ায় কাঁপতে লাগলো—ক্রোধে সে থরথর করে কাঁপছিল।

"সাথী, সাথী।" তার ডান দিকের মানুষটি তাড়া দিল। মাথা ঘুরিয়ে সে একটি পরিচিত মানুষের মুখ দেখতে পেলো, যার সঙ্গে আজ রাতের, শেষ খাওয়ার আগে অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্তা বলেছিলো।

"না, আমি আসলে একটু উত্তেজিত হয়েছি।"

"...তেইশ, চব্বিশ, পঁচিশ। কেউ পালায় নি। চমৎকার...।"

এই ষাঁড়-চেঁচানির পর জল্লাদ তুষারের ওপর দিয়ে বড় বড় পা ফেলে সেই বস্তুটির দিকে ফিরে গেল। সীমাহীন শূন্য, বাতাস আর তুষারে ভরা, ধূসরতা আর অন্ধকার...মৃত সাদাটে ধূসর তুষারের ওপব তাদের ছায়াগুলো বিশাল ও কালো।

জল্লাদ চেঁচিয়ে উঠলো, "ঠিক আছে, তৈরী থাকো, আমি বাঁশি বাজাবো, অপেক্ষা করো।' ছিলাটানা ধনুকের মতো তাদের হৃদয়ও টানটান। সেই মৃত্যুসদৃশ ভারি বস্তুটি মুখোমুখি, তার পাশে সৈন্যরা দাঁড়িয়ে। আকাশ যেন ভেঙে পড়বে, অন্ধকার তাদের পঁচিশ জনকেই চাপা দিয়ে দেবে

কিন্তু কেউ কেউ চিৎকার করে উঠলো :

"সাথীরা, ওঠো, জাগো। আমরা যদিও এখন মরছি, কিন্তু ভুলো না, আমাদের সরকার প্রতিষ্ঠার জন্যে আজ কোথাও এক বিশাল জনসমাবেশ হচ্ছে। সেটাই পালনীয় আনন্দ-উৎসব। আমাদের সরকার দীর্ঘজীবী হোক···"

অন্যরাও যোগ দিয়ে তুমুল হর্ষধ্বনি করলো, তাদের হৃদয়ে এতো কথা যা বলা হলো না। প্রকাশ করা হলো না, হঠাৎ এখনই সহসা তারা তা বুঝতে পেরে গলা ফাটিয়ে ধ্বনি তুললো।

অন্ধকার পালাতে লাগলো; একটি উজ্জ্বল বীথি তাদের সামনে উন্মোচিত হতে থাকলো—নতুন চীনের প্রতিষ্ঠা।

তীক্ষ্ণ বাঁশি বেজে উঠলো, আর পঁচিশটি উদ্বেলিত কণ্ঠ থেকে এক সাথে ফেটে পড়লো গান :

জাগো জাগো জাগো সর্বহারা
অনশন বন্দী ক্রীতদাস······

খট খট শব্দে গোটা বারো গুলি এদের সারিতে ঢুকে পড়লো। গান দুর্বল হলো, যদিও কয়েকটি কণ্ঠ আরো জোরে গেয়ে উঠলো :

···শেষ যুদ্ধ শুরু আজ, কমরেড···

আরও এক ঝাঁক গুলি ছুটে এলো, আবার বারো জন গুলিবিদ্ধ হলো। গুলি যত বাড়তে লাগলো গান তত কমতে লাগলো। শুধু কয়েকটি কণ্ঠ তখনও গেয়ে চলেছে :

গাও ইনটার ন্যাশানাল
মিলাবে মানবজাত।

তৃতীয়বার বাঁশি বেজে উঠলো। তৃতীয়বার গুলির ঝড় বয়ে গেল। এই শেষ ধাক্কায় গান শেষ হয়ে গেল।

"চুলোয় যাক, ব্যাটারা উড়ে গেছে। ওদের গান গাইতে দে!"—জল্লাদ খুশীতে খিস্তি করতে করতে ফেরার জন্যে এগোলো।

জল্লাদ হুকুম করলো, "বন্দুক রেখে তোমরা ছাউনীতে ফিরে যাও। কাল সকালে লাশগুলোকে কবর দিলেও হবে। শয়তানগুলো আর

পালাতে পারবে না, কি বলো ?"—এই বলে সে হলঘরে ফিরে চললো। কয়েক কুড়ি সৈন্য তুষারের ওপর পায়ের চাপে মচ্ মচ্ আওয়াজ তুলে ফিরে চললো।

রাত্রি স্তব্ধ, পবিত্র, সমুন্নত। তুষারের ও হিমশিলার বড়ো বড়ো টুকরো ঘূর্ণির মতো নামছে। শীত-রাতের বন্য হাওয়া ঝড়ের মতো উলটো পালটা বয়ে চলেছে। ঝুলে পড়া মাথাগুলোর যেখানে তুষার জমছে বাতাস আবার তা ঝেড়ে দিচ্ছে। খুঁটির সঙ্গে বাঁধা দেহগুলো নির্বাক, নিস্তব্ধ। এখানে সেখানে এক, দুই বা তিনটে গুলির আঘাত থেকে ঝরে পড়া রক্ত অন্ধকারে তুষারের ওপর চুঁইয়ে পড়ছে।

কখন সকাল হবে ?

অনুবাদ : সুজিৎ ঘোষ।

এক যে ছিল মেষপালক

কুও মোজো চীনের অন্যতম বিপ্লবী কবি। জন্ম ১৮৯২-এ। বেশ কিছু নাটকও লেখেন। নাটকগুলি কাব্যধর্মী। এই লোক কাহিনীধর্মী গল্পটি তিনি ১৯৬২-তে লেখেন। লেখেন খ্রুশ্চেভের "অস্ত্রহীন সৈনিকহীন যুদ্ধবিহীন" সুখস্বপ্নের রাজনৈতিক তত্ত্বের বিরোধিতা করে। গল্পটি সেই সময় চীনে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে।



কুও মোজো

এক বিশাল গাছ। সেই গাছের নিবিড় ছায়ায় এক মেষপালক বিশ্রাম করছিল। আর বিশ্রামের ফাঁকে ফাঁকে নজর রাখছিল তার ভেড়ার ওপর। তার ঠোঁটের ডগায় ধরা একটা পাইপ। কাঁধে ঝুলছিল রাইফেল।

এমন সময় সেখানে হাজির হল এক রাখাল। বয়সে কৈশোরের সীমা অতিক্রম করেছে। সেও বসল সেই গাছের ছায়ায়। তার হাতে বাঁশের তৈরি এক চাবুক।

তার হাতের চাবুক দেখে মেষপালক জিজ্ঞেস করল, "তুমি কি তোমার গরুকে এই চাবুক দিয়ে পেটাও? বুঝলে ছোকরা, হিংসা-টিংসা কিন্তু মোটেই ভালো নয়।"

রাখাল ছোকরাটিও তাকে পাল্টা জিজ্ঞেস করল, "বুঝলাম, হিংসা-টিংসা মোটেই ভালো নয়, তবে তুমি কেন অযথা রাইফেল বয়ে বেড়াচ্ছো?"

"ওঃ, রাইফেল কেন বয়ে বেড়াচ্ছি? যেন কেউ আমার ভেড়া চুরি-টুরি করতে না পারে। বলতে পার, স্রেফ ভড়কি দেয়ার জন্যে।"

বলে মেষপালক তার কাঁধ থেকে রাইফেলটা খুলে পাশে রাখল। রাখালটি নেহাৎ খেলার ছলে রাইফেলটা তুলে নিল তার হাতে। নিয়ে নেড়ে-চেড়ে দেখতে লাগল।

হঠাৎ সেই সময় সেখানে এক বাঘ এসে হাজির। বাঘকে দেখেই ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে মেষপালক তরতর করে গাছের মগডালে উঠে বসল।

এক মুহূর্ত আর দেরি না করে রাখালটি বাঘটাকে তাক করল। বাঘকে তাক করতে দেখে মেষপালক ভীষণ খাবড়িয়ে গেল। গাছের মগডাল থেকে সে গলা ফাটিয়ে চাঁৎকার করতে লাগল, "এই ছোকরা, খবরদার বাঘকে গুলি করো না। জানো না বাঘ মানুষ-খেকো।"

কিন্তু রাখাল ছোকরাটি তার চীৎকারে কোন আমলই দিল না। বাঘকে তাক করে সে গুলি ছুঁড়ল। গুলি তার দু'চোখের মাঝখানে কপালে বিদ্ধ হল। বাঘটি বেশ কিছু দূরে ছিটকে পড়ল। তার দফা রফা হল। গুলি তার মগজকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিল।

মেষপালক ধীরে-সুস্থে গাছ থেকে নামল। নেমে রাখালের মুখোমুখি দাঁড়াল, "এই ছোকরা, আমার কথায় কেন কর্ণপাত করলে না? বাঘটাকে কেন মিছেমিছি হত্যা করলে?"

রাখালটি বিস্মিত হয়ে বলল, "বাঘটাকে যদি আমি গুলি না করতাম, তবে আমিই ওর পেটে যেতাম।"

"দূর, এটা কোন কথার কথা হল। বাঘতো তোমাকে নাও খেতে পারত। বড়জোর একটা ভেড়া নিয়ে সটান দিত। তোমার বরাত ভালো বলতে হবে, কপালের ঠিক জায়গায় তাক করতে পেরেছিলে। না হলে, তোমাকে সটান বাঘের পেটে যেতে হত।"

মেষপালক রাখালের হাত থেকে রাইফেলটা প্রায় একরকম ছিনিয়েই নিল। ছিনিয়ে নিয়ে আবার গুলি ভরল। গুলি ভরে রাইফেলটি রাখালের বুকে ঠেকিয়ে বলল, "আমি বাঘটাকে আমার বাড়িতে বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে তোমার গরু নিয়ে যাচ্ছি।"

রাখাল বলল, বাঘটাকে তুমি কেন নিয়ে যাবে! বাঘটাকে তো আমি হত্যা করেছি।"

মেষপালক বলল, "এই বাঘের ওপর আমারই হক। কারণ আমার রাইফেল দিয়ে তুমি বাঘটাকে হত্যা করেছ। আমার কথায় যদি রাজি না হও, তবে তোমাকেই গুলি করে মারব।"

অনুবাদ : কমলেশ সেন

রঙ ছোপানো ভাত



ওয়াং ইয়েলিন

ওয়াং ইয়েলিন চীনের প্রখ্যাত সাহিত্যিক। জিয়াংসু প্রদেশের জিয়াংডু জেলায় ১৯৪৬ সালে তাঁর জন্ম। বর্তমানে তিনি আনহুই প্রদেশের 'ডাংটু কালচারাল সেন্টারে' কর্মরত। তাঁর অন্যান্য গল্পের মধ্যে রয়েছে 'বিড়াল' আর 'ঝেনিয়াং'। এই গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৮২ সালে।

কোনওদিন দক্ষিণ চীনে বেড়াতে এলে দেখবে রঙ ছোপানো একরকমের চিটচিটে ভাত এখানকার একটি অতিপ্রচলিত প্রাতরাশ। চকচকে বেগুনি রঙের একদলা চিটচিটে ভাত, ভেতরে তিলবাটা আর চিনির পুর ঠাসা, এক টুকরো সাদা পরিষ্কার কাপড়ে জড়িয়ে গোল্লা পাকানো, দেখতে অনেকটা একটি বড় জলপাইর মত জিনিস। ভোজনরসিকেরা ওকে আরও সুস্বাদু করে তোলার জন্য পুরের সঙ্গে মিষ্টি মিষ্টি গন্ধের ওসমানথাস কিংবা দু টুকরো প্যানকেকও জুড়ে দেয়।

ছেলেবেলায় রঙীন ভাতের এমন মোয়া বিস্তর খেয়েছি। যদিও তখন জানতাম না কি করে ওগুলোকে রঙ করে, শুধু জানতাম নৌকোতে করে দূর গাঁয়ের লোকেরা ওগুলোকে বিক্রি করে।

লিবারেশানের আগে মা, আমার ছোট মামা আর আমি আমাদের তিনজনের এই পরিবার কুইনহুয়াই নদীর ধারে সাইপ্রেস, আঙ্গুর-লতায় ঘেরা একটি ছোট্ট কোঠায় থাকতাম।

রোজ সকালে মা অনেক অনেক দূরে পড়াতে যেতেন। যাবার আগে ঘুমে ঢুলু ঢুলু চোখ ছোট মামাকে ডেকে তুলে বলতেন, "বালিশের পাশে পয়সা রেখে গেলাম। রঙ ছোপানো ভাতের মোয়ার নৌকো এলে চারটে মোয়া কিনে নিস, তোরা দুজনে দুটো দুটো করে খাবি, তবে সকালে শুধু একটাই খাবি আর একটা খাবি দুপুরবেলা। বেশী

নয় কিন্তু, মনে রাখবি, বুঝলি ? সন্ধের সময় বাড়ি এসে আমি রাতের রান্না করব ...”

এই বলে মা চলে যেতেন, ছোট্ট ছোট্ট দুটি সাইপ্রেস ফুলের মত ছোট্ট দুটি ছেলে—মামাকে আর আমাকে সেই শূন্য কোঠায় একা রেখে। মামা তো আমার চেয়ে মোটে বছর চারেকের বড় !

বিছানা থেকে উঠেই সবার আগে আমরা যে কাজটি করতাম তা হল দুজনেই একখানি করে চৌকো টুল টেনে এনে নদীর ধারের জানালার পাশে রাখতাম। ঐ টুলের উপর হাঁটু মুড়ে বসে জানালাটাকে ঠেলে খুলে দিয়ে একমনে নদীর জলের দিকে তাকিয়ে থাকতাম।

গাঢ় সবুজ সবুজ রঙের তেল তেলে কুইনহুয়াই নদীটি এঁকেবেঁকে বয়ে যেত। দুধারে তার হাজার হাজার ঘরবাড়ি যেন একটি সুতো দিয়ে গাঁথা। খুব ভোরবেলাতে, নদীর বুক থেকে কুয়াসার ঘোর পুরোপুরি না কাটতেই জলের বুকে বিকিকিনির বাজার শুরু হয়ে যেত। নৌকোগুলো এদিকে ওদিকে আনাগোনা করত। সেই সঙ্গে রকমারি জিনিসপত্র ফেরি করে বেচার হাঁকডাক, কর্মচঞ্চলতাও আনন্দমুখর এক অদ্ভুত দৃশ্যের অবতারণা করত।

“মসলা বীন চাই গো, দারুচিনি বীন চাই !” বলে হাঁকত একটি মাঝ বয়সী মেয়েছেলে, ওর টেনে টেনে সুর করে বলা স্বরবর্ণগুলো কানে বড় মিষ্টি লাগত।

“মাথার তেল, ভ্যানিশিং ক্রীম !” একটি ছোট মেয়ের বাঁশীর মত গলা মিষ্টি ইয়াংঝোউ উচ্চারণে ডাকত।

“গাধার শুকনো মাংসের ফালি. ফালি চাই গাধার শুকনো মাংসের !” বলে একটি লোক তার উত্তুরে টানে কর্কশ মোটা গলায় চেঁচাত, আর থেকে থেকে তার পেতলের দাঁড়িপাল্লার থালাটা দিয়ে নৌকোর গায়ে ঠকঠক করে আওয়াজ করত....

আমরা অবশ্য এসবের আশায় পথ চেয়ে বসে থাকতাম না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই রঙ ছোপানো ভাতের নৌকোটি এসে হাজির হত। বিক্রেতা ছিল একটি বুড়ো মানুষ। নিজের জিনিসটিকে ফেরি

করার একটি নিজস্ব বিশেষ কায়দা তার ছিল। একটি ঘণ্টার জিবকে ঠুকে ঠুকে সে আওয়াজ করত, র‍্যাট্‌-অ্যা-ট্যাট্‌। যখনই সে আমাদের কোঠার নীচে দিয়ে নৌকো বেয়ে যেত, ঘণ্টাটিকে সে জোরে জোরে বাজাত আর আমাদের দিকে তাকিয়ে গালভরা হাসি হাসত।

ওকে দেখতে পেলেই ছোট মামা আর আমি চটাপট আমাদের কাজে লেগে পড়তাম। ঐ এলাকার আর সবার মতই আমরা একটি বাঁশের ঝুড়িতে পয়সা রেখে ঝুড়িটির হাতলে লম্বা দড়ি বেঁধে সেটিকে জানালা দিয়ে খুব সাবধানে নীচে নামিয়ে দিতাম। যতটা সম্ভব ঝুঁকে পড়ে আমরা তাকিয়ে দেখতাম বুড়ো লোকটি একটি একটি করে পয়সা গুনত, দেখতাম বালতি থেকে চামচ কেটে মুঠোখানেক ধূমায়িত রঙীন ভাত তুলে নিত, তারপর সেগুলোকে এক টুকরো সাদা কাপড়ে জড়িয়ে গোল্লা পাকাত। বাড়ির গিন্নিবান্নিরা বাজারে গিয়ে জিনিস নিয়ে যেভাবে দরাদরি পীড়াপীড়ি করে, ছোটমামা তেমনি করে পীড়াপীড়ি করত, বলত, "ও দাদু, আরও একটু চিনি দাও না। না, না, ওটুকুতে হবে না। আরও দাও...."

খাবার সময় আমরা চেষ্টা করতাম একথা সেকথা বলাবলি করতে করতে একটু একটু করে তাবিয়ে তারিয়ে খেতে যাতে করে আমাদের মজাটা অনেকক্ষণ টিঁকে থাকে।

"আচ্ছা মামা, এই ভাতগুলোকে কি করে এমন রঙ করে?"

"ওগুলোকে পোড়া পোড়া করে ভেজে তবে এমন রঙ করে।"

"লোকে কি করে পোড়া ভাত খাবে?"

"কেন খাবে না? তুই জানিস না পাশের বাড়ির হুনানের লোকগুলো প্রায়ই বীনকার্ড পোড়া খায়?"

"কিন্তু তাই বলে পোড়া ভাত খেতে এত ভালো লাগে না। ওতে গলা জ্বালা করে।"—আমি জোর গলায় প্রতিবাদ করে উঠতাম।

মামা হার মানত। বলত, "বেশ, তাহলে বোধ হয় ওগুলোকে তুঁতফল দিয়ে রঙ করে। আমি তুঁতফল খেয়ে দেখেছি। তুঁতফল খেতে মিষ্টি লাগে। আর ওগুলো খেলে দাঁতও কালচে হয়ে যায়।"

একটি করে মোয়া খাওয়া সারা হলে আমাদের প্রাতরাশের পালাও

ঢুকে যেত। আমাদের চোখগুলো তখন তাকের উপর তুলে রাখা বাকী মোয়া দুটোর দিকে লোলুপদৃষ্টিতে চেয়ে থাকত। জিবে জল আসত। কিন্তু ঐ দুটো যে দুপুরের খাবার, ওগুলো তো কিছুতেই এখন খাওয়া চলবে না। আঙ্গুলে লেগে থাকা চিনি আর ভাতের কণাগুলোকে জিব দিয়ে চাটতে চাটতে আমরা একে অপরের দিকে আড়চোখে চেয়ে চেয়ে মুখ টিপে টিপে হাসতাম।

মামা হতাশ গলায় বলে উঠত, "আমি যখন বড় হব আর আমার হাতে যখন অনেক পয়সা হবে আমি তখন প্যানকেক আর তিলের পুরে ঠাসা ঝুড়ি ঝুড়ি রঙ ছোপানো ভাত কিনব। বড়লোকদের মত আমি শুধু খেয়েই যাব যতক্ষণ না আমার পেট ফাটে।"

অভাব অনটন বলে খুব বড় হয়ে ওঠার আগেই মামাকে একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠানের মিশনারী স্কুলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ১৯৪৯ সালে স্কুলটি আমেরিকায় চলে গিয়েছিল। সে সঙ্গে মামাও চলে গিয়েছিল আমেরিকায়। ত্রিশ বছর আমরা তার কোনও খবরাখবর পাই নি।

চীন-মার্কিন সম্পর্ক স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত মামার এদেশে আসার সুযোগ হয় নি।

একটি একটি করে বছর কেটে গেছে। মামা এখন একজন গণ্য-মান্য সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক।

তার হাতখানা হাতে নিয়ে আমি বলেছিলাম, "তোমাকে আমি ভালো ভালো খাবার খাওয়াব। বল তুমি কি খেতে চাও?"

মামা হেসেছিল, বলেছিল "কত কত কিছু খাব। ভাজা বীনকার্ড, শেফার্ডস পার্স, পার্সলেন দেওয়া শূয়োরের মাংসের স্টু, গেঁজে ওঠা চটচটে ভাত……। আর আর আমি পেট ভরে খাব দক্ষিণ চীনের সেই আসল রঙ ছোপানো ভাত।"

আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। বিরাট এক কোম্পানীর ডিরেক-টার সে আজ, সে কেন এ ধরনের সাদামাটা খাবার খেতে এত উৎসুক? হেসে তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "এখনও তুমি কি করে রঙ ছোপানো ভাতের মোয়া খাবার কথা ভাবছ?"

"ভাবব না কেন?" একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে মামা বলেছিল, 'শুভ্র শিশির ঝলমলিছে এ রাতে, দেশে মোর চাঁদ হাসিছে।' তুমি কল্পনাও করতে পারবে না প্রবাসী চীনবাসী আমাদের ঘরে ফেরার জন্য আঁকুপাঁকু মন আর জীবনের কথা। আজ কত বছর ধরে আমার মনে বড় সাধ আমি আমার দেশের তৈরী রঙ ছোপানো ভাতের একটি মোয়া খাব! গরম গরম, মিষ্টি মিষ্টি, নরম নরম, মৃদু মৃদু, ঘাস ঘাস গন্ধে ভরা সে মোয়া! সেই যে সেই বুড়ো লোকটি বিক্রি করত। সে তার রঙ ছোপানো ভাত গোল্লা পাকিয়ে পাকিয়ে দিতে দিতে হাসত, হাসতে হাসতে আমাদের হাতে মোয়া তুলে দিত…। রঙ ছোপানো ভাতের সে মোয়ার সঙ্গে আর কি কোনও কিছুর তুলনা চলে? ও মোয়ার মধ্যে রয়েছে অন্তরের কতখানি মমতা? আর তাইতেই তো আমি এতগুলো বছর ধরে একদিনের জন্যও পুরানো সে সব দিন আর আমাদের দেশের দরদী সুন্দর মানুষগুলোর অভাব অনুভব না করে পারি নি।"

মামা আমার ফিরে এসেছে স্নেহ, মমতা আর অন্তরঙ্গতার খোঁজে। তবুও আমি কিন্তু অসময় বলে সেবারে তাকে দক্ষিণ চীনের সেই আসল রঙ ছোপানো ভাতের মোয়া দিয়ে আপ্যায়িত করতে পারিনি।

ফিরে যাবার সময় বিমানে ওঠার আগে মামা আমাকে বলেছিল, "ঈস, কী আপসোস!" আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে সে তার রঙ ছোপানো ভাত খেতে পায়নি বলে আক্ষেপ করতে করতে ফিরে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে আমার এও মনে হয়েছিল যে এটা বোধ হয় ততটা খারাপ হয়নি, কারণ সে যদি রঙ ছোপানো ভাতের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা আমার সে দুঃখবেদনার কথা শুনত আর সে সঙ্গে যদি শুনত আমার লজ্জার কথা তাহলে সে হয়ত মনে আরও বেশী দুঃখ পেত।

কেমন করেই বা আমি সেসব কথা ওর কাছে খুলে বলতাম?

ঘটনাটি ঘটেছিল আজ থেকে বছর বারো আগে। আমি তখন একখানি পাহাড়ী গাঁয়ের স্কুলে কাজ করছিলাম। শিক্ষক বলতে একা আমি। ছাত্রছাত্রী আমার উনিশটি। জীবন যাপন ছিল বড়ই কষ্টকর। একটি সমস্যা ছিল আমাদের খাবারের। খাবারের জন্য আমাকে আমার

ছাত্রদের উপর নির্ভর করতে হত।

রোজ দুপুরে ক্লাসের পরে আমার ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে আমি পাহাড়ে যেতাম পাইনগাছের সেই মোচার মত ফল আর শুকনো ডালপালা কুড়িয়ে আনতে। ওগুলো কুড়িয়ে আনতাম জ্বালানির জন্য। ছেলেমেয়ে-গুলো ছিল সাদাসিধে সরল। তারা চাইত না আমি ওসব কাজ করি। কিন্তু আমি ওদের খুব ভালবাসতাম। ওরা পরিশ্রম করবে আর আমি বসে বসে পা দোলাব এতে আমি মোটেই রাজী ছিলাম না। কাজেই আমি সব সময় আমার উৎসুক অথচ আনাড়ী হাতখানা এগিয়ে দিতাম।

একদিন আমাদের প্রধান পাচক জাইআওটি ডাঁই করে রাখা পচা তক্তাগুলোকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করল," আচ্ছা, মাস্টারমশাই, আপনি এগুলো কুড়িয়ে এনেছেন কেন ?"

"ওগুলো দিয়ে রান্না করা যাবে না ?"

"কিন্তু ওগুলো যে কফিনের তক্তা !"

শুনে সবাই অট্টহাসিতে ফেটে পড়েছিল। আমি লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছিলাম। বলেছিলাম, "ওগুলো জ্বালিয়ে আমাদের রান্না করা যাবে না কেন ?"

"হায়! হায়! কী বোকা আপনি! এতো সোজা কথা। ঐ তক্তাগুলো জ্বালিয়ে রান্না করলে খাবারে বিচ্ছিরি গন্ধ হবে।" বলে কোন রকম মায়াদয়া না দেখিয়ে জাইআওটি আমার কষ্ট করে কুড়িয়ে আনা কাঠগুলোকে টান মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল।

আমি রাগে দিশাহারা হয়ে গিয়েছিলাম—একটি ছাত্র হয়ে সে কি করে তার মাস্টারমশাইকে বোকা বলতে সাহস করে? যাই হোক শিক্ষক হিসাবে নিজের বাকী মান মর্যাদাটুকু বাঁচিয়ে রাখতে আমি আমার রাগটাকে কোনও মতে চেপে গেলাম বটে, কিন্তু মনে মনে আমি জাইআওটির উপর প্রচণ্ড রেগে গেলাম।

পরদিন ঢালু পাহাড়ের গায়ে মাঝামাঝি এক জায়গায় জাইআওটি যখন একটি গাছের পাতা খুব জোরে জোরে বাড়ি মেরে মেরে পাড়ছিল সে সময় আমি গিয়ে ওকে হাতে নাতে ধরে ফেললাম, পাতাগুলো

দেখতে অনেকটা এলম্ গাছের কিংবা চীনা গোলাপ গাছের পাতার মত ছিল। একমনে কাজ করতে করতে সে তার গায়ের জামাটা খুলে ফেলেছিল পাতাগুলোকে কুড়িয়ে আনার জন্য।

ওদেশের চাষীরা শূয়োর ছানাদের ওক গাছের পাতা খাওয়াত। তাই পাহাড়ের উৎরাই বেয়ে ফিরতে ফিরতে আমি জাইআওটিকে তিরস্কার করে বলেছিলাম, "আর সবাই যখন কাঠকুটো কুড়োতে ব্যস্ত তখন তুই কিনা নিজের জন্য পাতা কুড়াচ্ছিস? এতটা স্বার্থপর তুই? এই তোর কর্তব্য বোধ? এই তোর সবার জন্য দরদ?"

সে পাতার বোঝাটি কাঁধে নিয়ে কোনও কথা না বলে চুপচাপ আমার পিছু পিছু নেমে এসেছিল।

রান্না হয়ে গেলে সেদিন আমি ওকে বাড়ি চলে যেতে বলেছিলাম। বলেছিলাম, "এই খাবার তৈরীর ব্যাপারে তুই যখন কিছুটি করিস নি. তখন এই খাবারে ভাগ বসাবারও কোনও অধিকার নেই তোর।"

সে না খেয়ে খালি পেটে চলে গিয়েছিল আর আমি অন্যায় প্রতিহিংসা চরিতার্থতার তৃপ্তি লাভ করেছিলাম।

সেদিন বিকালে ক্লাসের শেষে আমি জাইআওটির জামাটিকে হাতে নিয়ে ঝেড়ে ঝেড়ে সব পাতাগুলো ফেলে দিলাম। দিয়ে জামাটি একটি ছাত্রের হাতে দিয়ে বললাম জাইআওটিকে দিয়ে আসতে। ছেলেটি হাসি চেপে বলে উঠেছিল, "আহা মাস্টারমশাই, আপনি তো ভাত রাঙানোর সব কটিপাতা ফেলে দিলেন?"

"ভাতা রাঙানোর পাতা?" আমি অবাক হয়ে গেলাম। "রঙ ছোপানো ভাত কি তাহলে তুঁতফল দিয়ে রাঙায় না?"

শুনে আমার ছাত্রছাত্রীরা সবাই হো হো করে হেসে উঠেছিল। বলেছিল, "ফেরিওয়ালারা আপনাদের মত শহুরে লোকদের ঠকাতে ঠিক এই কথাই বলে থাকে। তুঁতফল দিয়েই যদি রঙ করত তাহলে কেমন করে ওরা খরচ পোষাত? এখানকার প্রতি ঘরে ঘরে লোকেরা ভাত রাঙানোর এ পাতাগুলো কুড়িয়ে নিয়ে গিয়ে শহরে বিক্রি করে।"

"কত করে জিন এ পাতার?"

"পনের ফেন।"

"জাইআওটিও কি পাতাগুলো কুড়িয়েছিল বিক্রি করার জন্য ?"

"তাই হবে হয়ত ! সে আর তার মা একটি কুঁড়েঘরে থাকে। বড় গরীব ওরা। প্রত্যেক বছর কিং মিং উৎসবের পরে সে পাতা কুড়িয়ে নিয়ে গিয়ে বেচে। তা নইলে সে তার পড়ার খরচ পাবে কোথায় ?"

"কিন্তু এত ভারী বোঝা সে বয়ে নিয়ে যায় কি করে ?" জাইআওটির ছোট্ট শরীরটি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল।

"আমরা সবাই মিলে একশ জিনের ওপর পাতা বয়ে নিয়ে যেতে পারি। তা নইলে এত দূরে শহরে যাওয়া আসা পোষাবে না।"

ছাত্রছাত্রীরা সবাই বাড়ি চলে গেল। ওদের প্রতি ভালবাসায় আমার মন ভরে উঠল। একা একা চুপচাপ বসে বসে আমি ওদের কথাই ভাবছিলাম।

জাইআওটির জন্য আমার বড় অনুকম্পা হল, অনুকম্পা হল আমার নিজের জন্যও।

জাইআওটির জন্য অনুকম্পা হল সে এত দুঃখ কষ্টে জীবন কাটাচ্ছিল বলে।

আমার নিজের প্রতি অনুকম্পা হল আমার অজ্ঞতার জন্য।

ঠিক করলাম জাইআওটিকে ক্ষমা করে দেব।

পরদিন, জাইআওটি ফিরে এল। এসে আমার ঘরে ঢুকল। ঢুকে বিনীতভাবে এক ঠোঙা ভাতের মোয়া আমার হাতে দিল। "এসব কেন ?" আমি জানতে চাইলাম।

সে আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে পালটা প্রশ্ন করল, "মাস্টার মশাই, ভাত রাঙানোর সে পাতাগুলো কই ?"

"ওগুলো সব একজায়গায় জড়ো করে রেখেছি আমি।"

"তাহলে আজ ক্লাসের পরে আমি ওগুলো কুচিকুচি করে দেব, আর চালের সঙ্গে ওগুলোকে চুবিয়ে রেখে দেব। আপনি তাহলে কাল দুপুরে রঙ ছোপানো ভাত খেতে পারবেন।"

আমি অভিভূত হয়ে পড়লাম। বললাম, "না, না, ওগুলো তুমি

বাড়ি নিয়ে যাও। অনেক কষ্টেসৃষ্টে তোমাদের দিন চলে। প্রত্যিটি পয়সা দামী।"

"আমার মা আপনাকে আমাদের বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়ে খাওয়াতেন, কিন্তু মার যে অসুখ। মা বলাবলি করেন আপনি বাড়িঘর ছেড়ে এই দূর বিদেশে একা একা পড়ে রয়েছেন। নিজে থেকে এখানে পড়ে রয়েছেন। খাওয়া দাওয়া আপনার ঠিকমত হচ্ছে না। আমরা গরীব, ভালো খাবার জোগাড় করার সাধ্যি নেই। তাই কিছু পাতা আর চটচটে চাল জোগাড় করেছিলাম আপনার একটুখানি মুখ বদলাব বলে।"

আমি হতভম্ব। কাল তাহলে সে আমারই জন্য পাতা কুড়োচ্ছিল! আজ এখনও সে আমার কথাই ভাবছে! একটি নতুন শিক্ষার্থী যে নাকি বীজ বোনা কিংবা শস্য কাটা সম্বন্ধে কিছুই জানেনা।

আমাদের চাষীরা এমনিই, মন ওদের উদার, বড় পরোপকারী ওরা। ওরা দোষ ত্রুটি ক্ষমা করে দিতে পারে, পারে অপরের ক্ষুদ্রতা নীচতাকে সয়ে নিতে।

পরদিন, আমি বিরাট একটি হাঁড়িতে করে রঙ ছোপানো ভাত রাঁধলাম, রেঁধে সব ছাত্রছাত্রীদের ডাকলাম। রঙ ছোপানো ভাত বিক্রি করত যে বুড়ো তার মত করে করে আমি একখানি সাদা তোয়ালে দিয়ে একটির পর একটি মোয়া পাকালাম। প্রথম মোয়াটি তুলে দিলাম জাইআওটির হাতে।

আমার নিজের হাতের তৈরী রঙীন ভাতের মোয়া খেতে খেতে অদ্ভুত এক অনুভূতি আমাকে অভিভূত করে ফেলেছিল।

কি করে করে এই চকচকে বেগুনি রঙ? আজ ত্রিশ বছর পরে আমি তার উত্তর পেলাম। সাদা সাদা চাল পাতার রসে ছোপানো।

কবে আমি পারব এসব চাষীদের মত উদার হতে? আজ বুঝেছি ওদের দুঃখকষ্টকে ভাগ করে না নিতে পারলে আমি কোনও দিন ওদের একজন হয়ে উঠতে পারব না।

শেষ পর্যন্ত আমি হাজার হাজার মাইল দূরে আমার মামাকে সব

কথা লিখে জানালাম। জানালাম আমার মনের উপলব্ধির কথা। শীগগিরই মামার কাছ থেকে উত্তর পেলাম। মামা লিখেছে :

"তিক্ততার আস্বাদ পেলে পরেই তুমি মাধুর্যকে যথাযথ ভাবে উপলব্ধি করতে পারবে। তোমার চিঠিখানি স্বদেশে ফিরে যাবার আমার সংকল্পকে আরও দৃঢ় করে তুলেছে। অমন আমার যে স্বদেশ আর অমন চমৎকার স্বদেশবাসী থাকতে আমার এভাবে দূর দূরান্তরে বিদেশ বিভূঁয়ে লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ানোর কোনও যুক্তি নেই। 'পরম আনন্দময় পুষ্পশোভিত নগরী, কিন্তু আমি একান্ত মনে কামনা করছি আমার ছোট্ট প্রিয় সে সুন্দর কুঁড়েঘর খানি।"

আমি ঠিক করেছি মামা ফিরে এলে আমি ওকে দক্ষিণ চীনের খাঁটি সেই রঙ ছোপানো ভাত রেঁধে খাওয়াব। এবারে আর আমার ভুল হবে না!

অনুবাদ : স্বরাজ সেনশর্মা

ইয়াং ঝেনসেঙ (১৮৯০—১৯৫৬) সানদং প্রদেশের সমুদ্রতীরের শহর পেঙলেই-তে জন্মগ্রহণ করেন। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় জেলেদের দুরবস্থার সঙ্গে পরিচিত হন ও পুরনো সমাজের অন্যায়-অত্যাচারের বিরোধী হয়ে ওঠেন। পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রাবস্থাতেই তিনি নতুন সংস্কৃতি আন্দোলনে সক্রিয় সদস্য ও তাঁর প্রথম গল্প নতুন জোয়ার (নিউ টাইড) নামক প্রগতিশীল সাময়িক পত্রে ছাপা হয়। স্নাতক হয়ে তিনি আমেরিকায় যান ও কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনো করেন। দেশে ফিরে বহু বছর শিক্ষাসংক্রান্ত কাজে আত্মনিয়োগ করেন, পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়-সহ অনেকগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। তাঁর অধিকাংশ রচনাই ছোটগল্প ও উপন্যাসোপম বড় গল্প। এই সব রচনায় পুরনো সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ ধ্বনিত। তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য—ভাষার ঔজ্জ্বল্য অথচ স্পষ্ট ভাব প্রকাশ, শব্দের পরিমিত ব্যবহার এবং জীবন্ত দৃঢ়বদ্ধ কাহিনী-সংস্থান।

একতরফা বিয়ে



ইয়াং ঝেনসেঙ

হেমন্তের শেষে কয়েক খণ্ড মেঘ ঘুরছিল আকাশের এপার ওপার। বাতাসে রাস্তাগুলো ঝেঁটিয়ে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। তাতে সূর্যের আলো যেন রাস্তার ওপরে সাদা হয়ে জ্বলছিল। সময়টা মধ্যাহ্নের একটু আগে। মেয়েরা আর বাচ্চারা বাড়ির দরজার সামনে দাঁড়িয়ে উত্তেজিত হয়ে কথা বলছিল। বাতাসে শানাই-এর সুর ভেসে আসছিল—স্পষ্ট কিন্তু বিষাদে ভরা।

"দেখ, দেখ, ওই তারা আসছে"—একজন স্ত্রীলোক গলা লম্বা করে

একদল লোক হুল্লোড় করতে করতে শোভাযাত্রা নিয়ে এগিয়ে এলো, হাতে তাদের নানা রকম নিশান। তার পিছনে আসছে নীল পশমের কাপড়ে ঢাকা একটা দোলা। দোলার মধ্যে একটি কাঠের স্মৃতিফলক শোয়ানো। তার পিছনে আরো একটা নীল পশমের কাপড়ে ঢাকা দোলা, তাতে একটি আঠারো-উনিশ বছরের মেয়ে। মেয়েটির পরনে শোকের পোশাক। একটুকরো কালো রেশমে তার মাথা ঢাকা, প্রান্ত দুটি তার কাঁধের কাছে লুটোচ্ছে। মেয়েটি একেবারে ফ্যাকাশে। শুধু তার ঠোঁটের রঙে সামান্য যেটুকু প্রাণের চিহ্ন। সে মাটির পুতুলের মতো সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে, স্থির হয়ে বসে আছে।

"এতো ঝাঙ্ পরিবারের মেয়ে"—একটি স্ত্রীলোক এক বুড়িকে দ্বিতীয় দোলাটা দেখিয়ে বলল।

"সবাই বলছিল, বিয়ের কথা পাকা হয়ে যাবার দু-এক মাসের মধ্যেই লোকটি মারা যায়। মেয়েটি কোনোদিন তাকে দেখেও নি।"

"আহা, এরকম একটা সুন্দর মেয়ে। বাপমাই বা কি করে ছেড়ে দিল···" এক দমক কাশির চোটে বুড়ির কথা বন্ধ হয়ে গেল।

একটা ছোট ছেলে মাথা উঁচু করে মাকে জিজ্ঞেস করল, "মা, এটা কি শবযাত্রা?"

"চুপ করে থাক্। ওরা নতুন বউকে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছে"—ধমকে উঠল মা। বাচ্চাটাও নাছোড়, জিজ্ঞেস করল, "তা হলে বর কোথায়?" "ওই তো, প্রথম দোলার ভেতর"—মা অধৈর্য হয়ে ধমক দিল। ছেলেটি গলা বাড়িয়ে দেখলো, তার মুখটা হাঁ হয়ে গেল। ছেলেটা কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু ততক্ষণে তার মা অন্যদিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে পড়শীর সঙ্গে কথা বলছে। ছেলেটা ঠোঁট ফুলিয়ে মাথাটা নত করল। অস্পষ্টভাবে বলল, "ওটা তো শুধু কাঠের ফলক।"

শোভাযাত্রা যখন এক বিশাল বাড়ির সদর দরজায় এসে দাঁড়ালো, লম্বা গাউন আর ছোট জামা পরা দুজন লোক এগিয়ে এসে প্রথম দোলাটা থেকে কাঠের ফলকটা নিয়ে গেল। দুজন স্ত্রীলোক শোকের শ্বেতবস্ত্র-পরিহিত বধূকে দোলা থেকে নামতে সাহায্য করল। সামনে

কাঠের ফলক, তার পিছনে ছ-হাত লম্বা রেশমের দড়িতে বধূকে ফলকটার সঙ্গে বেঁধে তারা আস্তে আস্তে এগোতে লাগল। তারপর যখন শানাই-এ বিষণ্ণ বাজনা বেজে উঠলো, একটা নীল গালিচার ওপরে তারা পাশা-পাশি দাঁড়ালো—কাঠের ফলক বাঁ দিকে, বধূ ডান দিকে—স্বর্গ ও পৃথিবীকে প্রণতি জানালো, পূর্বপুরুষের পূত সমাধিতে জানালো প্রণাম, তার পরে বাড়ির ভেতর ঢুকে বরের বাবা-মাকে প্রণাম করলো। তারপরে, আবার কাঠের ফলকটাকে আগে আগে রেখে, যার সঙ্গে বধূ কালো রেশম দিয়ে তখনও বাঁধা, তার সঙ্গে তাকে তারা বাসরঘরে নিয়ে এল।

ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের মুখোমুখি একটি কাঠের বেদিকা। এর ওপরে বরের স্মৃতি-ফলকটি সোজা করে রাখা হল। ক্ষীণ নীল শিখার কম্পমান একটি তৈলপ্রদীপ রাখা হল ফলকটির সামনে। জানালার কাছে ব্রোঞ্জের পালঙ্ক একটা সাধারণ সাদা চাদরে ঢাকা। বালিশের ঢাকার পাড়গুলি ম্যানডারিন ঐতিহ্যে সুতোর কাজে অচ্ছেদ্য প্রেমের প্রতীক। হংস-হংসীর ছবি তোলা, কিন্তু গাঢ় রঙে নয়।

অনেক রাতে যখন সব কিছু শান্ত, স্তব্ধ, তখন স্মৃতিফলকের পাশে একটা চেয়ারে বসে বধূ বিছানার দিকে তাকিয়ে থাকল। এক দমকা পশ্চিমা বাতাস জানালার মধ্য দিয়ে বয়ে এলো, ফলে প্রদীপের শিখা নেচে উঠলো ও কালো ধোঁয়ার মেঘ ছড়িয়ে যেন অন্ধকার ছায়া জেগে উঠলো। বাইরে, বাঁশঝাড়ের পাতায় সশব্দ খসখস ধ্বনি।

পরের বছরে বসন্তের শেষে এক বিকেলে দিবানিদ্রার শেষে বাড়ির পিছনের বাগানে বধূ পায়চারী করছিল। ফুলের সুবাসে বাতাস ভারি। তার স্নায়ুপেশীতে পরিতৃপ্তিকর নরম ও শিথিল অনুভব। উইলোর আঁশ হাওয়ায় মাটির উপরে গড়িয়ে গড়িয়ে দলা পাকাচ্ছে। হঠাৎ চমকে-ওঠা প্রজাপতিরা ফুলের মধ্যে থেকে জোড়ায় জোড়ায় উড়তে শুরু করেছে আর তার মুখের কাছে ডানা ঝাপটাচ্ছে। অলসভাবে সে উইলোর নরম তন্তু হাতে নিয়ে সেই পাথুরে বাগানে কিছু বোনার জন্যে পাথরের ওপর বসলো। কিন্তু কি যে বুনবে, ভেবে পেল না।

সে পলাশ গাছের দিকে তাকিয়ে থাকলো। ফুলগুলির অর্ধেক পাপড়ি ঝরে গেছে। যেগুলো কোন রকমে বৃন্তে আঁকড়ে আছে, বয়ে আসা হাওয়া যেন তাদের শত্রু। এক চড়াই-দম্পতি ঝরা পাপড়ির ওপর বাসা বেঁধেছে, অস্ত সূর্যের আলোয় তাদেব পালক বিন্যস্ত করেছে, ঠোঁটে ঠোঁট দিয়ে সোহাগ জানাচ্ছে, নানা ধ্বনিতে ভরিয়ে তুলেছে। গাছের একটা শাখা থেকে দুটো কাঠবিড়ালী লাফিয়ে নামল আর পাখি দুটো ডানা ঝাপটিয়ে উড়ে গেল,সে ঝাপট অনেকগুলো পাপড়িকে উড়িয়ে দিল। চিক্‌চিক্ করে ডেকে কাঠবিড়ালীরাও ছুটে পালালো।

সচকিতভাবে সজাগ হয়ে মেয়েটি আবিষ্কার করলো যে সে উইলো তন্তুগুলিকে কখন টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলেছে। সেগুলি ছিন্ন হয়ে মাটিতে ছড়িয়ে রয়েছে। সে উঠে দাঁড়ালো ও তাব বসন ঠিক করলো। উদাসভাবে ঘুরতে ঘুরতে নিজের ঘরে ফিরে এল। তার মুখের রক্তাভায় মনে হচ্ছিল মুখ যেন তার পুড়ে যাচ্ছে। আয়নায় সে নিজেকে দেখলো। তার মুখ যেন গোলাপী আর সাদা রঙের প্রলেপ মাখানো। গাল দুটি যেন লাল ফুল। সে কয়েক পা পিছিয়ে গেল, একটা চেয়ারে বসলো। নিষ্প্রভ চোখে কাঠের স্মৃতিফলকটার দিকে তাকিয়ে থাকলো।

পরদিন প্রাতে সে তার ঘর থেকে বেরোলো না,এমন কি বেলা বেড়ে রোদ্দুরে জানালা ভরে গেল। ঝি সকালের শুদ্ধিস্নানের জন্যে জল এনে বার বার ফিরে গেল। কিন্তু মেয়েটির দরজা বন্ধই থাকলো। ভেতরেও কোন সাড়া পাওয়া গেল না। সন্দেহবশে ঝি জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলো। দৃশ্য দেখে সে ভয়ে বোবা হয়ে গেল। ড্যাবডেবে চোখে সে বরের মা, বাড়ির গিন্নির ঘরের দিকে দৌড়লো। বেশ কিছুক্ষণ নির্বাক থেকে হুম করে বলে উঠলো; "ছোটগিন্নি গলায় দড়ি দিয়েছে।"

অনুবাদ : সুজিৎ ঘোষ

চাকিওয়ালা ওয়াঙ



ইয়াং ঝেনসেঙ

তপ্ত গ্রীষ্মের এক দুপুর, দুপুরের খাবার সময়ের অল্প পরে। গাছের ছায়া মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। বাতাস স্তব্ধ। এ রকম দমবন্ধকরা আবহাওয়ায় মনে হচ্ছে পৃথিবীও নিঃশ্বাস নেওয়া বন্ধ করেছে। জ্বলন্ত, ভয়ঙ্কর সূর্য ধীরে ধীরে আকাশ বরাবর গুঁড়ি মেরে এগোচ্ছে, যেন সমগ্র ধরিত্রীই গলে যাচ্ছে। চতুর্দিক ভয়াবহ স্তব্ধ। কোথাও কোন গতি নেই, শব্দ নেই। ঘাস আর ফুল নুয়ে পড়েছে। চঞ্চল পাখিরাও মূক হয়ে গেছে। শুধু পিঁপড়েদের উত্তাপে কোন ভয় নেই, তারা শুধু দগ্ধ মাটির ওপর দিয়ে দ্রুতবেগে আনাগোনা করছে। আর মৌমাছিরা ফুলের চারপাশে অনন্ত অধ্যবসায়ে গুনগুন করছে। বাগানের উত্তর-পূর্ব কোণে পতনোন্মুখ একটি খড়ো কুঁড়ে দাড়িয়ে। জানালার পচা কাঠের ফ্রেমের মধ্যে দিয়ে গমভাঙা-কলের চাকির ভারি ঘড়ঘড় শব্দ শোনা যাচ্ছে। এই শব্দই মৃত্যুর মতো নৈঃশব্দ্যকে ভঙ্গ করছে।

বছর তিরিশের একটি লোক গম ভাঙছে। তার ভাঙা গালের পাশ বেয়ে ঘামের ধারা বইছে। তার কোঁকড়া চুল আটার গুঁড়ো লেগে হেমন্তের তুষার লাগা ঘাসের মতো দেখাচ্ছে। মোটা সুতির নীল প্যান্ট ঘামে জবজবে ভেজা, হাঁটুর কাছে ছেঁড়া, কিন্তু পায়ের সঙ্গে লেপটে

রয়েছে। বালক বয়সে যখন সে তার বাপ-মাকে হারায়, তখন থেকেই গম ভেঙে চলেছে। প্রথম প্রথম একাজে তার শরীর ঝিমঝিম করতো। মনে হতো দিন শেষ হতেই চায় না। পা দুটো এমন শক্ত হয়ে যেত যে হাঁটতে পারতো না। পরে সে একাজে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। চাকির যাঁতার দুটো জড় বোবা পাথরের মতো সেও যন্ত্র হয়ে পড়লো।

চাকির পাথর দুটো গম ভাঙতে ভাঙতে কয়েক ইঞ্চি ক্ষয়ে গেছে। ওয়াঙের ঝরে পড়া ঘামে মাটির মেঝের গর্ত ভরে উঠছে। তার পা সশব্দে সেই গর্তে পড়লো। তার গালে আর সারা মুখে জুলফি, আর গোঁফ গজিয়ে উঠেছে কাঁটাঝোপের মতো। পড়শীর একটা সাদাকালো কুকুর মাঝে মধ্যে লাফিয়ে লাফিয়ে আসে, ফেলে-দেওয়া এঁটোকাঁটার জন্যে লেজ নাড়ায়। এই কুকুরটা বাদে চাকির যাঁতার পাথর দুটোই তার একমাত্র সঙ্গী।

উঠোনের পাঁচিলের পায়ের কাছের ছায়া ধীরে ধীরে দীর্ঘতর হয়। গাছের নিচে শুয়ে-থাকা গোরুটা তার বাছুরের জন্য উঠে দাঁড়ালো। কাকের ছানারা মুখ হাঁ করে, গলা লম্বা করে মাকে ঘরে ফেরার জন্যে ডাকলো। সূর্য পশ্চিমের পাহাড়চূড়ায় ছাপ ফেলে অর্ধেক আকাশটা রক্তবর্ণ করে তুললো। ওয়াঙ ছায়ান্ধকার চাকির ঘরটা থেকে বেরোলো। হাত দিয়ে চুল থেকে আটা ঝাড়লো এবং বাঁদিকে নদীর পথে চললো হাত-মুখ ধুতে। তারপর সে নদীর পাড়ে বসে সাদা-কালো কুকুরটার সঙ্গে একটা কালো কুকুরের ছোটাছুটি-খেলা দেখতে লাগলো। ঝাঙ্‌দের সৌভগ নামের বাচ্চাটা, দুহাতে কাদা মেখে কালো একটা গাছের আড়াল থেকে উঁকি দিল আর ওয়াঙের কাছে ছুটে এলো।

"মা কিছুটা গম ভাঙাতে চায়, তুমি কি কাল সময় করে ভেঙে দিতে পারবে?"

"হ্যাঁ, কালকে সকালবেলা আমার প্রথম কাজ হবে তোমাদের গমটা ভেঙে দেওয়া"—বলল ওয়াঙ। বাচ্চাটা হাসলো। "মা বলেছে আমাকে অনেকগুলো পিঠে ভেজে দেবে। পরশু দিন তো দ্বিতীয় সপ্তমী পরব"—বলে ছেলেটা ছুটে চলে গেল যেখানে কুকুরগুলো খেলছে।

সে হাত বাড়িয়ে কালো কুকুরটার গলা জড়িয়ে ধরলো আর মহানন্দে তাদের সঙ্গে কুস্তি করতে লাগলো। তারপর সে বললো, "বাবাকে রাতের খাবার খেয়ে যাওয়ার জন্যে ডাকতে যেতে হবে।"—বলে সে ছুটে উত্তর দিকের সবজি-বাগানের ভেতর দিয়ে দৌড় দিলো। কুকুর দুটো তার পিছনে দৌড়ের প্রতিযোগিতা লাগালো। অল্প পরেই ঝাঙ্ এসে হাজির হল, তার কাঁধে কোদাল। পিছনে লাফাতে লাফাতে এল সৌভগ। ছেলেটা থামলো ও বাবার জন্যে দাঁড়ালো তার ছোট্ট মুখটা তুলে বাবাকে কি প্রশ্ন করতে। কিন্তু ঝাঙ্ হাত ধরে টানতে টানতে গাঁয়ের পশ্চিমপ্রান্তের দিকে চলে গেল।

ওয়াঙ অভিভূত হয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো। বাচ্চাটার হাসি-মাখা মুখটা মন কেড়ে নেয়, তার প্রাণচঞ্চলতা সবকিছুকেই যেন জীবন্ত করে তোলে। দৃশ্যটা ওয়াঙের মনে গভীর ছাপ ফেললো। তার কল্পনাকে নাড়া দিল। কিছুক্ষণ আনমনা বসে থাকার পরে ওয়াঙ উদ্দেশ্যহীন-ভাবে হেঁটে কুঁড়েতে ফিরে এলো। স্পষ্টতঃ তার মনে কিছু একটা হয়েছে, কেননা সে কিছু খেতে পারলো না। সে চুপচাপ বিছানায় শুয়ে থাকলো, কিন্তু চোখদুটো থাকলো খোলা। এখন পৃথুলা পৃথিবী অন্ধ-কারের আবরণে ঢাকা। দূরে কুকুরের ডাক ও জানালার বাইরে ঝিঁঝির ডাক ছাড়া সারা পৃথিবী শান্ত।

ওয়াঙের মনে হল সে চাকি ঘরেই রয়েছে। কিন্তু সে হাতে চাকি চালাচ্ছে না—একটা বড় গাধা চাকি ঘোরাচ্ছে। ওয়াঙ শুধু চাকির মধ্যে গম ভরে দিচ্ছে আর আটা সরিয়ে নিচ্ছে। লম্বা মুখ, খাড়া বড়োকান গাধাটা যেন চাকির চারপাশে উড়ে বেড়াচ্ছে। আটা দ্রুত বেরিয়ে আসছে। ওয়াঙ খুশি হয়ে দেখছে। পিছন থেকে কেউ প্রশ্ন করলো, "বাবা, তুমি খেতে যাচ্ছ না? মা তো সবকিছু তৈরী করে বসে আছে।" ওয়াঙ চারপাশে ঘুরে দেখলো। একটা বছর পাঁচেকের ছেলে দাঁড়িয়ে। তারই ছেলে, দিনের বেলায় দেখা সৌভগ নামের ছেলেটার চেয়ে ভালোই দেখতে।

ওয়াঙ তাকে কোলে তুলে চুমু খেল। সুখে ওয়াঙের ঠোঁট কাঁপতে লাগলো।

"আমার পিঠের জন্যেই কি গম ভাঙছো তুমি ?" তার গলা জড়িয়ে শিশু প্রশ্ন করলো।

"হ্যাঁ, অনেক পিঠে হবে, সেগুলো পর পর গেঁথে তার মাথায় একটা ছোট আপেল ঝুলিয়ে দেবো। কেমন হবে ব্যাপারটা।"—ওয়াঙ উত্তরে বললো। শিশু এক মুখ সুন্দর দাঁত বের করে মহা খুশিতে হাসলো।

ছোট ছেলেটাকে কোলে নিয়ে ওয়াঙ চাকিঘরের বাইরে এলো। তার বউ, বছর কুড়ি-বাইশ বয়েস, ব্যস্তভাবে খাবার টেবিল সাজাচ্ছে। ওয়াঙ নিজের মনেই ভাবলো, ওয়াঙ পরিবারের জ্যেষ্ঠা কন্যা নদীর এই পশ্চিম পাড়ে এসেছে। তার বৌ টেবিল দেখিয়ে বললো তাগিদ দিয়ে, "তাড়াতাড়ি এসো, খাও, খাবার সব ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।" বড় থালায় গরম মাংসের স্টু, শসা আর টাটকা রুটি দেখেই ওয়াঙ প্রচণ্ড ক্ষুধা বোধ করলো। খাবার খুবই স্বাদু, কিন্তু যত সে খেল ততই তার ক্ষুধা যেন আরো বেড়ে যেতে লাগলো। টেবিলের একপ্রান্তে বসে বাচ্চাটা হাত বাড়িয়ে রুটি চাইলো, শসা খাবার জন্যে ছোট্ট মুখটা খুললো। ওয়াঙের মনে অনির্বাচ্য সুখ। চোখের জলে ঝাপসা দৃষ্টির মধ্যে দিয়ে সে তার সন্তানের দিকে সপ্রেমে তাকালো।

দুপদাপ পায়ের আওয়াজ এগিয়ে আসছে আর তার প্রতিবেশী ঝাঙ্ হুড়মুড় করে ঘরে এসে ঢুকলো। বললো, "সৌভগ, আমি তোকে সব জায়গায় খুঁজে বেড়াচ্ছি। আর তুই এখানে!" সে ছেলেকে কোলে তুলে দ্রুত চলে গেল। ছেলেটা হাত-পা ছুঁড়ে ওয়াঙের দিকে হাত বাড়িয়ে চেঁচাতে লাগলো, "বাবা, ওকে থামতে বলো। আমি যাবো না।"

কয়েক মুহূর্ত ওয়াঙ ভয়ে অসাড় হয়ে গেল। বাচ্চাটাকে ঝাঙের কাছ থেকে কেড়ে নেবার জন্যে যেই দ্রুত ধাওয়া করতে যাবে, তার ঘুম ভেঙে গেল, বুক ধড়ফড় করছে। ঘরটা নিকষ অন্ধকার আর মৃত্যুর মতো স্তব্ধ। শুনলো, দূরে মোরগ ডাকছে আর খিদের চোটে নিজের খালি পেট গুড়গুড় করছে।

চোখ খুলে ও চুপচাপ শুয়ে থাকলো। শুধু যখন কাগজের জানালা

আলোয় সাদা হয়ে গেল আর চড়াইরা কিচিরমিচির শুরু করলো, ওয়াঙ নিঃশব্দে উঠে আবার চাকির চারপাশে ঘোরার নিত্যকর্ম আরম্ভ করলো। কিন্তু আজকে সে ভিন্ন লোক। তার মন আজ অশান্ত। তার চলন মন্থর। অসতর্কভাবে মাঝে মধ্যে সে থেমে পড়ছে, বুঝতেই পারছে না যে সে থেমে গেছে। কখনো কখনো সে দ্রুত পায়ে হঠাৎ চলতে শুরু করছে। অন্যদিনের মতো ছন্দিত চক্রাকারে ঘোরা তার আজ নেই, চাকির আওয়াজও আজ তাল-কাটা। হয়তো ওয়াঙ তার স্বপ্নে-দেখা ছেলে বা গাধার কথা ভাবছে। যাই হোক না কেন, দুপুরের দিকে তার মুখটা শুক্‌নো আর ছোট দেখাচ্ছিল।

শেষ হেমন্তের বিকেলে, উঠোনের পাতার পাহাড় অস্তসূর্যের আভায় সোনালী হলুদে রূপান্তরিত। কুঁড়ের খড়ের চালের ঝিঁঝিরা যখন সঙ্গীদের ডাক দিচ্ছিল থেমে থেমে, ওয়াঙ তখন বিছানায় শুয়ে। সে বেশ কয়েকদিন খায় নি। প্রথম ফ্লু'তে ধরার পরেও, অসুখ গায়ে সে তার কাজ চালিয়ে গেছে—জ্বরে তার গা পুড়ে যাচ্ছিল। পরে পিঠ আর পায়ের ব্যথা এমন যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠল যে শীতল, কঠিন যাঁতার সঙ্গ ত্যাগ করা ভিন্ন তার আর কোনও উপায় থাকলো না। বিছানায় শুয়ে থাকলেও, কেউ তার জন্যে খাবার বা জলও নিয়ে এলো না। রাস্তার ওপারের পড়শীদের কুকুর তার কথা একটু ভেবে দু'একবার স্বচ্ছন্দে ঘুরে গেল। ওয়াঙকে শুয়ে থাকতে দেখে, কুকুরটা তার বিছানায় থাবা তুলে, লেজ নেড়ে ডেকে উঠে তাকে শুভেচ্ছা জানালো, তারপর লাফাতে লাফাতে চলে গেল।

ওয়াঙের দফায় দফায় ঘোরের মতো হতে থাকলো। শেষে তার মনে হল আলোয় ঘর ভরে গেছে, তার গাধাটা চাকি ঘোরাচ্ছে, আর তার বৌ ঘরে রাঁধছে। তার ছোট্ট ছেলেটা উঠোনে খেলছে, তার অাত প্রিয় মুখে হাসি, হাত বাড়িয়ে তাকে খেলতে ডাকছে। ওয়াঙও হাসলো আর তাড়াতাড়ি তার ছেলের দিকে এগিয়ে গেল।

অনুবাদ : সুজিৎ ঘোষ

লি সঙ-এর অপরাধ



ইয়াং ঝেনসেঙ

রান্না-পুজোর রাতে বাতাস তুষার দিয়ে জানলায় আঘাত করছিল। রাস্তায় একটিও জনমানব নেই। নীলচে-সাদা বরফের ঔজ্জ্বল্যে শুধু রাস্তার পাশের কতকগুলি নিষ্পত্র উইলোর ছায়া প্রতিবিম্বিত হয়ে শীতের জমে-যাওয়া হাওয়ায় কাঁপছে।

লি সঙ ক্লান্ত পায়ে মাথা নিচু করে শহর থেকে ফিরছে। পনেরো দিনেরও বেশী হয়ে গেল আজ, সে কোনও কাজ জোগাড় করতে পারে নি। হাঁটতে হাঁটতে সে ভাবছিল তার বিধবা বৌদির কথা, ভাইঝির কথা ও দুই ভাইপোর কথা। এরা সকলেই পুরোপুরি তার উপার্জনের ওপর নির্ভরশীল। কোনও কাজ জোগাড় করতে না পারলে নিজেকে ক্ষুধার্ত থাকতে হবে, এটা কোনও ব্যাপারই না। কিন্তু যখন বাচ্চা-গুলো খাবারের জন্যে কাঁদে আর বৌদি আঁচলে চোখ মোছে, ওঃ! বছর দ্রুত শেষ হয়ে আসছে এবং প্রত্যেকেই নববর্ষের উৎসবের জন্যে জোগাড়যন্ত্র করতে ব্যস্ত। কিন্তু তার মৃত দাদার হতভাগ্য বাচ্চাদের কি আনন্দ আছে?

লি সঙ চোখে অন্ধকার দেখলো। আবার কি ক্ষিদের চোট? যদি সে একটা গাছের গায়ে ঠেস না দিত, তা হলে তুষারের মধ্যে পড়েই যেত। সে নিজের মধ্যে জোর এনে হাঁটতে লাগলো।

খ.

লি সঙের বৌদি আর বাচ্চারা তার ঘরে ফেরার জন্যে অধীর হয়ে অপেক্ষা করছিল। সে ঘরের দরজা দিয়ে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চাগুলো তাকে ঘিরে দাঁড়ালো মহানন্দে, যেমন খাবার নিয়ে সোয়ালো পাখি বাসায় ফিরে এলে তার ছানারা খুশীতে ঘিরে ধরে। বাচ্চারা লি সঙের জামা থেকে বরফ পরিষ্কারের প্রতিযোগিতা শুরু করে দিল সে কাজ পেয়েছে কিনা তার বৌদি জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল। কিন্তু বৌদি তার মুখের ভাব লক্ষ্য করলো, তার আর জিজ্ঞেস করার সাহস হল না।

বরং জিজ্ঞেস করলো, সে কিছু খেয়েছে কিনা। উত্তরের জন্যে বাচ্চারা তার মুখের দিকে কি রকম আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছে লক্ষ্য করে, সে বলে ফেলল, খেয়েছে। বাচ্চাগুলো উনুনের দিকে দৌড়ে গেল আর ভাতের ফ্যানের হাঁড়িটা নামিয়ে নিল,—যেটা তাদের কাকার জন্যে রাখা ছিল। সেই উনুনের সামনেই প্রত্যেকে কুকুরছানার মতো পালা করে করে একচুমুক করে খেয়ে সবটা নিঃশেষ করে ফেললো। লি সঙ দীর্ঘশ্বাস ফেললো। সে নিজের ঘরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লো এবং ঘুমিয়ে পড়লো।

পরদিন সকালে যখন সে ঘুম থেকে উঠলো, আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। পশ্চিমে তুষার ঢাকা পর্বতচূড়া রক্তিম সূর্যের আভায় ঝকঝক করছে। পাহাড়তলির রাস্তা বেয়ে সারি সারি গাধার পিঠে শহরে জ্বালানী-কাঠ চলেছে। তাদের গলার ঘণ্টার অস্পষ্ট ধ্বনি সে শুনতে পাচ্ছিল। যখন দেখলো যে উনুনের কাছে কয়েকটুকরো মাত্র কাঠ পড়ে আছে আর টেবিলের ওপর আধ বাটির মতো চাল গুঁড়ো অবশিষ্ট, লি সঙ একটু আঁত্‌কে উঠলো। সে মেঝেতে কয়েক বার পায়চারী করলো, তারপর বেরিয়ে গেল।

দুপুরের খাবার আগে সে ফিরলো না। তার মুখের চেহারা থমথমে। পাগলের মতো ঘরের মধ্যে সে পায়চারী করতে লাগলো। বাড়ির কেউই তাকে কোনও কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস পেল না। শেষ পর্যন্ত সে নিজের বিছানায় শুয়ে পড়লো দেওয়ালের দিকে মুখ

ফিরিয়ে,—মনে হল ঘুমিয়ে পড়েছে। সাঁঝের পিদিম জ্বালার সময় হঠাৎ সে উঠে পড়লো। বাড়ির উঠোনের দক্ষিণের দেওয়ালের কোণে ভেঙে-পড়া একটা লাউমাচা থেকে একটা বড় লাঠি টেনে বের করে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

অল্প কিছুটা গিয়ে সে থেমে পড়লো। মাথা নিচু করে কি ভাবলো। তারপরে সে ঘুরে দাঁড়ালো আর মনমরা ভাবে ধীরে ধীরে পা ফেলে বাড়ির দিকে চললো। বাড়িব দরজায় পৌঁছে কাগজের জানালার ভেতর দিয়ে পরিবারের সকলের ছায়াগুলো দেখতে পেল—তার বৌদি এক হাতে বাচ্চাদের মাথায় হাত বোলাচ্ছে, অন্য হাতে চোখ মুছছে। লি সঙ তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারলো না। আবার ঘুরে দাঁড়ালো। তার বড় লাঠিটা নিয়ে বড় রাস্তার দিকে দ্রুত চলে গেল। সেখানে একটা সাঁকোর নিচে লুকালো।

পরের রাত্রে লি সঙ জেলে। জেলের দালানের একটা উজ্জ্বল লাল আলো দেওয়ালের ওপর গরাদগুলোর গাঢ় ছায়া ফেলেছে। অন্য সব বন্দীরা বিরাট সেলের মেঝেয় হাত-পা ছড়িয়ে অদ্ভুতভাবে শুয়ে হাঁ করে ঘুমাচ্ছে, তাদের দানবের মতো হলুদ দাঁতের পাটিগুলো বেরিয়ে আছে। লি সঙের মনে হল গত দিনের ও রাতের অভিজ্ঞতা যেন স্বপ্ন ছাড়া কিছু নয়। জেলের মধ্যে কবরের ভেতর মৃতের মতো শুয়ে-থাকা এই মুহূর্তটিতে সমস্ত ব্যাপারগুলো সে স্বচ্ছভাবে ভেবে দেখতে পারছে।...

সাঁকোর কাছে যে লোকটি তার নাগালের মধ্যে প্রথম এলো, সে একটি বুড়ো মানুষ। লি সঙ দীর্ঘশ্বাস ফেলল আর তাকে চলে যেতে দিল। দ্বিতীয় লোকটি এলো—সদ্য যৌবনে পা দিয়েছে। লি সঙ লাফ দিয়ে পড়ে তার টাকার ব্যাগ ছিনিয়ে নিল। কিন্তু কয়েকদিনের খিদেয় আর উপোসে সে একেবারে কাহিল হয়ে পড়েছিল। দু-জনের যখন ধ্বস্তাধ্বস্তি শুরু হল, লি সঙ জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেল। যখন তার জ্ঞান ফিরলো তখন সে জেলা আদালতের এজলাসে। বিচারক তাকে কড়া গলায় প্রশ্ন করলেন ও পাঁচ বছরের জন্যে কয়েদের আদেশ দিলেন।

পাঁচ বছর। এই সময়ে তার বৌদি, ভাইঝি, ভাইপোদের কী হবে ?

তিন বছর আগের দৃশ্যের কথা লি সঙের মনে পড়লো, মনে হয় যেন গতকালের ঘটনা—যখন তার বড় ভাই মৃত্যুশয্যায়। বিছানায় শুয়ে তার দাদা,যে সন্তানদের ও স্ত্রীকে ছেড়ে যেতে হচ্ছে—তাদের দিকে অশ্রুসজল চোখে তাকিয়ে। তারপরে সে তার বরফের মতো ঠাণ্ডা দু'হাতে লি সঙের হাতদুটো চেপে ধ'রে কথা বলার চেষ্টা করলো, কিন্তু পারলো না। লি সঙ বুঝতে পেরেছিল, তার দাদা শেষ নিঃশ্বাস ফেলার আগে তার স্ত্রী আর বাচ্চাদের দেখতে চেয়েছিল।

এ-সব স্মরণে আসতে লি সঙ কাঁদছিল, তার চোখের জল ফোঁটায় ফোঁটায় ঠাণ্ডা পাথরের মেঝেয় পড়ছিল। ধীরে ধীরে সে কিরকম অজ্ঞানতার ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লো। তার মনে হল সেলের কোণায় রয়েছে একটা গর্ত, সে শরীরটাকে মুচড়ে তার মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে এলো। আর, সত্যিই সে জেলের বাইরে এসে পড়েছে। সারা পথটা সে দৌড়তে দৌড়তে বাড়ির দিকে চলল। বাড়ির দরজার বাইরে সে থামলো আর শোনার চেষ্টা করলো, কিন্তু একটি শব্দও শুনতে পেলো না। ঘরে ঢুকে, দেখে বৌদি মৃতের ভঙ্গিতে হাত পা ছড়িয়ে মেঝেতে পড়ে আছে। মনে হয় বাচ্চারা তাদের মায়ের শরীরের ওপর কেঁদে কেঁদে অজ্ঞান হয়ে গেছে। লি সঙ হাঁটু গেড়ে বসলো আর বাচ্চাগুলোকে তুলতে চাইলো। যখন বাচ্চারা তাকে চিনতে পারলো, তারা লি সঙের গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলো। সে-ও কাঁদতে কাঁদতে তাদের বুকে জড়িয়ে ধরে মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো।

সহসাই, সে তার মাথায় একটা ঘুষির আঘাত অনুভব করলো। অস্পষ্টভাবে সে শুনলো কেউ ক্রুদ্ধভাবে গর্জন করছে আর শাপমন্যি করছে, "এ লোকটা ঘুমের মধ্যেও লোকের ছিনতাই করছে।" লি সঙ চোখ খুলে একফুট লম্বা চুলে ঢাকা মাথা, একটা কালো মুখ দেখতে পেলো। মড়ার খুলির দৃষ্টিহীন গর্তের মতো বিরাট তার চোখজোড়া, তার দিকে বিষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে। লি সঙ বুঝতে পারলো সে এখনও জেলের ভেতরেই।

অনুবাদ : সুজিৎ ঘোষ

শুভ্র



ল্যাও শি

[ল্যাও শি লেখকের ছদ্মনাম। প্রকৃত নাম শুশু শিয়ু। গত শতাব্দীর শেষের দিকে জন্ম। তাঁর পিতা বিদেশী আক্রমণকারীদের হাতে নিহত হন। শৈশব ও যৌবন অতি কষ্টের মধ্যে কাটে। এর ফলে অবশ্য জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে তাঁর পরিচয় নিবিড় হয়। ১৯২৪-এ তিনি লণ্ডনে চীনা ভাষা শেখাতে যান। কয়েক বৎসর পরে, ১৯৩০-এ দেশ ফেরেন। তারপর কুড়ি বছর ধরে প্রাঞ্জল পিকিং উপভাষায় একের পর এক গল্প, উপন্যাস, নাটক লিখে যান। এসব লেখায় হাস্যরসের ছড়াছড়ি। জাপানের সঙ্গে যুদ্ধের সময় তাঁর লেখনী ক্ষুরধার হয়ে ওঠে। বিশ্বাসঘাতক ও মুনাফাবাজদের প্রতি তাঁর মনোভাব তীব্র আকার ধারণ করে। তারপর সরকারী কাজে এত জড়িয়ে পড়েন যে লেখার তেমন সুযোগ পান না। শোনা যায় ১৯৬৬ সালে তিনি আত্মহত্যা করেন।]

বুড়ো ওয়াং, বুড়ো কিউ ও আমি—এই তিনজন মিলে কিছু টাকা একত্র করে একটা হাসপাতাল খুলে ফেললাম। ওয়াং-এর স্ত্রী ছিল একজন মেট্রন—ধাত্রী থেকে ডাক্তারগিন্নীতে উন্নীত হয়েছে। কিউ-র শ্বশুর ছিল পরিচালক ও কোষাধ্যক্ষ। ঠিক করেছিলাম, যদি কিউর শ্বশুর হিসেবে কারচুপি করে বা টাকা কড়ি নিয়ে পালায় তবে কিউকে তার শ্বশুরের জামিনদার ধরব ও প্রয়োজনমতো চাপ দেব। ওয়াং-এর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব বহুদিনের। কিউ-র আগমন অবশ্য একটু দেরীতে হয়েছে, যার জন্য সঙ্গত কারণেই তার সম্বন্ধে আমাদের একটু সতর্ক থাকতে হত। যাই হোক এবং যত লোকই কাজে নিযুক্ত থাকুক সাফল্যের জন্য চাই উপস্থিতবুদ্ধি ও প্রকৃত বন্ধু। তা না হলেই যত বিশৃঙ্খলা। সংখ্যার দিক থেকে বিচার করলে আমরা কিউর চেয়ে অনেক বেশী।

অবশ্য কিউর শ্বশুর রয়েছে—ওই বুড়োর মাথা থেকে সব চুল টেনে উপড়ে ফেলার জন্য ওয়াং-গিন্নীই যথেষ্ট। সত্যি কথা বলতে কি, কিউ লোকটার যোগ্যতা ছিল। অর্শের চিকিৎসায় সে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করে। অর্শের অপারেশন করাবার জন্যই তাকে আমরা দলে নিয়েছি। কোনো বিপত্তি ঘটালে অবশ্য তাকে আমরা ক্ষমা করতাম না।

সাধারণ চিকিৎসা বিভাগটা আমার হাতে ছিল। সিফিলিসের কেস্‌গুলো ওয়াং দেখাশোনা করত। অর্শ ও অস্ত্রোপচার বিভাগ ছিল কিউ-র হাতে। ওয়াং-এর স্ত্রী ছিল মেট্রন ও স্ত্রীচিকিৎসা-বিভাগের প্রধান। সত্যি কথা বলতে কি, চিকিৎসাবিদ্যা সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছুই জানতাম না। অবশ্য আমরা খুব সামান্য চার্জ নিতাম। রোগী যা ব্যয় করত তার বিনিময়ে সে যথেষ্টই পেত। হাসপাতালে সিফিলিস ও অর্শরোগীর প্রচণ্ড ভীড়। তাই কিউ ও ওয়াং ছিল আমাদের আশাভরসা। ওয়াং-গিন্নি ও আমি শুধু তাদের সহায়তা করতাম মাত্র। বলতে গেলে ওয়াং-পত্নী কোন ডাক্তারই নয়। সে কয়েকটি সন্তানের জননী—সেই সুবাদে তার সন্তান-প্রসবে কিছুটা যা অভিজ্ঞতা। ধাত্রীবিদ্যায় তার যা নৈপুণ্য তাতে আমি কিন্তু নিজের স্ত্রীকে তার হাতে ছেড়ে নিশ্চিন্ত হতে পারতাম না। তবুও লাভজনক বলে স্ত্রীবিভাগ খুলেছিলাম। সুষ্ঠু প্রসবের পর প্রসূতিকে দশ-বার দিন এখানেই কাটাতে হত। ভাতের মাড় বা সিদ্ধ-ভাত খাইয়ে তাদের থেকে রোজ বেশ কিছু পয়সা আদায় করা যেত। প্রসবের প্রকৃতি সুবিধের মনে না হলে আমরা সঙ্গে সঙ্গেই তার একটা সমাধান খুঁজে বের করতাম।

এইভাবে শুরু হল আমাদের ব্যবসা। নাম দেওয়া হল—জনতা হাসপাতাল। এক-পক্ষকাল ধরে চলল বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞাপন। নামটা বেশ। আজকালকার দিনে কিছু কামাতে গেলেই সর্বাগ্রে জনগণের কথা মনে রাখতে হয়। যদি তাদের মাধ্যমে অর্থোপার্জন না করি তবে আর কি উপায়ে করব? এটা সার সত্য কথা। বিজ্ঞাপনে অবশ্য তা উল্লেখ করি নি। কারণ সাদা সত্য কথা কারোর

পছন্দ নয়। তার পরিবর্তে আমরা লিখলাম : স্বদেশবাসীর সুখই আমাদের কাম্য। আমরা তাদের সেবায় নিজেদের উৎসর্গ করেছি। শ্রেণীবিচার না করে জনগণের সেবার জন্য আমরা বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে দেশী ও বিদেশী উভয় চিকিৎসাশাস্ত্র আয়ত্ত করেছি।' বিজ্ঞাপনের দাম মেটাতে গিয়ে মূলধনের বেশ মোটা অংশ খরচ হয়ে গেল। জনগণকে আহ্বান করে তাদের জন্য সুষ্ঠু ব্যবস্থাও করতে হল। আমাদের হাসপাতাল কত বড়ো—বিজ্ঞাপন দেখে আঁচ করার উপায় ছিল না। ছবিতে দেখানো হয়েছে তিনতলা বাড়ি। নিকটবর্তী পরিবহণ-সংস্থার ফটোকে কাজে লাগানো হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে একতলা বাড়ির দুটো ঘর নিয়ে ছিল আমাদের হাসপাতাল।

আমাদের ব্যবসা শুরু হল। চিকিৎসা আরম্ভ হওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে প্রচুর লোক ভীড় করল পরামর্শের জন্য। আব তারা সত্যসত্যই জনগণ। তাদের মধ্যে যারা একটু অভিজাত শ্রেণীর, তাদের আমরা রোগনির্বিশেষে সোডার জল সেবন করতে দিলাম। এক সপ্তাহ পরে আমরা পারিশ্রমিক নিতাম। আর যারা প্রকৃতই জনগণ তাদেরকে আমরা সোডার জলও দিতাম না। তাদের বাড়ি গিয়ে ভালো করে চোখ-মুখ ধুতে বলতাম। তারা এত নোংরা যে তাদের কোন ওষুধ দেওয়া মানে তার অপচয় করা।

একটি দীর্ঘ, ব্যস্ত দিনের শেষে সন্ধ্যায় একটা জরুরী বৈঠক ডাকা হল। শুধুমাত্র জনগণকে আহ্বান করে কোন লাভ হচ্ছে না—এ বিষয়ে সবাই একমত হলাম। তাই, অন্যান্যদেরও ডাকতে হবে। 'জনগণের হাসপাতাল' নামটা না দিলেই ছিল ভালো। মোট কথা, শীর্ষস্থানীয় মানুষ ছাড়া শুধু জনগণের কাছ-থেকে টাকা কামান যায় না। হাসপাতাল তো আর প্যারাফিন কোম্পানী নয়। এটা আগে বুঝতে পারলে আমরা এর নাম দিতাম 'অভিজাতশ্রেণীর হাসপাতাল'। বুড়ো ওয়াংকে যে কতবার অপারেশনের ছুরি ডেটলের জলে ডোবাতে হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু একটিও অর্শরোগী জুটল কি? সর্বসাধারণের নিমিত্ত হাসপাতালে ভুলেও কি বনেদি ঘরের অর্শরোগী পা দেয়?

বুড়ো ওয়াং-এর মাথায় এক বুদ্ধি খেলে গেল। পরের দিন একটা গাড়ি ভাড়া করে পর্যায়ক্রমে ঠাকুমা, দিদিমা, পিসি, মাসিদের নিয়ে আসতে হবে। দোর-গোড়ায় পৌঁছবামাত্র নার্সরা তাদের ভেতরে নিয়ে আসবে। তিরিশ-চল্লিশ বার করলেই প্রতিবেশীদের তাক লাগিয়ে দেওয়া যাবে। বুড়ো ওয়াং-এর বুদ্ধির তারিফ না করে পারলাম না। এর সঙ্গে সে জুড়ে দিল এক মোক্ষম প্ল্যান ঃ কতকগুলো অচল গাড়ি জোগাড় করতে হবে। কারণ জিজ্ঞেস করতেই সে বলল, "যেখানে গাড়ী মেরামত হচ্ছে এমন কোন গ্যারেজের সঙ্গে কথা বলে কতকগুলোকে হাসপাতালের সামনে দাঁড় করিয়ে রাখতে হবে। সেগুলো ঘনঘন হর্ন বাজাবে। ভেতরের রোগীরা হর্নের বাঁশী শুনেই ভাববে কত রোগীই গাড়ি চেপে আসছে। আর যারা বাইরে আছে তারা সারাদিন হাসপাতালের সামনে গাড়ির সারি দেখে তাজ্জব বনে যাবে। যেই কথা সেই কাজ।

পরের দিন যেখানে যত আত্মীয়স্বজন আছে, সবাইকে গাড়িতে নিয়ে এসে চা খাইয়ে আবার বাড়ি পৌঁছে দিয়ে এলাম। নার্স দুজন এই কাজে এত ব্যস্ত রইল যে একটু বসবারও ফুরসুৎ পেল না। অচল গাড়িগুলোকে খুব সকালে এনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল। সেগুলো পাঁচ মিনিট অন্তর শুধু হর্ন বাজিয়ে চলল। সকাল থেকে এদের চারপাশে শিশুদের ভীড়। আমরা গাড়িগুলোর একটা ফটো তুলে সান্ধ্য পত্রিকাগুলোতে বিজ্ঞাপনের জন্য পাঠিয়ে দিলাম। বুড়ো কিউর শ্বশুর তো গাড়ির মিছিলের মাহাত্ম্য কীর্তন করে একটা উচ্চাঙ্গের রচনা লিখে ফেলল। রাত্রে হর্নের বিকট আওয়াজ শুনে মাথা এমন ধরে গেল যে কিছু খেতে পারলাম না।

এসবের কৃতিত্ব বুড়ো ওয়াং-এর। পরের দিন সকালে হাসপাতালের দরজা সবে খুলেছি অমনি এক মিলিটারী অফিসার এসে হাজির। তাকে স্বাগত জানানোর জন্য বুড়ো ওয়াং-এর সে কি তাড়া। বাইরে যাওয়ার দরজা যে ভীষণ নিচু সেদিকে কোন খেয়াল ছিল না। ছুটতে গিয়ে লাগল ঠোক্কর। আর যায় কোথায়?—মাথা ফুলে উঠল।

সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে পরীক্ষা করে জানল গুপ্তরোগ। সমস্ত মুখ হাসিতে ঝলমল করে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা শুরু হয়ে গেল। নার্সেরা তার জ্যাকেট খুলে ফেলল। পরে তার দুই বাহু চেপে ধরল। ওয়াং-গিন্নী ছুঁচের অগ্রভাগে আলতোভাবে বার কয়েক মাংসল তর্জনী বুলিয়ে নিল। আর পরক্ষণেই ওয়াং ইঞ্জেক্‌শন ঢুকিয়ে দিল তার শরীরে। কি ঘটছে বুঝতে না পেরে অফিসারটি নার্সদের দিকে তাকাল ও সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল : "চমৎকার। চমৎকার।" আমি কিছু বলতেই সে আরেকটি নিতে রাজী হয়ে গেল। সৌভাগ্যের স্বাদ পেয়ে বুড়ো কিউ আগেই প্রস্তুত করে রেখেছিল অল্প নুন মেশানো 'যুঁই' পাতার চা। এদিকে ওয়াং নার্সদের অফিসারের হাত ধরতে বলল। ওয়াং-পত্নী আবার তর্জনীতে ছুঁচ স্পর্শ করল। যুঁই-চার সিরিঞ্জ শরীরে প্রবেশ করাতে অফিসার আরেকবার আনন্দ প্রকাশ করল। তৃতীয় বারের মত ওয়াং ছুঁচ ঢোকাল ; এবার ছিল ড্রাগন কূপের চা।

চায়ের ব্যাপারে আমাদের অনুরক্তি ছিল প্রবল। সর্বদাই 'ড্রাগন কূপ' ও যুঁই জাতীয় চা ব্যবহার করতাম। চায়ের দুটো ও ৬০৬ এর একটি—মোট ৩টি ইঞ্জেকশনের পরিবর্তে আমরা তার থেকে পঁচিশ ডলার আদায় করি। তাকে আরো কয়েকবার আসতে বললাম। দশবার এলেই তার রোগমুক্তি—এও নিশ্চিতভাবে জানিয়ে দিলাম। মোট কথা আমাদের চায়ের অভাব ছিল না।

ফি জমা দেওয়ার পরও অফিসারের স্থান ত্যাগ করার লক্ষণ দেখা গেল না। ওয়াং ও আমি মিলে তার স্তাবকতা করতে শুরু করলাম। রোগ গোপন না করে রোগের শুরুতেই সে আমাদের কাছে এসেছে তার তারিফ করলাম। তাই ভি. ডি. তার পক্ষে কোন সমস্যারই সৃষ্টি করবে না। তাকে আরো বোঝালাম যে সিফিলিস বড়লোকের ব্যাধি। এর মধ্যে গৌরব ও বিস্ময় দুইই বর্তমান। আর তা নির্মূল করতে কয়েকটা ৬০৬ মার্কা ইঞ্জেকশনই যথেষ্ট। আশঙ্কিত হওয়ার কারণ ঘটে তখনই যখন কোন দোকানের কর্মচারী বা স্কুলের ছাত্র এ রোগকে

গোপন করার চেষ্টা করে, ছুটে যায় কোন হাতুড়ের কাছে বা চুপিচুপি ওষুধ কিনে নিজেই চিকিৎসা শুরু করে।

ঐ ওষুধগুলো মারাত্মক—এগুলোর বিজ্ঞাপন মিলবে শুধু সাধারণ শৌচাগারগুলোতে। দেখলাম ভদ্রলোক আমাদের সঙ্গে একমত। বললে : "এর আগে বার কুড়ি হাসপাতালে গেছি। কিন্তু এমন চমৎকার চিকিৎসা কোথাও মেলে নি।" আমি কথা আর বাড়ালাম না।

কিন্তু বুড়ো ওয়াং থামার পাত্র নয়। সে বলে চলল : আসলে ভি. ডি. কোন রোগই নয়। এরজন্য চাই মাত্র গোটাকতক ৬০৬ মার্কা ইঞ্জেকশন। অফিসারও সাগ্রহে সায় দিল। এমনকি প্রমাণও দিতে চাইল। ঐ রোগ হওয়া সত্ত্বেও তার বেশ্যাবাড়ী যাওয়াতে কখনো ছেদ পড়েনি। সেটা এই ইঞ্জেকশনগুলোর জন্যই সম্ভব হয়েছে। ওয়াং খুব খুশী হয়েছে, অফিসারকে বিশেষ রোগী হিসেবে চিকিৎসা করতে চাইল। দুভাবে চিকিৎসা চলতে পারে। দীর্ঘকাল ধরে চালালে চার্জ অর্ধেক পড়বে। এক একটা ইঞ্জেকশনে লাগবে পাঁচ ডলার। অথবা মাসিক ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তখন মাসে একশ' ডলারের পরিবর্তে যত খুশি ইঞ্জেকশন নেওয়া যাবে। এই ব্যবস্থাই অফিসারের মনে ধরল। অবশ্য আজকের মত সবকিছু হওয়া চাই। আমরা কি বলব ভেবে পেলাম না। শুধু হেসে মাথা নাড়লাম।

অফিসারের গাড়ি স্থানত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গেই আর একটা গাড়ি এসে হাজির। ভেতর থেকে চারজন পরিচারিকার হাত ধরে নেমে এল এক মহিলা। পরিচারিকাদের একজন বিশেষ কেবিনের খোঁজ করাতে আমি তাকে সরিয়ে দিয়ে নিজেই মহিলার হাত ধরলাম। উঠোন পেরোবার সময় পাশের ট্রান্সপোর্ট কোম্পানীর চকমিলান দালানের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করে বললাম : "ঐ দিককার স্পেশাল কামরাগুলো ভরতি হয়ে গেছে। তাতে কি? এখনও দুটো সেরা কামরা আছে।" এই বলে ছোট ঘরগুলোর দিকে আঙুল বাড়ালাম।

"এখনকার মত ওগুলোতে চালিয়ে দিন। সত্যি কথা বলতে গেলে

ওপরের কামরাগুলো থেকে এগুলোতে আরো বেশি আরাম পাবেন। বিশেষ করে ওপর-নীচ করতে হবে না—তাই না, ম্যাডাম ?"

বৃদ্ধার প্রথম কথাগুলো সংগীতমূর্ছনার মতো বেজে উঠল—"আপনি জাত-ডাক্তারের মতো কথা বলছেন। স্বাচ্ছন্দ্য না পেলে রোগী হাসপাতালে আসবেই বা কেন ? দংশেন হাসপাতালের ডাক্তারগুলো একেবারে কসাই।

"ম্যাডাম কি দংশেনে গিয়েছিলেন ?"

"ওখান থেকেই তো আসছি। কতকগুলো দানবের পাল্লায় পড়েছিলাম, মশাই।"

দংশেন এদিককার সেরা হাসপাতাল। তাই তার শাপশাপান্ত শুনতে মন্দ লাগছিল না। রোগীকে নিয়ে একটা ছোট কুঠুরীতে ঢুকলাম। আমি ভালভাবেই জানতাম যে যদি তাকে দংশেনের শ্রাদ্ধ করতে না দি তবে সেই মহিলা এত ছোট ঘরে থাকতে মোটেই রাজী হবে না।

"আচ্ছা, আপনি কতদিন ওখানে ছিলেন ?"

"দুদিন। আর দুদিনেই প্রাণ ওষ্ঠাগত হওয়ার জোগাড়।"

এই বলে মহিলাটি বিছানায় বসলেন। আমাদের বিছানা একেবারে অপছন্দ করার মত নয়। একটু পুরনো হওয়ায় ভেঙ্গে পড়ার আশংকা —এই যা। আমি বিছানার এক দিক পা দিয়ে ঠেকিয়ে রাখলাম।

"ওখানে গেলেন কেন ?" আমার পায়ের দিকে যাতে তার দৃষ্টি না পরে সেজন্য আমি তাকে বকিয়ে চলেছিলাম।

"ও কথা জিজ্ঞেস না করলেই ভালো করতেন। ওকথা ভাবতেই রাগে গা রিরি করছে। বলুন দিকি ডাক্তারবাবু, আমার পেটের ব্যামো—আর ওরা আমাকে কিনা না খাইয়ে রেখেছে।" মহিলাটি কেঁদে ফেলে আর কি।

আতংকের ভান করে চোখ বিস্ফারিত করে বললাম : "কিছুই না ? বলেন কি ? ঐ ডাক্তার একটা পাষণ্ড। বিশেষতঃ আপনার এই বয়সে—ম্যাডামের বয়স নিশ্চয় আশি হবে।"

বৃদ্ধা চোখের জল খানিকটা গিলে ফেলল। তারপর মৃদু হেসে

বলল : "আমার বয়স অল্প—কত আর হবে ? এই ধরুন আটান্ন।"

"ঠিক আমার মার বয়সী। তাঁরও সময় সময় পেটব্যথা হয়।" আমি চোখ মুছলাম।

"আপনি এখানেই থাকুন, ম্যাডাম। কথা দিচ্ছি আমরা আপনাকে সারিয়ে তুলবই। একটু সেবাযত্নই হচ্ছে আপনার প্রকৃত চিকিৎসা। যা প্রাণ চায় খান—তবেই সুস্থবোধ করবেন, মনও খারাপ লাগবে না। তাই নয় কি, ম্যাডাম ?"

কৃতজ্ঞতায় বৃদ্ধার চোখ জলে ভরে উঠল।

"ডাক্তারবাবু, আমি শক্ত খাবার খেতে ভালবাসি আর ওরা পাতলা মাড় খাওয়ার জন্য পেড়াপীড়ি করত।"

"আপনার তো দাঁত বেশ ভালো আছে। আপনি নিশ্চয় শক্ত খাবার খাবেন।"

"আমার সবসময় খিদে পায়। আর ওরা নির্দিষ্ট সময় ছাড়া খেতে দিত না।"

"আহাম্মকের দল।"

"মাঝরাতে যখন শুতে যেতাম তখন ওরা আমার মুখে কাঁচের কাঠি পুরে দিত।"

"নির্লজ্জের মত ব্যবহার, বলতে হবে।"

"বেড-প্যান চাইলে নার্সরা জানাত ডাক্তার আসছে আর ডাক্তারী পরীক্ষা না হওয়া অব্দি আমাকে অপেক্ষা করতে হবে।"

"একেবারে চামার।"

"কোনসময় হয়তো একটু উঠে বসেছি, অমনি নার্স শুয়ে পড়তে বলত।"

"অসহ্য।"

আমাদের পরস্পরের মধ্যে এতক্ষণে একটা হৃদ্য সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। যার জোরে বলতে পারছি যে ঘর আরো ছোট হলেও হয়তো সে চলে যেত না। আমি এতক্ষণ নড়বড়ে খাটকে পা দিয়ে ঠেকিয়ে রেখেছিলাম। এখন মনে হল তার আর দরকার নেই। হয়তো ভেঙ্গে পড়লেও মহিলা তা মুখ বুঁজে সহ্য করবে।

"আপনারা নার্সের ব্যবস্থা করতে পারেন?"

"তা পারি। কিন্তু তার কি আর দরকার পড়বে?" মৃদু হেসে উত্তর দি—"চারজন চাকরানীকেই আপনি সঙ্গে রেখে দিতে পারেন। আপনার নিজের লোকই আপনার দেখাশোনা ভালভাবে করতে পারবে। যদি চান নার্সদের আপনার ঘরে ঢুকতেই দেব না।"

"তাহলে তো খাসা হবে। কিন্তু তাদের জন্য ঘর দিতে পারবেন তো?" মহিলা আনন্দে আত্মহারা, মনে হল।

"অবশ্যই। আপনি সম্পূর্ণ উঠানজোড়া মহল্লাটা নিয়ে নিন না। চারজন চাকরানী ছাড়া আপনি রাঁধুনীকেও নিয়ে আসতে পারেন। আপনার পছন্দমত খাবার রেঁধে দিতে পারবে। শুধু আপনার খরচটা দিলেই চলবে, চাকরানী ও রাঁধুনীর থাকার জন্য কোন খরচা পড়বে না। প্রতিদিন পঞ্চাশ ডলার লাগবে।"

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মহিলা বলল, "তাহলে তাই হোক। খরচের জন্য ভাবছি না। চুংসিয়ান্, যাও তো রাঁধুনীকে নিয়ে এস। আর তাকে বল আসার সময় যেন একজোড়া হাঁস নিয়ে আসে।"

মাত্র পঞ্চাশ ডলার চেয়েছি একথা ভেবে মনস্তাপ হল। নিজের গালে চড় বসাতে ইচ্ছে করছিল। ভাগ্যি তার মধ্যে ওষুধের দাম ধরে দিই নি। তাই এখন সেটা পুষিয়ে নিতে পারব। তার আসার ভঙ্গি দেখে আমরা এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হলাম যে তার ছেলে কমপক্ষে একজন ডিভিশনাল কমাণ্ডার হবে। তাছাড়া যদি সে রোজ হাঁসের রোস্ট খায় তবে একসপ্তাহের মধ্যে নিশ্চয় চলে যাচ্ছে না। দৃষ্টি সুদূরপ্রসারী করতে ক্ষতি কি?

এতদিনে সত্যিকারের হাসপাতাল বলে মনে হচ্ছে। চারজন দাসী ছুটোছুটি করছে, রাঁধুনী দেয়ালের গোড়ায় রান্নার চুল্লী বসিয়েছে। এ যেন একটা বিয়ে-বাড়ি। বৃদ্ধার জন্য আনা ফল বা হাঁসের মাংস টুকটাক তুলে চাখতে কসুর করছি না। সবাই তার আনা ভালো জিনিসপত্রের দিকে এত নজর দিচ্ছিলাম যে তাকে পরীক্ষা করার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম।

বুড়ো ওয়াং ও আমি বেশ পসার জমিয়ে ফেলেছি। বুড়ো কিউ কিন্তু একেবারে হতাশ। তার অপারেশনের ছুরি সবসময় হাতেই আছে। ভয়ে সবসময় তার থেকে দূরে থাকতাম পাছে আমার ওপরই সেটা প্রয়োগ করে বসে। বুড়ো ওয়াং তাকে ধৈর্য ধরতে বলে কিন্তু তার ছিল প্রচণ্ড অহমিকা। হাসপাতালে কয়েক ডজন ডলার আয়বৃদ্ধি না করে কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছিল না। তার মানসিকতার তারিফ না করে পারছি না।

একদিন দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর সত্যিসত্যি একজন অর্শরোগী এসে হাজির। স্থূলকায়, স্ফীতোদর। বয়স চল্লিশের কোঠায়। মিসেস ওয়াং তো তার বিরাট ভুঁড়ি দেখে ভেবেই বসেছিল যে এ প্রসবের কেস। তারপর আগন্তুককে পুরুষ বুঝতে পেরে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও বুড়ো কিউর হাতে তুলে দিতে হল। কিউর চোখ আশায় জ্বলজ্বল করে উঠল। সামান্য কথাবার্তার পর ছুরির কাজ শুরু হয়ে গেল। মোটা লোকটি যন্ত্রণায় প্রচণ্ড চিৎকার শুরু করল আর ক্ষতের জায়গাটা অসাড় করে নেওয়ার জন্য অনুনয় বিনয় করতে লাগল।

কিউর জবাব প্রস্তুত ছিল। "অজ্ঞান করা সম্বন্ধে কোন কথা হয় নি। ওটার জন্য আরো দশ ডলার লাগবে। যদি চান তাড়াতাড়ি বলুন।"

মোটা লোকটির মাথা নাড়িয়ে জানানোর সাধ্য ছিল না। বুড়ো কিউ ক্ষতস্থানটা অসাড় করে আবার অপারেশন করল। আর বলল, "এ যে দেখছি ভগন্দর। এটা কেটে ফেলার তো কোন কথা হয়নি। যদি এটাও অপারেশন করতে হয় তবে আরো তিরিশ ডলার লাগবে। ভেবে দেখুন।"

বুড়ো আমাকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল। রোগীকে বশে এনে তারপর ইচ্ছামত দোহন করা—এ যে অভিনব ব্যাপার।

স্থূলকায় ব্যক্তিটি কোন আপত্তি তুলল না। তোলার ক্ষমতা মনে হয় লোপ পেয়ে থাকবে। বুড়ো কিউর পদ্ধতি অনবদ্য, সন্দেহ নেই। সে ভগন্দরে ছুরি চালাতে চালাতে বলল, "মশাই, ন্যায্য হিসেব করতে

গেলে এ কয়েকশ ডলারের ধাক্কা—এ আমি হলফ করে বলতে পারি। তবে আমরা ডাকাত নই। আমরা শুধু চাই—আপনি সুস্থ হয়ে আমাদের কথা অন্যদের বলুন। আগামীকাল সময় করে এদের একবার দেখিয়ে যাবেন। আমার সহকর্মীরা প্রবল শক্তিসম্পন্ন অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে একটি জীবাণুরও হদিশ পাবে না।"

লোকটির মুখ থেকে রা সরে নি। হয়তো রাগে ভাষা হারিয়ে ফেলেছিল।

বুড়ো কিউ আরো পঞ্চাশ ডলার আয় করল। ঐদিন সন্ধ্যায় বৃদ্ধার রাঁধুনীকে ধরে কয়েক থালা খাবার প্রস্তুত করা হল। অবশ্য মালমশলা বেশির ভাগই ছিল বৃদ্ধার। কিছু মদও কেনা হল। খেতে খেতে নতুন দুটো বিভাগ খোলা নিয়ে সিদ্ধান্ত নিলাম।—গর্ভপাত ও আফিং-নেশার চিকিৎসা। বুড়ো ওয়াং নতুন আয়ের হদিশ দিল। স্কুলে ভর্তির জন্য বা মুমূর্ষু ব্যক্তির জীবনবীমার জন্য যে মেডিকেল সার্টিফিকেট দরকার হয়, তাও আমরাই জোগাব। তার জন্য দক্ষিণা লাগবে পাঁচ ডলার। সর্বশেষ প্রস্তাব ছিল বুড়ো কিউর শ্বশুরের—কয়েক ডলার খরচ করে একটা সাইনবোর্ড টাঙাতে হবে। প্রস্তাবটা সেকেলে সন্দেহ নেই, তার বয়সের লোকের থেকে আর কি আশা করা চলে? তবুও আপত্তি করলাম না এই কারণে যে বক্তা হাসপাতালের স্বার্থের কথা চিন্তা করে কথাটা পেড়েছে। সাইনবোর্ডের ভাষাও তারই দেওয়া—Mercy through merciful arts—যদিও কথাটা বাসি, তবু আমাদের মনের কথাই বলা হয়েছে। পরের দিন সকালে বাজার থেকে পুরনো সাইনবোর্ড কিনে নিতে বললাম। মিসেস ওয়াং রং-করা ও টাঙানোর ভার নিল। ঝোলানোর সময় আবার বাজনা দরকার। সে সমস্যার সমাধানও সেই করে দিল। যখন কোন বিয়ের মিছিল বাদ্যভাণ্ড বাজিয়ে রাস্তা দিয়ে যাবে তখনই ওটা টাঙাতে হবে। বুড়ো ওয়াং তার স্ত্রীর বুদ্ধির সূক্ষ্মতায় গর্ববোধ না করে পারল না।

অনুবাদ : ঋভুরঞ্জন রায়

হ্রদের ধারে ছেলেটা



ওয়াং টঙঝাও

ওয়াঙ টঙঝাও (১৮৯৭-১৯৫৭) সানদং প্রদেশের ঝুচেঙ-এ জন্মগ্রহণ করেন। পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রাবস্থায় ১৯১৯ সাল থেকে লিখতে শুরু করেন এবং নতুন সংস্কৃতি আন্দোলনে যোগদান করেন। ১৯২২ সালে সাহিত্য গবেষণা সমিতি স্থাপনায় সাহায্য করেন। পরবর্তীকালে ধ্রুপদী সাহিত্য ও শিল্পের গবেষণায় ইয়োরোপ ভ্রমণ করেন। ১৯৩০ সালে স্বদেশে ফিরে জিনান বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা শুরু করেন, সাংহাই-এর কাইমিঙ প্রকাশনা সংস্থায় গ্রন্থ সম্পাদনার কাজে নিযুক্ত হন। ১৯৪৯ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের প্রতিষ্ঠার পর, সংস্কৃতি সংগঠনগুলিতে তিনি নেতৃত্ব পদ অধিকার করেছিলেন। ওয়াং টঙঝাও অনেকগুলি কবিতা ও ছোটগল্প সংকলন প্রকাশ করেছেন। তাঁর যে রচনা সবচেয়ে প্রভাবিত করেছে, তা হল 'পাহাড়ী বৃষ্টি' (Mountain Rain) নামে উপন্যাস, ১৯৩৩-এ প্রকাশিত। তাঁর বৈশিষ্ট্য : দক্ষ ও হৃদয়গ্রাহী চরিত্র চিত্রণ ও অত্যন্ত স্পষ্ট, সূক্ষ্ম গঠনশৈলী।

যদিও বিখ্যাত লেকের পাড়ের শহরেই আমার বাস, তথাপি হ্রদে বেড়াতে আমার ক্বচিৎ-কখনো ইচ্ছে হতো। নলখাগড়া আর নৌকোয় ভরা, মনে হত আশ্চর্য সরু, আর ঠাসা আর গোলমালে ভরা। কখনো কখনো কয়েকজন বন্ধু নিয়ে সন্ধ্যেবেলা নৌকো নিয়ে বেরোতাম, কিন্তু প্রতি রাত্রে সেই একই হৈ-হট্টগোল। কত্তালের ঝনঝন, বেহালার উচ্চগ্রাম নিনাদ, অকথ্য গান, পুরুষদের কর্কশ চিৎকার, জবজবে তেলচুল রঙকরা স্ত্রীলোকদের সম্মোহনী অট্টহাস্য, ফেরিওয়ালাদের ছোট নৌকোয় সওদা বিক্রির হাঁকডাক······লেকের শান্ত জলের বুকে যেন বিশাল ঢেউ-এর মতো ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

আর, সেইজন্য যখনই আমি লেকে যাই, পারিপার্শ্বিক থেকে

আমার চোখ আর কান বন্ধ করে, আমার আপন ভাবনার গভীরে যাই ডুবে। অস্ত সূর্যের সপ্ত রঙ যখন জলে প্রতিফলিত হয়, তখন হ্রদের ধারে নির্জন শান্ত দিকটিতে বাতাস উপভোগ করার জন্যে আমি পায়চারী করি। বৃষ্টির পরে সবুজ ঘাসে ব্যাঙেদের গান শুনি বা শিস্ দেওয়া পাখিদের গাছের শাখায় শাখায় দোল-খাওয়া দেখি। তাতে বেশ উদ্দীপনা বোধ করি এবং প্রকৃতি সম্পর্কে গভীর চেতনায় আলোড়িত ও অসংখ্য দূরগামী ভাবনায় উত্তেজিত হয়ে পড়ি।

একদিন সূর্যাস্তের সময়, বাঁধের ধারে রৌদ্রস্নাত উইলোর ঝুলন্ত শাখাগুলো বেগুনী ও রক্তবেগুনী রশ্মিতে দ্যুতিময় হয়ে উঠেছে। পাশেই মন্দিরের ধারে একটা পুকুরে বিশাল পদ্মপাতা মানুষের মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে। মনে হচ্ছিল পদ্মফুলগুলো যেন যসমে[১] ক্ষোদাই করা। দুপুরের পর থেকেই তারা ধীরে ধীরে তাদের পাপড়ি মুদছিল. দু-একটা মৌমাছি পদ্মের সৌরভে আকৃষ্ট হয়ে তখনও ঘুর ঘুর করছে, স্থান ত্যাগে তারা অনিচ্ছুক। ঘন সবুজ জলের ওপর লাল মেঘ টগবগ করে ফুটে সোনালী হয়ে উঠেছে ; এর মাঝে দ্রুত নিচু হয়ে-আসা রশ্মিগুলো এক উল্লেখযোগ্য বর্ণবৈচিত্র্যের বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে। একের সঙ্গে আর এক রঙ মিশে, এক রঙের ওপর আব এক রঙের প্রতিফলনে চোখ-ধাঁধানো রঙের স্তর-পরম্পরা সৃষ্টি করেছে।

আগের রাত্রে ছ-সাত ঘণ্টা প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়েছে। আজ আকাশ স্বচ্ছ, হ্রদের পশ্চিম পাড় ধরে আমি একা হাঁটছি, টাটকা ধোয়া দৃশ্যটা উপভোগ করছি। পাথর-বাঁধানো ঢালু পথের শ্যাওলার ওপর আমার চামড়ার জুতোর ছাপ পড়ে যাচ্ছে।

হ্রদের মাঝখানে লোকেরা চিৎকার করছিল, ভয়ঙ্কর ঝগড়া করছিল। আমি ধীরে ধীরে পাথর-বাঁধানো পথের শেষ প্রান্তে হেঁটে গেলাম। উইলোর জলছোঁয়া শাখাগুলোতে খস্‌খস্ ধ্বনি, কাঁপন-লাগা নলখাগড়ার পাশে সদ্য ফুলন্ত জলমরিচের ঝাড়গুলো জলের ধারে পশ্চিমা হাওয়ায় নাচছিল। হ্রদের এই জায়গাটা সম্ভবতঃ সবচেয়ে ঠাণ্ডা আর

১. জেড-পাথর

সবচেয়ে নির্জন। ক্বচিৎ কোনও পথচারীর পদশব্দ ছাড়া গাছে ছোট্ট পাখিরা কূজনে সায়াহ্নকে স্বাগত জানাচ্ছিল। ঘাসঝোপে লুকানো ব্যাঙ ছন্দিত ডাকে তাল দিচ্ছে।

যদিও অন্য সময়ের থেকে এই দৃশ্যের অনুভবে আমি স্বাভাবিকের থেকে বেশি আনন্দিত বোধ করছিলাম, তথাপি দ্রুত ম্লান হয়ে-আসা এই দৃশ্য ধরে রাখারও কোনো আগ্রহ আমার ছিল না। কারণ, এই দৃশ্য আমাকে "মুমূর্ষু সূর্যের হলুদ গোধূলি" কথাগুলি মনে করিয়ে দিচ্ছিল, যে কথাগুলোয় আমার বরং মন খারাপ করছিল।

ভাবতে ভাবতে মাথা নিচু করে ক্লান্ত পায়ে ধীরে হাঁটছি। বেগুনী আর লাল সূর্যাস্তের আলো ম্লানতর হয়ে আসছে। ইতিমধ্যেই সূর্যের আলো প্রতিফলিত জলে অর্ধেক ডুবে গেছে। দেরি হয়ে যাচ্ছে জেনেও আমি বাড়ি ফিরতে চাইছিলাম না। হ্রদের ধারে এসে একখণ্ড বড় সাদা পাথরের ওপর আমি বসে পড়লাম। গ্রীষ্মের রাতে ঝিঁঝি পোকাদের গুঞ্জন শুনতে শুনতে আমি বুঝতে পারছিলাম জলের ওপরে ঝরে-পড়া সোনালী কুয়াশায় হৈমন্তী হাওয়ার ছোঁয়া লেগেছে। উইলোর তলায় আমি একা বসে দূরে হলুদ আলো মুছে যেতে দেখলাম, বহুদূরে সন্ধ্যার প্রথম দীপটির ছোট্ট আলোকের আভা লক্ষ্য করলাম। দিনের বেলায় আবহাওয়া উত্তপ্ত ছিল না; সন্ধ্যার সঙ্গে এলো এক কমনীয় শীতলতা। একই সঙ্গে সম্ভবতঃ সেই শীতলতার জন্য, অস্পষ্টভাবে আমার মধ্যে এক অবর্ণনীয় উত্তেজনা সঞ্চারিত হল।

অলস ভাবনায় নিজেকে জড়িয়ে বসেছিলাম, হঠাৎ উইলোর পিছনে খস্খস্ আওয়াজ শুনলাম। শান্ত অন্ধকার থেকে এমন অপ্রত্যাশিত এই শব্দ, যে আমি একটু ঘাবড়ে গেলাম। এক মুহূর্ত পরে নলখাগড়ার জলা মাড়িয়ে হালকা পায়ে চলার শব্দ কানে এল। হঠাৎ লাফিয়ে উঠে, উইলোর চারপাশ ঘুরে জলার অন্যপাড়ে এসে হাজির হলাম। আমি স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছিলাম না। আমার মনে হল নলখাগড়ার পাশে পাড়ের পাঁকের দিকটায় একটা ছোট আকারের শরীর।

"ওখানে কে?" আমি চেঁচিয়ে উঠলাম।

কিন্তু ছায়ামূর্তি কোনও উত্তর দিল না।

সাধারণভাবে এই জায়গাটা খুবই নির্জন। রাত্রে মানুষজন একেবারেই থাকে না। অন্ধকার ক্রমেই ঘনতর হচ্ছে। নলখাগড়া আর উইলোয় খস্‌খস্‌ আওয়াজ হচ্ছে অস্পষ্টভাবে। আমি একটু ভয় পেলাম। আমি আবার চিৎকার করে উঠলাম, "কে ওখানে?" ফিরবো বলে যেই ঘুরে দাঁড়িয়েছি, কাদার পাড় থেকে দুর্বল গলায় ছোট্ট কালো একটা শরীর উত্তর দিল, "আমি···ছোট্ট শান···আমি এখানে···মাছ ধরছি।" সত্যিই সে শেষ কথাটা বলে ঢোক গিললো আর তার গলা সামান্য কেঁপে গেল। গলার স্বরে মনে হল এগারো-বারো বছরের ছেলে। আমার ভীষণ সন্দেহ হল।

"অন্ধকার হয়ে গেছে কিভাবে মাছ ধরিস তুই? কি ভাবে দেখতে পাস?"—আমি বললাম।

সেই ছোট ছায়ামূর্তি এবারেও উত্তর দিল না।

"তুই কোথায় থাকিস্‌?"

"অশ্বশির গলিতে······"

সেই দুর্বল কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল যা আমার পরিচিত মনে হল। আমি আর এক পা কাছে এগিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করলাম, "বরাবরই ওখানে থাকিস্‌?"

"না, আগে থাকতাম শান্তি পথে······" ছেলেটা তাড়াতাড়ি বললো।

হঠাৎ আমার স্মরণ হল, "ওহ! তুই তাহলে চেন্‌-এর ছোট্ট ছেলেটা···তোর বাবা কামার না?"

বাচ্চাটা তার ছিপ তুলে গুটিয়ে আমার দিকে ছুটে এলো, খালি পায়ে কাদার পাড়ের ওপর দিয়ে উঠে এলো, "হ্যাঁ, বাবা কামার। কিন্তু···আপনি কে?"

আমি আরো কাছে গিয়ে বাচ্চাটার মুখের দিকে নজর করলাম। তার মুখ প্রায় চিনতে না পারার মতো। পাঁচ-ছ বছরের সেই সবার প্রিয় টুলটুলে বাচ্চাটার কি চেহারা হয়েছে! তার মুখ কালিমাখা—হয়

কাদায়, না হলে ভুষোয়। একটা খাদির নীল জামা পরা, ঝুল হাটুর অনেকটা ওপরে। গা থেকে ঘাম আর কাদার বোটকা গন্ধ বের হচ্ছে। আমি তার নাম ধরে ডাকছি শুনে, সে অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকালো। সে আমাকে চেনে না।

যখন তার বয়স চার কি পাঁচ, তখন আমি তাকে চিনতাম—বাচ্চাদের সঙ্গে খেলতে আমার খুব মজা লাগে। এদের দরজার সামনে দিয়ে যখনই আমি যেতাম, একটা বিরাট ছায়াভরা বুড়ো দেবদারু গাছের ছায়ায় বাচ্চাটাকে মা'র কোলে বসে থাকতে দেখতাম। আমাকে দেখলেই সে মোরগ ছানার ছড়াটা গেয়ে উঠতো।

ছ-বছরেরও বেশী হয়ে গেছে। আমিও বহুদিন বাইরে ছিলাম। আমার বাড়ির লোকেরা বলেছিল, ছোট্ট শানরা চলে গেছে, কিন্তু ঠিক কোথায় কেউই জানে না। তাদের বাড়ির সামনে দিয়ে যেতে গিয়ে লক্ষ্য করেছিলাম সে-বাড়ির দরজায় অন্য লোকের নাম লেখা। মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল, যেন আমার নিত্যসহচরকে হারিয়েছি!

এই হ্রদের ধারে শাতল সন্ধ্যায় আজ আবার তার সঙ্গে দেখা হওয়ায় বিস্মিত হওয়া ছাড়া উপায় কি? সবচেয়ে অবাক হতে হল, কি ভাবে ধবধবে-হাত লাল-গাল ছোট্ট শান একেবারে রাস্তার ছোট ছোট ভিখিরি ছেলেদের মতোই নোংরা অপরিচ্ছন্ন হয়ে গেল? তার বাবা কামার ছিল, লোকে মান্যগণ্য করতো, আয় যা ছিল তাতে নিজের বাচ্চার খাওয়া-পরা ভালোই চালাতে পারতো।

আমি ছোট্ট শানকে সঙ্গে নিয়ে সেই পাথরটার কাছে গেলাম। তাকে বসালাম আমার পাশে। বললাম, সে যখন খুব ছোট ছিল আমি তার সঙ্গে প্রায়ই দেখা করতে যেতাম, খেলতাম তার সঙ্গে আর তাকে হাসাতাম। সে হতভম্ব হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকলো। আমি তাকে প্রশ্ন করতে লাগলাম।

"তোমার বাবা এখন কোথায়?"

"বলতে পারেন বাড়িতেই..." ছোট্ট শান দ্বিধাজড়িত উত্তর দিল। ওর ভাবে বুঝলাম, এই বয়স্ক বন্ধুকে তার খুব অদ্ভুত লাগছে।

"তোমার বাবা কি এখনও কাজ করে ?"

"কি ?···কাজ ?....বাড়ি থেকে রোজই তো বেরোয়, কিন্তু কোনো দিন তো···ঘরে কোনো টাকা পয়সা আনে না....কাজ ?···আমি ঠিক জানি না।"

"তোমার মায়ের খবর কি ?"

"মরে গেছে।" কাঠকাঠ ছোট্ট জবাব।

আমি ধাক্কা খেলাম। কিন্তু তা-তো হতেই পারে। ছোট্ট শানের মা ছিল ক্ষয়াটে দুর্বল মহিলা। লোকের মুখে শুনেছি, তেরো বছরে তার সাতটা বাচ্চা হয়েছিল। ছোট্ট শানই সবেধন নীলমণি, যে বেঁচে ছিল। কিন্তু তার দিন এতো তাড়াতাড়ি ঘনিয়ে আসতে পারে, তা আমি ভাবি নি।

"তোমাদের বাড়িতে এখন আর কে আছে ?"

"আমার এক মা, নতুন মা···"

"ও, আগের থেকে তোমাদের অবস্থা কি খুব খারাপ হয়ে গেছে ? তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে···"

ছোট্ট শান ছোটবেলাতেই খুব বুদ্ধিমান ছিল। আমার এই কাঠখোট্টা প্রশ্নে, সে দূরের কুয়াশার দিকে তাকিয়ে থাকলো। তারপরে মাথা নিচু করলো। অনেকক্ষণ পরে খুব নিচু গলায় সে বললো, "মাঝে মাঝে আমাদের খাবার কিছুই থাকে না। আমার বাবা প্রায়ই বাড়ি থাকে না···"

"যায় কোথায় সে ?"

"আমি ঠিক জানি না··সকালের জলখাবারের সময় পার করে আসে....শুনেছি, কোনও আফিমের আড্ডায় কাজ করে···কিন্তু কোথায়, তা আমি জানি না।" শান খুব নিচু গলায় আস্তে আস্তে কথা বলছিল। এখন আমি অবস্থাটা বুঝতে পারছিলাম। মনে হচ্ছিল, সমস্তটা জানতেই হবে।

"তোমার এই নতুন মা'য়ের কত···বয়েস কত ? তোমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে তো ?"

"শুনেছি নতুম-মা'র বয়েস মাত্র ত্রিশ। পূব ফটকের ভেতরের একটা পরিবারের মেয়ে···" ওর মুখের ওপর দিয়ে একটা অস্বস্তির ভাব খেলে গেল।

"তোমাকে কি মারধোব করে ?"

"নতুন-মা ? না ! তার সময়ই নেই"—দৃঢ়ভাবে বললো ও। সত্যিই যদি এই যুবতী মহিলাকে এদেব পুরো সংসারটা চালাতে হয়, তাহলে অপব্যয় করার মতো সময় তার না থাকাটাই স্বাভাবিক !

"কিন্তু, কি কাজ করে তোমার নতুন-মা ?"

"কাজ ? নতুন-মা তো কাজ করে না। কিন্তু প্রত্যেক দিন বিকেলের শেষে ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ওই জন্যেই তো আমি বাড়ি থাকতে পারি না·· প্রত্যেকদিন আমি চলে আসি, এই নলখাগড়ার মাঝখানে বসে থাকি ; শুধু এখানটাতে— ঠিক এখানটাতেই...."

"মানে ?"

ছোট্ট শান বয়স্কদের ভাবভঙ্গি শিখে ফেলেছে। ও নাক কুঁচকে একটা অদ্ভুত শব্দ করে বললো, "আমাদের বাড়িতে সবসময় অনেক অতিথি আসে। কখনো কখনো তিন চারজনও এক রাতেই। মাঝে মাঝে একজনও আসে না···"

আমি যদিও প্রচণ্ড নাড়া খেলাম, কিন্তু ও বলেই চললো,

"আমাদের খাবার কেনার মত পয়সা নতুন-মা আয় করতে পারে···যখন অতিথিরা আসে মা আমাকে তাড়িয়ে বের করে দেয়। তখন অনেক রাতের আগে আমাকে কোনও দিন ফিরতে দেয় না। বাবাও রাত্রে বাড়ি ফেরে না···"

এতক্ষণে আমি বুঝে নিয়েছি ভালোভাবেই যে কোন্ পরিবেশ থেকে ছোট্ট শান এসেছে। পুরো ব্যাপারটাই যেন কোনও উপন্যাসের গল্পের মতো ; একটি জটা-চুল ছেলে,চোখ-বসা,ক্ষয়াটে, গাল ভেঙে গেছে, প্রতি রাত্রে নলখাগড়ার মধ্যে খানকা ঘুরে বেড়ায়, খালি পা। যখন খিদে পায় তখন সে শুধু পাখিদের বা ব্যাঙেদের সাথে কথা বলে,এরাই তার বন্ধু ! বা, ক্ষিধের সময় নলখাগড়ার ভেতর দিয়ে বয়ে যাওয়া বাতাসের গান শোনে।

ওর বাবা একটা আফিম আড্ডার পরিচারক। ওর মা—সংমা—বেঁচে থাকার জন্যে সবচেয়ে ঘৃণ্যতম কাজ করছে—দেহ বিক্রি।

স্তব্ধ, জনহীন রাত্রে সে যখন বাড়ি ফেরে তখন তারারা ছোট্ট শানকে সঙ্গ দেয়। কিন্তু, পরের দিন আবার সেই পুরাতনের পুনরাবৃত্তি। এ যেন বড্ড বেশী গল্পের মতো। আমি বিশ্বাস করতেই পারছিলাম না। আমার মনে পড়ছে শৈশবে সে এতো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ফুটফুটে ছিল যে দেখলেই আদর করতে ইচ্ছে হত। কিভাবে এই অবস্থায় সে এসে পড়লো ?

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "যারা তোমাদের বাড়ি প্রতি রাত্রে আসে, তারা কি রকম লোক ?"

ছোট্ট শান বললো, "আমি তো তাদের প্রায় দেখতেই পাই না, আর দেখলেও শুধু এক পলক। কেউ আসে সামরিক খাকি পোশাকে, ফৌজী টুপিতে একচোখ ঢাকা। কারো বা জামার পকেট থেকে ঘড়ির রূপোর চেন ঝুলছে, গা থেকে কেরোসিনের গন্ধ বেরোচ্ছে। দু-একজনের বেশবাস পণ্ডিতদের মতো। এমনিতে রোজ রাত্রে তিনজন বা চারজন অতিথি আসে। কিন্তু মাঝে মাঝে এমন হয় যে একজনও আমাদের চৌকাঠ মাড়ায় না।"

"কিন্তু কেন ?" বুঝতে পারছিলাম আমার এই ক্রমাগত প্রশ্ন করে যাওয়াটা ছেলেটার প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার হচ্ছে। কিন্তু আমি থামতেও পারছিলাম না।

ছোট্ট শান হাসলো। বললো, "জানো না ? অশ্বশির গলির সব বাড়িই তো রোজ রাতে আগন্তুকদের জন্যে খোলা।..." ও আবার হাসলো, যেন আমি একজন শিক্ষিত লোক হয়েও এতো অল্প জানি বলে ও মজা পেয়েছে।

আমার মনে হল ওকে আর কোনও প্রশ্ন করার মানে হয় না। এই নিষ্পাপ শিশুর বিষাদভরা জীবনের ইতিহাস শুনে আমার হৃদয় সমবেদনায় ভরে গেল। মনে হল ও কিছু ভাবছে ; ছোট্ট শান আনমনে কুয়াশার মধ্যে দিয়ে ম্লানদীপ্তি তারাগুলোর দিকে তাকিয়েই আছে।

আমি ভাবলাম, যদি তার নিজের মা বেঁচে থাকতো, তাহলে হয়তো অবস্থা অন্যরকম হত। তার সৎ মা সেই হতভাগ্য স্ত্রীলোক এখন যেভাবে জীবন চালায়, তা নরকের থেকে ভালো নয়।

বৃষ্টির পরে হ্রদের ধার দিয়ে অলসভাবে বেড়ানোর জন্যে আমি এসেছিলাম। কিন্তু অবসর বিনোদনের বদলে বুকের মধ্যে নানা যন্ত্রণা-দায়ক সমস্যা নিয়ে আমাকে ফিরতে হচ্ছে।

চিন্তাই করা যায় না। দুর্ভোগ, ক্ষিধে ও কষ্ট নিয়ে একটি শিশুকে প্রতি সন্ধ্যায় নলখাগড়ার জলায় আসতেই হবে আর মাঝরাত পর্যন্ত সেখানে বসে থাকতেই হবে। যেহেতু পুরো পরিবার চালানোর বোঝাটা তার মা'র কাঁধে, তাই তাকেই সবচেয়ে কুৎসিত সীমাহীন অপমান সহ্য করতে হবে। এ রকম জীবন তো মানুষের জীবনই নয়! আমাদের বর্তমান সমাজে শুধু গরিব লোকেরা কেবল বেঁচে থাকার জন্য এই আশাহীন কানাগলিতে যেতে বাধ্য হচ্ছে।

আমার মধ্যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব কুরে কুরে খাচ্ছিল। মনে মনে ভীষণ বিক্ষুব্ধ বোধ করছিলাম, স্থির হয়ে বসে থাকতে পারছিলাম না। হ্রদের যে দৃশ্য আমার মধ্যে এতো তাজা, স্নিগ্ধ ভাব এনে দিয়েছিল, অনেক আগেই অন্ধকার তাকে গ্রাস করেছে।

ছোট্ট শান এখনও বাড়ি ফিরতে সাহসী হবে না জেনে, পাড়ের ধারে বসে তারার আলো দেখার জন্যে তাকে ছেড়ে যেতে আমার মন চাইছিল না। আমি তার পাশে উইলোর নিচে বসে পড়লাম। তাকে আরো প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হচ্ছিল, বুঝলাম সেটা অত্যন্ত নিষ্ঠুরতা হবে। ভাবলাম, পরিবেশই তো শিশুকে গড়ে তোলে, এটাই তো সত্যি···। আমি ছোট্ট শান ও তার মতো অন্য শিশুদের কথা ভেবে কেঁপে উঠলাম।

হঠাৎ, অপর পাড় থেকে একটা উত্তেজিত ব্যস্ত ডাক শোনা গেল। "ছোট্ট শান···কোথায় তুই ?···" আমি লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। বাচ্চাটা এতো ভয় পেয়ে গেল যে ওর হাত থেকে ছিপটা জলে পড়ে গেল, তারপর সে সরু পথটা ধরে বেগে ছুটতে লাগলো। আমি পুরো-

পুরি হতভম্ব। বুঝতেই পারলাম না কি ঘটেছে। তখনই এক মাঝ-বয়সী লোক নলখাগড়ার বন থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসে ছোট্ট শানের হাত ধরে তাকে নিয়ে ছুটতে লাগলো। লোকটাকে বলতে শুনলাম, 'আজ রাতে পুলিশ তোর বাপকে পাকড়েছে···পুলিশ আফিম-আড্ডায় হানা দিয়েছিল······আমরা তোর মা'কে বলতে পারি নি। ছোট-কর্তা য়ু তার ঘরে। কার ঘাড়ে কটা মাথা যে এখন বিরক্ত করবে।··· খোকা, তুই একমাত্র লোক যাকে আমরা পড়শীরা ব্যাপারটা জানাতে পারি···"

তাদের ছায়া ক্রমশঃ রাতের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল, লোকটার গলাও আর শোনা গেল না।

অতি ধীরে, পা টেনে টেনে আমি বাড়ির পথে চললাম। অল্প লোকই রাতের ঘন কুয়াশায় চলাফেরা করছিল। আমার বুকে ভার চেপে রয়েছে, যেন ওদিন সন্ধ্যের আবহাওয়ার চাপ অসাধারণ ভারী। যে তারাগুলো আমাকে পথ দেখাচ্ছিল, তারা অত্যন্ত ম্লান, রোজকার চেয়ে অনেক বেশী অনুজ্জ্বল ও নিষ্প্রভ।

অনুবাদ : সুজিৎ ঘোষ

১৯০১ সালে সিঙচিয়াং প্রদেশে নিংহাইতে রউ শি জন্মগ্রহণ করেন। নোতুন সাহিত্য আন্দোলনে যোগদান করেন। পরে শিক্ষকতা করেছেন। ১৯২৮ সালে সাংহাইতে লু শুনের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। একসঙ্গে তাঁরা Tatler পত্রিকা চালিয়েছেন। ১৯৩০ সালে চীনা লীগের বামপন্থী লেখকদের কার্যকরী সমিতিতে নির্বাচিত হন। পরে এটির স্ট্যাণ্ডিং কমিটির সদস্যও হয়েছিলেন। ১৯৩১ সালে কুওমিনটাংরা তাকে হত্যা করে।

শুধু বুদ্ধিজীবী নয়, কৃষক বিশেষতঃ নির্যাতিত কৃষক রমণীদের অবস্থা তাঁর সাহিত্যের উপাদান। স্বাধীনতার পর তাঁর গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস Threshold of Spring থেকে Early Spring in February নামক ফিল্মটি তৈরী হয়। তাঁর গল্পগুলির মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় 'বাঁদীমা' গল্পটি। সাবেকি সমাজে সাধারণ মানুষের দুরবস্থা ও যন্ত্রণা গল্পটির বিষয়বস্তু। ১৯৩০ সালে এটি লেখা হয়।

বাঁদীমা



রউ শি

গাঁয়ে শিকারীদের কাছ থেকে চামড়া কিনে শহরে সে বেচত। কখনও মাঠের কাজ সে নিয়ে থাকে ; প্রত্যেক গ্রীষ্মের মুখে ক্ষেতমজুর হিসেবে অন্যের ধানের ক্ষেতে সে কাজ করে। নিঁখুত সরলরেখায় যেহেতু সে চারা পুঁততে পারে, চাষীরা সবসময় তার সাহায্য নিতে উদগ্রীব। সংসারের জন্য তবুও তার আয় যথেষ্ট নয়, এবং প্রত্যেক বছর ধারের পরিমাণ বেড়ে চলে। দুর্ভাগ্যজনক জীবনে এরকম অসহায় অবস্থায় সে মদ খেতে শুরু করে আর এর সঙ্গে জুয়ো তো এসে পড়বেই। ফলে সে হয়ে ওঠে বদমেজাজী। যতই দারিদ্র্য বাড়তে থাকে লোকজন খুব সামান্য টাকাও তাকে ধার দিতে চায় না।

দারিদ্র্যের সঙ্গে এলো অসুস্থতা। রোগা হয়ে গেল সে : অসুখে

পেতলের মতো রঙে তার মুখ ছেয়ে যায় ; চোখের সাদা জায়গাগুলোয় পর্যন্ত হলুদের ছোপ্ লাগে। তাকে ন্যাবায় ধরেছে বলে লোকেরা আলোচনা করে ; ক্ষুদের দল তার নাম দিয়েছে "হলুদ মানুষ।" তার স্ত্রীকে একদিন সে বললো,

"এবার নিস্তার নেই। যা অবস্থা রান্নার হাঁড়িও বেচতে হয়। আমাদের এবার আলাদা হয়ে যাওয়াই ভালো। একসঙ্গে দুজনের না খেয়ে থাকার কোন মানে হয় না।"

"পৃথক হয়ে যেতে হবে?…" আঁতকে ওঠে বৌ। উনুনের পেছনে তিন বছরের ছেলেকে কোলে নিয়ে সে বসেছিল।

—'হুঁ, পৃথক হতেই হবে," কথাগুলো খুব মৃদু শোনায়। "সাময়িক-ভাবে একজন তোমাকে স্ত্রী হিসেবে ভাড়া নিতে চায়।"

"কি বলছো তুমি?" বৌর চেতনা প্রায় লোপ পেয়ে যায়।

কিছুক্ষণের নিস্তব্ধতা। তারপর ভাঙা গলায় স্বামী বোঝায়,

"তিনদিন আগে ওয়াং লাং এখানে এসছিল। তার ধার শোধ দেওয়ার জন্য অনেকক্ষণ ধরে চাপ দেয়। তার যাওয়ার পর আমি বেরিয়ে গেলাম। জিয়ুমু হ্রদের ধারে গাছের নীচে বসে আত্মহত্যার কথা ভেবেছি। গাছে উঠে হ্রদের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে মরার কথা মাথায় আসে। কিন্তু সাহসে কুলোল না। প্যাঁচার ডাকে ভয় পেয়ে গেলাম ; পালিয়ে এলাম আমি। যখন বাড়ী আসছি ঘটকী শ্রীমতী শেনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। রাত্রে বেরুনোর কারণ জানতে চাইল। যা ঘটেছে তা বললাম, আর যাতে ওয়াং লাং নেকড়ের মতো আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে না পারে তাই কিছু টাকা বা মেয়েদের পোশাক কিংবা গয়না যা বন্ধক রেখে টাকা পেতে পারি,—ওর কাছে ধার চাইলাম। কিন্তু শ্রীমতী শেন শুধু হাসল আর বলল,

"তোমার বৌকে নিজের কাছে রাখছ কেন? খুব অসুস্থ আর হলদে হয়ে গেছো তো তুমি!"

শুনে মাথা নীচু করে থাকলাম ; কোন কথা বলি নি। সে বলে চলল,

"তোমার তো একটি মাত্র ছেলে তাকে তুমি ছাড়তে পারবে না। কিন্তু তোমার বৌ···"

"আমি ভাবলাম উনি তোমাকে বিক্রী করে দিতে বলছেন। না, তা নয়,

"আইনের চোখে নিশ্চয়ই সে তোমার বৌ, কিন্তু তুমি গরীব, তুমি তাকে নিয়ে কিছু করতে পার না। তাকে কাছে রেখে লাভ কি? না খেতে দিয়ে মারবে?"

তারপর সরাসরি বলল, "একজন পঞ্চাশ বছর বয়েসী পণ্ডিত-মশায় আছেন। তাঁর স্ত্রী সন্তানউৎপাদনে অক্ষম, তাই তিনি একজন রক্ষিতা খুঁজছেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রী আপত্তি তুলেছেন এ বিষয়ে। শুধু অন্য কারুর বউ কয়েকবছরের জন্য ভাড়া নিলে তাঁর অমত নেই। ঐরকম একজন বউ ঠিক করে দেওয়ার জন্য আমাকে ওনারা বলেছেন। অবশ্যই সেই বউটিকে তিরিশ বছর বয়েসী হতে হবে আর দুটো বা তিনটে ছেলের মা হতে হবে। সেই সঙ্গে সৎ, কর্মঠ হতে হবে তাকে, এবং পণ্ডিতগিন্নীকে মান্য করেও চলতে হবে। উপযুক্ত মহিলা পেলে পণ্ডিতগিন্নী আশি থেকে একশ ডলার পর্যন্ত দিতে পারেন। কয়েকদিন হন্যে হয়ে আমি এরকম একটি স্ত্রীলোক খুঁজে চলেছি; দুর্ভাগ্য যে এখনো পর্যন্ত এরকম একটিরও হদিশ মেলেনি। তোমার বউটিই ঠিক তাই, যা আমি চাই···"

"এ ব্যাপারে আমার চিন্তাভাবনা কি তা সে জানতে চাইল। আমার কান্না পেয়ে গেল, কিন্তু সে আমাকে আশ্বস্ত করে বলল এতে নাকি আমার মঙ্গল হবে।"

একনাগাড়ে এতগুলো কথা বলে তার গলা শুকিয়ে যায়। মাথা নুয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ আলোচনা স্থগিত রাখে। বৌটি যেন বোবা হয়ে যায়। আরও কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতার পর সে আবার শুরু করে,

"গতকাল শ্রীমতী শেন আবার পণ্ডিতমশায়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। সে ফিরে এসে বলল যে, এ প্রস্তাব শুনে পণ্ডিতমশায় ও গিন্নী দুজনই খুব খুশী। এবং আমাকে একশ' ডলার দেবেন বলে

প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। যদি তাঁর একটি ছেলে গর্ভে ধারণ করতে পার, তাহলে তোমাকে তিন বছর থাকতে হবে ; যদি এটি না ঘটে তাহলে বড়জোর পাঁচবছর। শ্রীমতী শেন যাওয়ার দিনও ঠিক করছে—আজ থেকে পাঁচ দিন পর মাসের আঠারো তারিখে তোমার যাওয়ার কথা। আজকেই চুক্তি সম্পাদন হয়ে যাবে।"

বৌটি কাঁপতে থাকে। তার গলার স্বর প্রায় শোনা যায় না, "আমাকে তুমি আগে বলোনি কেন ?"

"গতকাল তিন-তিনবার তোমাকে বলবো বলে চেষ্টা করেছি। ভয় পেয়েছি বলতে। তবে অনেক চিন্তা করে দেখেছি, তোমাকে ভাড়া দেওয়া ছাড়া আমার আর কিছুই করার নেই।"

"সব কী তাহলে ঠিক হয়ে গেছে ?" জিজ্ঞেস করে বৌ। তার দাঁতে দাঁত লেগে যাচ্ছে।

"ঐ শুধু চুক্তি সই করতেই যা বাকী।"

"কি দুর্ভাগ্য আমার ! আর কিছু সত্যিই করার নেই ?"

"ভয়াবহ অবস্থা, আমি জানি। কিন্তু আমরা গরিব এবং মরতে চাই না। তখন আর কী করার আছে ? এ-বছর হয়তো ক্ষেতের কাজও পাব না।"

"চুনবাওয়ের কথা ভেবেছো ? মাত্র তিনবছরের হলো সে। আমি না থাকলে তার কী হবে ?"

"আমি তার দেখভাল করবো। তোমাকে তার জন্যে দুর্ভাবনা করতে হবে না।"

তার নিজের ওপর রাগ বেড়েই চললো। বাইরে চলে গেল সে।

"হতভাগিনী আমি !" দীর্ঘশ্বাস ফেললো বৌ। তবু চোখে জল নেই। মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকে চুনবাও ; "মা, মা" বলে হঠাৎ কেঁদে ওঠে।

যাওয়ার আগে ঘরের সবচেয়ে অন্ধকার জায়গায় বৌ বসে থাকে। উনুনের সামনে প্রদীপ জ্বলছে, আলোর শিখা কাঁপছে। বুকের কাছে চুনবাওকে ধরে তার চুলে নিজের মাথা রাখে। চিন্তায় বুঁদ হয়ে যায়

সে ; চারপাশের ঘটনা সম্পর্কে তার কোন খেয়াল নেই। সাড় ফিরে আসে একটু বাদেই। বর্তমানের কথা, ছেলের কথা ভাবতে থাকে। আদর করে ডাকে, "চুনবাও, চুনবাও।"

"হ্যাঁ, মা !" ছেলে উত্তর দেয়।

"তোমাকে আগামীকাল আমি ছেড়ে যাবো..."

"কী বললে ?" ছেলেটি সত্যিই কিছু বুঝতে না পে'র মায়ের ঘনিষ্ঠ হতে চায়।

"আমি এখন আর আসছি না, অন্তত তিনবছরের জন্য তো নয় !" চোখের জল মুছল সে। ছোট ছেলেটির জিজ্ঞাসু চোখ, "মা, কোথায় যাচ্ছ ? মন্দিরে ?"

"না। আমি প্রায় তিরিশ লি দূরে লি-পরিবারের সঙ্গে থাকতে চললাম।"

"আমি যাবো তোমার সঙ্গে।"

"না, বাবা, তা হয় না।"

"কেন, মা ?" সে জানতে চায়।

"তুমি বাবার সঙ্গে ঘরে থেকো। তোমার দেখাশোনা বাবাই করবেন। তোমার সঙ্গে ঘুমুবেন, খেলবেন। বাবার কথা শুনো কিন্তু। আর তিন বছর..."

তার কথা ফুরোনোর আগেই ছেলেটি আঁতকে ওঠে, "বাবা আমায় মারবে যে !"

"না, বাবা আর তোমাকে মারবে না।" বালকটির কপালের ডান দিকের ক্ষতচিহ্নে মা বাঁ-হাতটা বুলিয়ে দিতে থাকে। লাঙ্গলের ফলা দিয়ে তার স্বামী ছেলেটির মাথায় আঘাত করেছিল। এটি তারই স্মৃতিচিহ্ন।

ছেলের সঙ্গে আবার কথা বলতে যাবে, সেই সময় স্বামী এলো। বৌর কাছে এসে পকেট হাতড়ে কিছু একটা দেখে নিয়ে বললো,

"তাঁরা সত্তর ডলার দিয়েছেন। তোমার ওখানে পৌঁছুনোর দশদিন পর তাঁরা বাকী তিরিশ ডলার দিয়ে দেবেন।"

কিছুটা সময় থেমে থেকে বলে, "পালকি-চেয়ার করে তোমাকে নিয়ে যাবেন তাঁরা।"

আবার নিস্তব্ধতা। শুরু করলো আবার, "প্রাতরাশ সেরেই খুব ভোরে পালকি-বেহারারা তোমাকে নিতে আসবে।"

একথা বলে সে আবার বেরিয়ে যায়।

সেদিন সন্ধ্যায় স্বামী-স্ত্রী কারুরই খাওয়ার ইচ্ছে থাকে না।

পরের দিন ঝিরঝিরে বৃষ্টি। বসন্তে এরকম বৃষ্টি হয়।

ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই পালকি-বেহারারা হাজির। যুবতীটি সারারাত ঘুমোয় নি। সারারাত জেগে চুনবাওয়ের ছেঁড়া পোশাক রিপু করেছে। বসন্তের প্রায় শেষ, গরমকাল এসে যাচ্ছে, তবু ছেলের তুলোর জামাটা বার করে সে তার স্বামীকে দিতে গেল, স্বামী গভীর নিদ্রায় মগ্ন। সে স্বামীর পাশে বসল, স্বামীর সঙ্গে দুয়েকটি কথা বলবে। কিন্তু স্বামী ঘুমুচ্ছে, সুতরাং সে চুপ করে বসে থাকে। রাত শেষ। খুব সাহস ভরে অগোছালভাবে সে কয়েকটি কথা স্বামীর কানের কাছে উচ্চারণ করে। তবু তার ঘুম ভাঙ্গে না। সুতরাং তাকেও শুয়ে পড়তে হয়।

সবে ঘুম এসেছে, চুনবাও জেগে যায়। ঘুম থেকে উঠে মাকে ঠেলা দেয়। ছেলেকে পোশাক পরিয়ে মা বলে, "বাবা, আমি চলে গেলে কেঁদো না কিন্তু। তাহলে বাবা মারবে। দেখো, তোমার জন্য আমি মিষ্টি আনব। কাঁদলে হবে না।"

দুঃখ কাকে বলে এত ছোট ছেলে জানবেই বা কি করে, তাই একটু বাদেই গান গাইতে শুরু করে। মা চুমু খায় এবং বলে,

"গান থামাও এখন, নইলে বাবা জেগে যাবে।"

বাড়ির সামনে বেঞ্চে বসে পাইপ টানছিল আর গল্প করছিল বেহারারা। পাশের গাঁয়ে শ্রীমতী শেনের বাড়ি। সে হাজির হল কিছু পরেই। বয়স হয়েছে তার, আর বিয়ে-সাদির ব্যাপারে সে খুবই অভিজ্ঞ। ঘরে ঢুকেই পোশাক থেকে বৃষ্টির জল ঝেড়ে ফেলে বর-বৌর উদ্দেশে বলল,

"বাইরে বৃষ্টি পড়ছে তো পড়ছেই। এটা ভাল লক্ষণ —এখন থেকে তোমরা উন্নতি করবে।"

সারা ঘরময় পায়চারি করতে করতে সে স্বামীর কানে কানে বলল, এরকম সাবলীল ক্রিয়াসম্পাদনের জন্য তার পুরস্কার পাওয়া উচিত।

"সত্যি কথা বলতে কি, আর পঞ্চাশ ডলার ঠেকালেই বুড়ো মানুষটি একজন রক্ষিতা পেতেন", সে বলেই ফেলে।

নিথর যুবতীর দিকে ফিরে শ্রীমতী শেন চেঁচিয়ে ওঠে, "বেহারাদের দুপুরের খাওয়ার আগেই পৌঁছুতে হবে। জলদি তৈরী হয়ে নাও।"

যুবতী তার দিকে তাকাল, যেন বলতে চাইল, "এখান থেকে আমি যাবো না! না খেয়েই মরবো বরং!"

ঘটকী-ঠাকরুন সামলে নেয়, কাছে গিয়ে মিষ্টি করে বলে,

"বাছা, বড় বোকা মেয়ে তুমি। 'হলুদ মানুষটার কাছে তুমি কি পাও? আর পণ্ডিতমশায়ের ওখানে সব জিনিসের ছড়াছড়ি। হুশ মু-এরও বেশি জমি তাঁর। নিজের বাড়ি আর অনেক গৃহপালিত জন্তু। তাঁর স্ত্রীর মেজাজটিও ঠাণ্ডা, আর মহিলা খুব দয়ালুও। কিছু খেতে না দিয়ে কোন অতিথিকে বাড়ি থেকে ফেরান না। সত্যি বলতে কী, পণ্ডিত-মশায়েরও এমন কিছু বয়েস হয় নি। শুভ্র মুখমণ্ডল। দাড়ি নেই। একটু নুয়ে চলেন, সে তো সব জ্ঞানীগুণী লোকেদের বেলায় ঘটে থাকে। নিপাট ভদ্রলোক। তাঁর সম্পর্কে আর কীই বা বলার থাকতে পারে? পালকি থেকে বেরিয়ে নিজের চোখেই তো সব দেখতে পাবে। তুমি তো জানো ঘটক হিসেবে আমি কখনও মিছে কথা বলি না।"

চোখের জল মুছে যুবতী মৃদুস্বরে বলে, "চুনবাও···আমি তাকে ছেড়ে যাবো কী করে?"

"দেখো, চুনবাও ঠিক থাকবে," ঘটক-ঠাকরুণ আশ্বস্ত করে। "তিন বছর বয়েস তো হয়ে গেছে। আর কথায় আছে, 'বয়েস যার তিন, সে হোল স্বাধীন।" সুতরাং তাকে ছেড়ে যাওয়া যায়। অবশ্য এটা তোমার ব্যাপার। আর সেখানে তোমার একটা-দুটো ছেলে হলেই সব মিটে যাবে।"

দরজার বাইরে অপেক্ষমাণ বেহারারা যাওয়ার জন্যে যুবতীকে তাড়া দিতে থাকে, "তুমি তো বাচ্চা কনে নও, কাঁদছো কেন ?"* মায়ের কাছ থেকে চুনবাওকে ছিনিয়ে নিয়ে ঘটক-ঠাকরুণ বলে,

"চুনবাওকে আমার কাছেই দিয়ে যাও।"

ছোট ছেলেটা চেঁচাতে থাকে। পা ছোঁড়ে। ঘটক-ঠাকরুন তাকে বাইরে নিয়ে যায়। পালকি-চেয়ারে বসে যুবতী বলে,

"বাইরে বৃষ্টি পড়ছে, আপনি বরং ওকে ভেতরে নিয়ে যান।"

ঘরের মধ্যে গালে হাত দিয়ে ছোট ছেলেটির বাবা বসেছিল— নিস্পন্দ ও নির্বাক।

দুটো গাঁয়ের ব্যবধান তিরিশ লি, কিন্তু একবারও না থেমে তারা গন্তব্যস্থলে পৌছে যায়। পালকি চেয়ারের পর্দা এড়িয়ে বসন্তকালীন বৃষ্টিতে তার পোশাক ভিজে গেছে। প্রায় বছর পঞ্চাশের ফুলো-মুখো ধুরন্ধর চোখওয়ালা এক মহিলা তাকে অভিনন্দন জানালেন। সঙ্গে সঙ্গে যুবতী বুঝতে পারে এই সেই পণ্ডিতগিন্নী। তার দিকে লজ্জিতভাবে তাকিয়ে সে চুপ করে থাকে। যখন পণ্ডিতগিন্নী যুবতীকে তাঁর দয়ার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, সে সময় লম্বা, রোগা একজন বয়স্ক লোক ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। গোল আর মসৃণ তাঁর মুখ। পা থেকে মাথা পর্যন্ত যুবতীকে দেখে নিয়ে হেসে তিনি মন্তব্য করলেন,

"খুব তাড়াতাড়ি এসেছো। বৃষ্টিতে ভেজোনি তো ?"

স্বামীর কথা শুনেও না শোনার ভান করে পণ্ডিতগিন্নী যুবতীকে প্রশ্ন করলেন,

"পালকিতে কিছু ফেলে এসেছো কী ?"

"না, কিছুই না", যুবতী উত্তর দিল।

তাঁরা অন্দরে প্রবেশ করলেন। দরজার বাইরে প্রতিবেশী মহিলারা জড়ো হয়ে উঁকি দিচ্ছে। খতিয়ে দেখছে কি ঘটলো।

নোতুন ঘর আর সাময়িক স্বামীর সুন্দর ব্যবহারে পরিবর্তিত অবস্থায় যদিও তার সন্তুষ্ট হওয়ার কথা, তবু পুরোনো ঘর ও চুনবাওয়ের

* অতীত দিনে চীনে নববিবাহিতা বাড়ি ছাড়ার পূর্বে কাঁদত।

কথা যুবতী কিছুতেই ভুলতে পারে না। পণ্ডিতমশায় সত্যিই দয়ালু ও মৃদুভাষী। গিন্নী অতিথিপরায়ণ ও বাচাল। পণ্ডিতমশায়ের সঙ্গে তিরিশ বছরের সুখী বিবাহিত জীবন নিয়ে তিনি আলোচনা করছিলেন। প্রায় পনেরো বছর পূর্বে তাঁদের একটি সন্তান জন্মায়—ভারী সুন্দর ও প্রাণবন্ত ছেলে। কিন্তু, হায়, জন্মানোর পর দশমাসের কম সময়ে বসন্তের প্রকোপে ছেলেটি মারা যায়। তারপর আর ছেলেপুলে হয়নি। বহুদিন ধরেই স্বামীর ওপর চাপ দিচ্ছেন গিন্নী যাতে তিনি একটি রক্ষিতা রাখেন। সব সময় সেই চাপ এড়িয়ে চলেছেন স্বামী। বিবাহিতা স্ত্রীর সঙ্গে গভীর প্রেম বা রক্ষিতা হিসেবে উপযুক্ত পাত্রীর অভাবে তিনি এটি করেছেন বলে মনে করেন গিন্নী। এবংবিধ আলাপে ক্রমান্বয়ে বিমর্ষ, প্রফুল্ল এবং হতাশ হয় যুবতী। অবশেষে, ইতিকর্তব্য সম্পর্কে যুবতীকে উপদেশ দেন গিন্নী।

'তোমার তো তিন-চারটে ছেলে। কি করতে হবে সে সম্পর্কে তুমি নিশ্চয়ই ওয়াকিবহাল। আমার চেয়ে তোমার এ ব্যাপারে বেশি দখল থাকা স্বাভাবিক"—গিন্নীর এসব কথা শুনে যুবতী লজ্জায় রাঙা হয়ে যায়।

আলাপের পর বয়স্কা মহিলাটি চলে যান।

নিকট সম্পর্ক স্থাপনের ইচ্ছায় ঐ সন্ধ্যাতেই পণ্ডিতমশায় যুবতীকে ঐ পরিবারের অনেক বিষয় সম্পর্কেই ওয়াকিবহাল করেন। পালিশ-করা কাঠের আলমারির পাশে যুবতী বসে ছিল। পুরোনো ঘরে এ ধরনের কোন আসবাব যুবতীর ছিল না। নিথর চোখ দুটি দিয়ে যুবতী সেটাকে খুঁটিয়ে দেখছিল। এসময় পণ্ডিতমশায় ঢুকে ঐটির সামনে বসলেন। তাঁর নাম তিনি জিগ্যেস করলেন।

চুপ করে থাকে সে; হাসেও না পর্যন্ত। উঠে দাঁড়িয়ে বিছানার দিকে এগিয়ে যায়। তাকে অনুসরণ করেন তিনি, মুখে তাঁর আনন্দের চিহ্ন।

"লজ্জা পেও না। এখনও স্বামীর কথা ভাবছো? যাঃ, এখন তো আমিই সে!" তার হাত ছুঁয়ে মিষ্টি করে কথাগুলি বলেন পণ্ডিত-

মশায়। "দুঃখ কোরো না! বলো তো, এখনও ছেলের কথা ভাবছো কিনা। আচ্ছা…"

অট্টহাস্যে ফেটে পড়েন তিনি আর সঙ্গে সঙ্গে লম্বা জোব্বা খুলে ফেলেন।

ঘরের বাইরে সে সময় গিন্নী কাউকে বকছেন বলে যুবতীর মনে হয়। স্পষ্ট করে বোঝা যায় না, তবু বোধ হয় রান্নার মেয়েটিকে বকছেন অথবা যুবতীকেও হতে পারে। দুঃখে ভারাক্রান্ত যুবতীর মনে হলো তার উদ্দেশ্যেই এই গালিগালাজ। বিছানায় শোয়া অবস্থায় পণ্ডিতমশায় অবশ্য বলেন,

"ও-সবে কান দিও না। সব সময় এরকম গজগজ করা তাঁর স্বভাব। ক্ষেতের লোকটাকে তাঁর খুব পছন্দ, এবং রান্নার মেয়েটিকে তিনি বকে থাকেন ; কেননা সে ভীষণ গল্প করে ঐ লোকটার সঙ্গে।"

সময় দ্রুত চলে যায়। নোতুন ঘরের নানান ব্যাপারে সে যতবেশি পরিচিত হয়ে ওঠে পুরোনো ঘরের চিন্তা ক্রমশ ততই অস্পষ্ট হয়ে যায়। কখনও চুনবাওয়ের চাপা কান্না ভেসে আসে, মাঝেমধ্যে স্বপ্নে দেখে তাকে। নোতুন জীবনে গভীরভাবে অভ্যস্ত হয়ে গেলে পর ঐসব স্বপ্নও আর সে দেখে না। আপাতভাবে যদিও দয়ালু মনে হয়, আসলে পণ্ডিতগিন্নী ঈর্ষায় ও সন্দেহে ফুঁসছেন বলে যুবতীর ধারণা। ফলে পণ্ডিতমশায় ও তার মধ্যে কি ঘটছে জানার জন্য গোয়েন্দাদের মতো গিন্নী ওঁত পেতে থাকেন। ঘরে ফেরার পথে যদি পণ্ডিতমশায় যুবতীর সঙ্গে আলাপ করেন তাহলে গিন্নীর সন্দেহ, তিনি বোধ হয় যুবতীর জন্য বিশেষ কিছু কিনে এনেছেন। রাত্তিরে শোয়ার ঘরে ডেকে স্বামীকে একপ্রস্থ গালমন্দ শুনিয়ে দেন গিন্নী। "বটে, ডাইনীর পাল্লায় পড়েছ!" কেঁদে ওঠেন গিন্নী। "বুড়ো হাড়ের ভালো করে যত্ন নিও।" প্রায়ই এসব গালমন্দ যুবতীর কানে যেত। যখনই এরপর পণ্ডিতমশায় বাড়ী ফিরতেন, স্ত্রীর অনুপস্থিতিতে যুবতী তাকে এড়িয়ে চলত। এমনকি স্ত্রীর উপস্থিতিতেও সে যতটা সম্ভব আত্মগোপন করে থাকত। বাইরের কেউ যাতে জানতে না পারে সেজন্যই যুবতী এরকম করত। অন্যথায়

বাইরের লোকের কাছে তাকে হেয় করার জন্য রেগে গিয়ে গিন্নী অনর্থক গালমন্দের স্রোত বইয়ে দিতে পারেন। এমনকি ঝিয়ের কাজও তাকে দিয়ে করিয়ে নেন গিন্নী। একদিন বয়স্কার কাপড় পরিষ্কার করতে গিয়ে গোল বাধে।

"আমার কাপড় পরিষ্কার করার কথা নয় তোমার," গিন্নী মন্তব্য করেন। "তোমার কাপড় কাচার জন্য তো কাজের মেয়েটি আছে।" একটু পরেই নোতুন একটি প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন,

"লক্ষ্মী বোন আমার, তুমি বরং খোঁয়াড়ে গিয়ে শুয়োর দুটোকে দেখো একবার। সারাদিন ঘোঁৎঘোঁৎ করছে। বোধ হয় কাজের মেয়েটি উপযুক্ত খাওয়ার দিচ্ছে না।"

আট মাস কেটে গেছে এবং শীত এসে গেল। খাওয়া নিয়ে খুঁৎ-খুঁৎ করে যুবতী। রোজকার খাবারে অনীহা দেখা দেয় এবং সবসময় নোতুন কিছু খেতে ইচ্ছে করে—নুড্‌ল, আলু বা এরকম কিছু। তারপর নুড্‌ল বা আলুও আর তার খেতে ইচ্ছে করে না। ভাজা মাংসে তার খুব নোলা এখন। আবার একটু বেশি খাওয়া হলেই সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। তরমুজ খেতে ইচ্ছে করে! সে তো শুধু গরমের দিনে পাওয়া যায়। এসবের অর্থ পণ্ডিতমশায় বোঝেন। সারাটা সময় তাঁর মুখে হাসি লেগে থাকে, আর যা পাওয়া সম্ভব তাই তাকে দেন। শহরে গিয়ে তার জন্য টক লেবু নিয়ে আসেন এবং কখনও কখনও কাউকে কমলালেবু কিনে আনার নির্দেশও দেন। কখনও কখনও বারান্দায় পায়চারি করতে করতে বিড়বিড় করে নিজের মনে কথা বলেন। নববর্ষ উৎসবের জন্য একদিন যুবতীকে ও কাজেব মেয়েটিকে চালগুঁড়ো করতে দেখলেন তিনি। সবে শুরু করেছে এমন সময় তিনি যুবতীর উদ্দেশ্যে বলে উঠলেন, "এখন বরং তোমার বিশ্রাম নেওয়া দরকার। সবাই যখন পিঠে খাবে ক্ষেতের লোকটিই করুক এসব।"

কখনও সন্ধ্যায় সবাই যখন গল্পে মত্ত, তখন তিনি একলা প্রদীপের সামনে বসে "সঙ্গীত-গীতিকা" খুলে মহীয়সী কন্যার গীত সুর করে পড়েন।

একসময় ক্ষেতের লোকটি জিগ্যেস করে,

"হুজুর, এ বই কেন পড়ছেন? আপনি তো উচ্চতর কোন পরীক্ষা দিচ্ছেন না, তাহলে এসবের কি প্রয়োজন?"

শ্মশ্রুহীন চিবুকে হাত দিয়ে উচ্ছল গলায় তিনি বলে বসেন, "জানিস্, জীবনের আনন্দ কাকে বলে? কথায় আছে, জীবনের সবচেয়ে বড় আনন্দ—বাসরে প্রথম রাত্রি উদযাপন, নাহলে সবচেয়ে বড় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্য। আমার কথা যদি বলিস, আমি ওই তুটোই পেয়েছি। এখন তাদের চেয়েও বড় কিছু আনন্দের ঘটনা আসছে।"

সব্বাই হেসে গড়িয়ে পড়ল—ব্যতিক্রম শুধু তুজন, তাঁর গিন্নী ও যুবতী।

গিন্নীর কাছে এগুলো বিরক্তিকর। যুবতী অন্তঃসত্ত্বা জেনে প্রথমে গিন্নী খুশী হয়েছিলেন। যুবতীর প্রতি স্বামীর অত্যন্ত পক্ষপাত দেখে পরে নিজের ভাগ্যকে দোষ দিতে বসেন। সেবছর বসন্তে একদিন যুবতী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে, এবং মাথার যন্ত্রণায় তিনদিন বিছানায় পড়ে থাকে। তার বিশ্রামের কথা ভেবে পণ্ডিতমশায় খুব উদ্বিগ্ন হলেন এবং প্রায়ই তার পরিচর্যা করতে থাকেন। এতে গিন্নী আরও চটে গেলেন। তিনদিন ধরে তিনি গজরাতে থাকলেন এবং অসুখের ছুতোয় যুবতী কাজে অবহেলা করছে এরকম অভিযোগ তুললেন।

"মেয়েটা একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে, খাঁটি রক্ষিতার মতো নবাবীচাল দেখাচ্ছে," মন্তব্যটি গিন্নীর। "সবসময় গাঁইগুঁই করছে—এই মাথা ধরেছে, এই পিঠে ব্যথা। আগে এরকম ছিল না—এক দঙ্গল বাচ্চা প্রসব করতে গেলেও কুকুরকে খাবার জোগাড়ে বেরুতে হয়! বুড়ো ভামের সোহাগে যেন হাতির পাঁচ পা দেখেছে!"

"একটা বাচ্চা হবে বৈ তো নয়। এত আদিখ্যেতা কিসের বাপু?" একদিন রাতে রান্নার মেয়েটিকে বললেন গিন্নী, "আমারও তো একবার পেটে দশমাস বাচ্চা ছিল, বিশ্বাসই হয় না মেয়েটি এত অসুস্থ হয়ে পড়বে। আর তারপরও কীই বা তিনি প্রসব করতে চলেছেন, কে

জানে? ক্ষুদে একটা ব্যাঙও বেরিয়ে আসতে পারে! এত গুমোর বাছা, আমার কাছে চলবে না। আর এটা একটা রক্তের পিণ্ড বৈ তো নয়! এত বাহাদুরির সময় এখনও আসে নি।”

না খেয়েই যুবতী ঘুমুতে গিয়েছিল। খিস্তির তোড়ে তার ঘুম ছুটে যায়, ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করে। পণ্ডিতমশায়ও অত্যন্ত আহত হলেন—কালঘাম ছুটল আর রাগে ফুঁসতে থাকলেন। স্ত্রীর ঘরে গিয়ে চুলের মুঠি ধরে বেদম মার দেওয়ার ইচ্ছে জাগে। কিন্তু অসহায় তিনি; আঙ্গুলগুলো কাঁপছে, ক্লান্তিতে হাতে জোর নেই। দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে একটি কথা বেরিয়ে এল, ‘আমি তার সঙ্গে খুব ভালোমানুষী করেছি তিরিশ বছরের দাম্পত্যজীবনে একবারের জন্যও মারি নি, আঁচড়াইনি পর্যন্ত। এতেই ও মাথায় উঠেছে।”

গুঁড়ি মেরে বিছানায় উঠলেন। ফিসফিস করে যুবতাকে অনুরোধ করলেন,

“লক্ষ্মীটি, কান্না থামাও। ওকে বকতে দাও। বাঁজা মুরগীর ওরকম ঈর্ষা থাকে! ছেলে হলে তোমাকে দুটো দামী উপহার দেবো—নীল জেডের আংটি আর একটি সাদা জেড···।” শেষ বাক্য অসমাপ্ত রেখে ঘরের বাইরে স্ত্রীর বিদ্রূপ কান পেতে শোনেন। চটপট বিবস্ত্র হয়ে লেপের মধ্যে মাথাটা ঢুকিয়ে দেন। এবার খুনসুটি চলে,

“আমার একটা সাদা জেড আছে···”

যুবতী স্ফীতকায়া হয়ে ওঠে। ধাই-এর ব্যবস্থা করেন গিন্নী। এবং যখন শুধু বাইরের লোকেরা উপস্থিত থাকে সে সময়টিকে তিনি বেছে নেন বাচ্চার পোশাক বানানোর উপযুক্ত মুহূর্ত হিসেবে।

দাবদাহ শেষ হয়ে গেছে এবং শরতের হিমেল বাতাস গাঁয়ের ওপর দিয়ে বইতে শুরু করেছে। গোটা পরিবারের আশঙ্কা চূড়ান্ত লগ্নে পৌঁছোয়, সেদিন সবাই হাঁ করে বসে থাকে। পণ্ডিতমশায়ের বুক দুরুদুরু করে। গোটা উঠোন জুড়ে পায়চারি করতে থাকেন। হাতে পাঁজি নিয়ে হস্তরেখা অধ্যায়টি এরকম মনোযোগ দিয়ে পড়তে শুরু করেন যে, মনে হয় তিনি বোধ হয় গোটা বইটা মুখস্থের ফন্দি

আঁটছেন। বিহ্বলচিত্তে বন্ধ ঘরের দিকে মাঝে মাঝে তাকান। সে ঘর থেকে মায়ের গোঙানি শোনা যায়। কখনও মেঘলা আকাশের দিকে চেয়ে থাকেন, আর রাঁধুনি মেয়েটির কাছে প্রশ্ন ধরেন,

"এখন সব কিরকম চলছে?"

কিছুক্ষণ থেমে মাথাটা দুলিয়ে সে উত্তর দেয়,

"না, বেশি বাকী নেই, এই এসে গেল!"

উঠোনময় পায়চারি অব্যাহত থাকে। এবং পাঁজি পড়ে যেতে থাকেন তিনি।

সূর্যাস্ত অবধি এরকম চলতে থাকে। যখন রান্নাঘর থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী ওঠে আর ঘরে ঘরে আলো জ্বলে ওঠে, তখন বসন্তের বুনো ফুলের মতো, বাচ্চাটি প্রথম পৃথিবীর আলো দেখে। ঘরের এক কোণে পণ্ডিতমশায় বসে থাকেন। আনন্দাশ্রু টলটল করে। আর সে সময় শিশুটি তারস্বরে চেঁচিয়ে ওঠে। জবর উত্তেজনায় বাড়ির সবাই রাতের খাওয়ার কথা ভুলে যায়।

মাসখানেক পরে চকচকে তুলতুলে শিশুটি খোলা হাওয়ায় বেরোয়। যুবতী যখন বুকের দুধ খাওয়ায় প্রতিবেশী মহিলারা শিশুটিকে দেখে পরিতৃপ্ত হয়। তার নাকটা কারুর পছন্দ, কেউবা তার মুখটা ভালবাসে; কেউ আবার শুধু তার কান দুটো। তার মায়ের প্রশংসায়ও কয়েক-জন মশগুল—সবাই বলে যে, মা আরও ফর্সা ও স্বাস্থ্যবতী হয়েছে। এখন গিন্নী ঠানদিদির ভূমিকায়,

"বাস্! তুমিতো বাচ্চাটাকে কাঁদিয়েই মারবে!"

এবার বাচ্চার নাম রাখার পালা। পণ্ডিতমশায় তো ভেবেই অস্থির। তিনি উপযুক্ত নামের হদিশ পেলেন না। গিন্নী বাতলালেন যে, চীনা শোউ অর্থাৎ দীর্ঘজীবন বা এরই সমার্থক কোন শব্দ, নামের মধ্যে থাকতে হবে। পণ্ডিতমশায়ের এটি আবার না-পসন্দ, কেননা এধরনের নাম আকচার শোনা যায়। উপযুক্ত নামের সন্ধানে পরিবর্তনের কথা' ও 'ইতিহাসের কথা' প্রভৃতি চীনা জাতীয় গ্রন্থগুলি কয়েক সপ্তাহ ধরে তিনি চষে ফেললেন। কিন্তু কোন ফল পাওয়া গেল না।

আসলে এটি খুব শক্ত সমস্যা, কারণ এমন একটা নামের সন্ধানে তিনি আছেন যেটা হবে পবিত্র এবং একই সঙ্গে তাঁর বৃদ্ধবয়েসে জন্মেছে এরকম ইঙ্গিত বহন করবে। মাসতিনেকের শিশুটিকে কোলে করে এক সন্ধ্যায় চশমাটি পরে তিনি প্রদীপের সামনে বসলেন। আরও কয়েকটি বই তন্নতন্ন করে দেখে উপযুক্ত নামের খোঁজে ব্যাপৃত হলেন। ঘরের একপাশে চুপ করে বসে শিশুর মা বিড়বিড় করে চলেছে। হঠাৎ সে বলে ওঠে,

"আমার মনে হয় একে তোমরা 'কিউবাও' বলে ডাকতে পার।" উপস্থিত সবাই যুবতীর দিকে তাকায় ও তার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনে, "কিউ মানে শরৎকাল আর বাও মানে রত্ন। যেহেতু ও শরতে জন্মেছে, তার নাম অতএব কিউবাও।"

পণ্ডিতমশায় চুপ করে থাকেন, এবার বিস্ময়ে মন্তব্য করে বসেন,

"কি বুদ্ধি তোমার! বাচ্চাটার নামের জন্য অনর্থক অনেকটা সময় নষ্ট করেছি। পঞ্চাশের কোঠায় বয়েস আমার, সুতরাং জীবনের শরতে আমি পৌঁছে গেছি। আর বাচ্চাটাও শরতে এসেছে। তাছাড়া, সব-কিছু শরতে পাকে ও এটাই ফসল তোলার সময়। 'ইতিহাসের কথা'তেও তাই আছে। সত্যিই 'কিউবাও'ই বাচ্চাটির পক্ষে উপযুক্ত নাম।"

যুবতীর প্রশংসায় মুখর হয়ে ওঠেন তিনি। তাঁর মতে, সে বুদ্ধি-মতী আর তাঁর মতো গ্রন্থকীট হওয়ার সত্যিই কোন মানে হয় না। তাঁর কথায় যুবতী অস্বস্তি বোধ করে। মাথা নুইয়ে অল্প হেসে নিজের মনে সে বলে ফেলে,

"বড় ছেলে* চুনবাও-এর কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ 'কিউবাও' নামটি আমার মনে এসেছে।" তার চোখে জল দেখা দেয়।

দিনে দিনে কিউবাও সুন্দর হয়ে ওঠে। মায়ের খুবই ন্যাওটা। অপরিচিত লোকদের সে ড্যাবড্যাব করে দেখে, আর মাকে দেখলেই সে যত দূরেই হোক না কেন আনন্দে দিশেহারা হয়ে যায়। মায়ের

* চুনবাও-এর অর্থ বসন্তের রত্ন

সঙ্গ সে কিছুতে ছাড়ে না। মায়ের চেয়ে পণ্ডিতমশায় যদিও তাকে বেশী ভালবাসেন, কিউবাও কিছুতেই তাঁকে পছন্দ করে না। ওপরে ওপরে গিন্নী যতই কিউবাও-এর প্রতি স্নেহ দেখান না কেন অপরিচিতের মতোই সে গিন্নীর দিকে তাকিয়ে থাকে।

গরমের দিন এসে পড়ে। যুবতীর তিনবছর থাকার মেয়াদ শেষ হয়ে আসছে।

শুধু কিউবাওর প্রতি অত্যন্ত স্নেহে পণ্ডিতমশায় গিন্নীকে প্রস্তাব দিলেন যুবতীকে আরো একশ ডলার দিয়ে পুরোপুরি কিনে নিতে—যা-তে কিউবাও মায়ের সঙ্গে সারাজীবন থাকতে পারে। অবশ্য এতে গিন্নীর সাফ জবাব,

"না, তা হতে দেবো না। তার আগে আমাকে বিষ খাইয়ে মারতে হবে।"

পণ্ডিতমশায় খুব চটলেন। গুম হয়ে রইলেন। ঈষৎ হেসে তারপর অবশ্য শুরু করলেন,

"ছেলেটি হতভাগা! মাতৃহীন হয়ে তাকে বাঁচতে হবে।"

বিদ্রূপ মেশানো ক্ষুরধার হাসিতে গিন্নীর তির্যক উত্তর,

"আরে, আমিও তো ওর মা হতে পারি।"

যুবতীর মনে তখন চলছে দুটি বিপরীত মতের দ্বন্দ্ব। সবসময় তার মনে থাকে যে তিন বছর পর তাকে চলে যেতে হবে। তিনবছর আর কতটুকু সময়? সাময়িক স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও এখন তাকে ঝিয়ের কাজই বেশী করতে হয়। কিউবাও-এর মতোই মিষ্টি আর জীবন্ত তার বড় ছেলে চুনবাও। কিউবাও বা চুনবাও কারুর কাছ থেকেই সে দূরে থাকতে চায় না। সবচেয়ে বড় কথা, পণ্ডিতমশায়ের বাড়িতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে থাকাটা তার অপছন্দ নয়, কেননা কয়েক বছরের মধ্যেই তার নিজের স্বামী মারা যাবে। যদি পণ্ডিতমশায় চুনবাওকে এনে এখানে রাখেন, তাহলে বড় ভালো হয়।

নিদ্রিত কিউবাওকে বুকের কাছে ধরে একদিন খুব ক্লান্ত হয়ে সে বারান্দায় বসে ছিল। প্রথম গ্রীষ্মের মিষ্টি রোদের মাদকে বুঁদ হয়ে সে

দিবাস্বপ্নে ডুব দেয়। দেখে চুনবাও ঠিক তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু যেই চুনবাওকে সে ধরতে যায় অমনি কখন সে মিলিয়ে যায় হাওয়ায়।

বারান্দার অন্য প্রান্তে মিষ্টি হাসি আর ধারালো দৃষ্টি মেলে গিন্নী যুবতীর কাণ্ড দেখছিলেন। নিজের মনে মনে যুবতী আলোচনা করে,

"না, এখানে থাকা চলে না। সবসময় আমার ওপর গোয়েন্দাগিরি!"

নিজের প্রস্তাবে কিছুটা রদবদল ঘটালেন পণ্ডিতমশায়। শ্রীমতী শেনকে আর একবার দৌত্যকাজে নিয়োগ করলেন। দেখতে হবে, আর তিরিশ কিম্বা বড়জোর পঞ্চাশ ডলারের বিনিময়ে যুবতীকে তার স্বামী আরো বছর তিনেকের জন্য পণ্ডিতমশায়ের কাছে বাঁধা রাখতে রাজী কি-না। গিন্নীকে তিনি শুধোন,

"কিগো, যদ্দিন না সে পাঁচে পড়ছে কিউবাওর মাকে রাখলে ভাল হয় না?"

গিন্নী তখন 'বুদ্ধ আমাকে রক্ষা করুন' মন্ত্র জপ করতে ব্যস্ত। উত্তর তবু এলো,

"বাড়িতে ওর বড় ছেলে আছে। তাছাড়া স্বামীর কথাও তো ভাবতে হয়।"

মাথা হেঁট হয়ে যায় পণ্ডিতমশায়ের। ভাঙা গলায় বলে ফেলেন,

"তুমি একবারও ভাবছ না, ভাবো দেখি, দুবছর বয়সেই কিউবাও তার মা হারাবে!"

জপে ইতি ঘটে। গিন্নীর পরিষ্কার জবাব, "তার ভালমন্দ আমি দেখব। তাকে মানুষ করতে আমার একটুও কষ্ট হবে না। ভাবছো নাকি, আমি ওকে খুন করে ফেলবো?"

শেষ বাক্যের ঠেলায় পণ্ডিতমশায় জলদি স্থানত্যাগ করলেন। কিন্তু গিন্নীর গঞ্জনা তখনও চলছে,

"আমার জন্যই বাচ্চাটা জন্মেছে। ওটি আমারই। তোমার বংশে যদি পুরুষ-উত্তরাধিকারী না থাকে তাতে তো আমারও ক্ষতি। ডাইনী তোমাকে বশ করেছে। ভীমরতি আর কী! ক-বছরই বা তোমার

পটল তুলতে বাকী, ভেবেছো ? মেয়েটার ওপর তোমার লোভ এখনো যায় নি। সমাধির জায়গায় উটকো একটা মেয়ের স্মৃতিস্তম্ভ থাকবে—এ আমি হতে দেবো না !”

খিস্তির খরস্রোতে যেন ভাটার টান নেই। পণ্ডিতমশায় কিন্তু তখন এসব শুনেও শুনছেন না।

কিউবাও-এর ঘামাচি বেরিয়েছে কি অল্প জ্বর হয়েছে—গিন্নী তখনই ছোটেন বুদ্ধের মন্দিরে। সঙ্গে ওষুধ হিসেবে মন্ত্রপূত ছাই নিয়ে আসেন। ঘামাচিতে সেগুলো ঘসে দেন, নাহলে জলে গুলে খাইয়ে দেন। কেঁদে ওঠে বাচ্চা, কখনও জোরে ঘামতে থাকে। একটু অসুস্থতায় বাচ্চাকে নিয়ে এরকম হৈচৈ যুবতীর একদম পছন্দ হয় না। সে লুকিয়ে মন্ত্রপূত ছাই ফেলে দেয়। দীর্ঘশ্বাস ফেলে একদিন গিন্নী স্বামীকে জানান,

“জানো, আমাদের বাচ্চার জন্য তার কোন মায়া নেই। বলে কিনা বাচ্চার অসুখ নেই! প্রকৃত স্নেহে নাকি বাড়াবাড়ি থাকে না; আসলে আমাদের বাচ্চার জন্য ওর আদর ভান ছাড়া কিছু নয়।”

একলা থাকলে যুবতী কাঁদে, আর পণ্ডিতমশায় চুপ করে থাকেন।

কিউবাও-এর প্রথম জন্মদিন। সারাদিন ধরে উৎসব চলে। প্রায় চল্লিশজন অতিথি হাজির হন। বাচ্চার পোশাক, নুড্‌ল, সিংহ-লকেট, ঝোলানো রুপোর হার, দীর্ঘ আয়ুর দেবতার ছবি-আঁকা সোনার মূর্তি—এরকম হরেক রকম উপহার জমা পড়ে। সৌভাগ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে অতিথিরা কিউবাওকে আশীর্বাদ জানান। পড়ন্ত বেলায় সূর্যের আভায় পণ্ডিতমশায়ের মুখ যেন রাঙা হয়ে যায়। আসলে আনন্দে তিনি আত্মহারা!

ভর সন্ধ্যেয় ভোজপর্বের ঠিক পূর্বে উঠোনে এক অনাহূত অতিথি এসে পড়ে। সবার দৃষ্টি তার ওপর। শীর্ণকায় এক চাষী সে, ছেঁড়া কাপড়, মাথার চুল উস্কো-খুস্কো, হাতে একটি কাগজের বাণ্ডিল। তাজ্জব বনে যান পণ্ডিতমশায়। কাছে গিয়ে তার নামধাম ঠিকানা জানার চেষ্টা করেন। নবাগত যখন ভাঙাগলায় কিছু বলার চেষ্টা করছে,

পণ্ডিতমশাই বুঝে ফেলেন—আরে এ তো সেই চামড়ার-ব্যবসায়ী—যুবতীর স্বামী। মিহিসুরে পণ্ডিতমশাই বলেন,

"তুমি আবার এসব উপহার আনতে গেলে কেন? এগুলো এনে ভালো করোনি কিন্তু।"

ভয়ে ভয়ে নবাগত উত্তর দেয়, "না, মানে আমি···এই আসছি এখানে···তাই বাচ্চার দীর্ঘজীবন কামনা করে যাবো, এছাড়া···"

কথা অসমাপ্ত রেখেই সাততাড়াতাড়ি বাণ্ডিল খুলতে বসলো সে। বার করলো চারটে ব্রোঞ্জের চীনা অক্ষর, তার ওপর রুপোর পাত বসানো ছিল। উচ্চতায় সওয়া এক ইঞ্চির মতো হবে। চারটে অক্ষরের মানে দাঁড়ায় যে, বাচ্চাটা যেন দক্ষিণের পর্বতের মতো দীর্ঘজীবন পায়।

মঞ্চে গিন্নী প্রবেশ করলেন, চামড়ার ব্যবসায়ীকে দেখে অখুশী হয়েছিলেন তিনিও। টেবিলে যেখানে অতিথিরা নিজেদের মধ্যে আলাপ করছিলেন, পণ্ডিতমশায় সেখানেই চামড়ার ব্যবসায়ীকে নিয়ে গেলেন।

ঘণ্টাদুয়েকের পানাহারে সবকজন অতিথিকেই বেশ খুশী ও উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। নানারকম মাতলামিতে তাঁরা আসর সরগরম করে তুলেছিলেন। জম্পেস আড্ডার হট্টগোলে ঘর গমগম করছিল। চামড়ার ব্যবসায়ীর দিকে কারুরই তাকানোর ফুরসৎ নেই। দু-পেয়ালা মদ পান করে সে চুপচাপ বসে ছিল। মদ্যপান শেষে সকলে চটপট ভাত খেয়ে নিলেন। এরপর বিদায়ের পালা। হাতে লণ্ঠন নিয়ে দুজন বা তিনজন করে একসঙ্গে অতিথিরা জায়গা ছেড়ে চলে গেলেন।

যতক্ষণ না চাকরেরা টেবিল পরিষ্কার করতে এলো ততক্ষণ চামড়ার ব্যবসায়ী খাওয়ায় বিরাম দেয় নি। এরপর সে অন্ধকার বারান্দার এক কোণে গিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করলো।

"কেন এসেছো?" গভীর বিষাদে ভেঙে পড়ে যুবতী।

"আসতে চাই নি, তবে না এসেও পারলাম না।"

"এলেই যদি, এত দেরী করে এলে কেন?"

"জন্মদিনের উপহার কেনার জন্য টাকা সংগ্রহ করতে গিয়ে দেরী

হয়ে গেল। সারা সকাল ধারের জন্য ঢুঁড়ে বেড়ালাম, তারপর শহরে গিয়ে কিনতেও সময় লাগল। ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম, খিদেও পেয়েছিল। এসবের জন্য দেরী হয়ে গেল।"

"চুনবাও আছে কিরকম ?"

একটু ভেবে নিয়ে স্বামী উত্তর দিলো,

"চুনবাও-এর জন্যই তো আসা..."

"চুনবাও-এর জন্যে !" বৌ আঁতকে ওঠে।

"হুঁ, এবছর গরম পড়তেই সে একেবারে হাড় জিরজিরে হয়ে গেছে। গত শরতেই অসুস্থহয়ে পড়ে ছিল। টাকার অভাবে কিছু করা যায় নি। বাড়তে বাড়তে তাই এখন মারাত্মক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন চেষ্টা না করলে তাকে হয়তো বাঁচানো যাবে না।" একটু থেমে আবার শুরু করে,"তোমার কাছে কিছু টাকা ধার নেবো বলে এসেছি।"

যেন বুনো বেড়ালের দল যুবতীকে আঁচড়ে কামড়ে শেষ করে দিচ্ছে ; তার অন্তরের গভীরে প্রলয় ঝড়। কান্না উথলে আসছে, কিন্তু যখন কিউবাও-এর জন্মদিনে সবাই আনন্দমুখর, আবেগ সংযত করতে হয়। আপ্রাণ চেষ্টা করে সে নিজেকে সামলে নিল,

"আমি কোথায় টাকা পাব ? মাসে ২০ সেণ্ট হাত খরচা পাই, সবটাই তো আমার বাচ্চার জন্য খরচ হয়ে গেছে। কি করি এখন ?"

'দুজনেই নির্বাক, অবশেষে বৌ বলে,

"তুমি তো এখন এখানে, চুনবাওকে কে দেখবে ?"

"প্রতিবেশীদের একজনকে রাজী করিয়েছি। আজ রাতে ফিরে যেতেই হবে। সত্যি কথা বলতে কি এখনই বেরুনো উচিত ছিল।"

"দাঁড়াও, দেখি আমি তাঁর কাছ থেকে কিছু ধার পাই কি-না।" স্বামীকে রেখে বৌ চলে যায়।

দিন তিনেক পর হঠাৎ পণ্ডিতমশায় যুবতীকে জিগ্যেস করলেন,

"নীল জেডের একটা আংটি দিয়েছিলাম তোমাকে। দেখছি না তো ?"

"সেদিন রাতে তাকে দিয়েছি। বন্ধক আছে সেটা।"

"পাঁচ ডলার তোমাকে ধার দিই নি?" কঠিন স্বরে তিনি বললেন।

হেঁট হয়ে যায় যুবতী। তবু উত্তর দিতে হয়,

"পাঁচ ডলারে হোত না, তাই…"

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন পণ্ডিতমশায়, "যতই চেষ্টা করি না কেন, দেখছি আমাদের চেয়ে তোমার স্বামী আর বড়ছেলেকে তুমি এখনো বেশী ভালবাস। আরো কবছর তোমাকে রাখতে চেয়েছিলাম; এখন দেখছি সামনের বসন্তেই তোমাকে বিদায় দিতে হবে।"

যুবতীর চোখে জল নেই। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে সে।

কদিন পরেই আবার যুবতীকে তিনি ভৎ'সনা করেন, "নীল জেডের আংটি সাক্ষাৎ রত্ন। কিউবাও যাতে উত্তরাধিকারসূত্রে পায় তাই তোমাকে ওটা দিয়েছিলাম। ওটাকে তুমি বাঁধা দিতে পার, এ আমার কল্পনার বাইরে! ভাগ্যিস গিন্নী জানে না, নাহলে আগামী তিনমাস ধবে ঝড় বইতো।"

এইকাণ্ডের পর যুবতী আরও রোগা আর ফ্যাকাশে হয়ে গেল। চোখে আর সে দ্যুতি নেই; প্রায়ই বিদ্রূপ ও অভিশাপ জোটে তার কপালে। চুনবাও-এর অসুস্থতার কথা ভেবে সে সারা হয়। নিজেদের গাঁয়ের কোন লোক বা ঐ গাঁয়ে যাচ্ছে এমন কারুর খোঁজে থাকে সে। আশা করে, শীঘ্রই চুনবাও-এর সেরে ওঠার খবর আসবে। ইচ্ছে হয়, কয়েক ডলার ধার করে তার জন্য কিছু মিষ্টি কিনে পাঠায়। কিউবাওকে কোলে নিয়ে প্রায়ই সে ফটকের বাইরে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকে। এসব দেখে গিন্নী তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠেন,

"এবার পাখির মন উড়েছে। যেন বাড়ি ফিরতে পারলে বাঁচে।"

রাতে স্বপ্ন টুটে গেলে সে ধড়্মড়্ করে উঠে বসে। কিউবাও তখন কোলের কাছে ঘুমোচ্ছে। চীৎকারে কিউবাও-এর ঘুমও ভেঙে যায়। সে কাঁদতে থাকে। একদিন পণ্ডিতমশায় জানতে চাইলেন,

"আরে হোল কী? কী হচ্ছে বলো।"

উত্তর না দিয়ে সে বাচ্চাকে আদর করতে থাকে। পণ্ডিতমশায় থামেন না,

"তোমার বড়ছেলের মরার স্বপ্ন দেখছিলে নাকি? বাপস্ কি জোর চেঁচানি! আমার ঘুমটাও বরবাদ!"

চটপট সে উত্তর দেয়, "না, না···আমার সামনেই একটা কবর দেখলাম।"

কিছু আর বলেননি তিনি। দুঃস্বপ্ন নিশিদিন তার সঙ্গী এখন। এখন সে নিজেই-কবরের দিকে চলেছে।

শীতও প্রায় শেষ হয়ে এল, জানালায় পাখিরা কিচিরমিচির করছে, যেন এখান থেকে চলে যাওয়ার ইঙ্গিত করছে। বাচ্চার কাছে থেকে তাকে চলে যেতে হবে—এ যাওয়া চিরদিনের জন্য।

যাওয়ার দিন রাঁধুনী মেয়েটি গিন্নীর কাছে জানতে চায়,

"বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার জন্য কি পালকি-চেয়ারের ব্যবস্থা করবো?"

জপমালা হাতে নিয়ে গিন্নী বলেন, "না, হেঁটেই যেতে দাও। নাহলে ভাড়া তো ওকে গুনতে হবে। কোথায় পাবে টাকা? পেট ভরে দুবেলা খেতে দিতে পারে না যার স্বামী তার এত বাবুয়ানি ভালো নয়। আর যাবে তো মোটে তিরিশ লি, এক দিনে আমিই তো একবার চল্লিশ লি হেঁটেছিলাম। আমার চেয়ে ও ভালো হাঁটতে পারে, আধ-বেলায় পৌঁছে যাবে।"

কিউবাওকে সাজিয়ে দেওয়ার সময় যুবতী কাঁদতেই লাগল। বাচ্চা 'মাসী, মাসী' বলে চেঁচায় তাকে মা আর আসল মাকে 'মাসী' বলে ডাকতে শিখিয়েছিলেন গিন্নী। কান্নার তোড়ে যুবতী কথা বলতে পারে না। অথচ সে বলতে চায়,

"সোনা আমার, তোমাকে ছেড়ে যাচ্ছি। তোমার 'মা' খুব আদর করবেন তোমাকে, তাঁর সঙ্গে মানিয়ে চলবে। আমার কথা একদম ভুলে যাও।" কথাগুলি বলা হোল না। বাচ্চাটিতো মাত্র দেড়বছরের, বললেই বা বুঝবে কি করে।

যুবতীর পেছনে পণ্ডিতমশায় নিঃশব্দে এসে দাঁড়ালেন। তার হাতে দশটা কুড়ি সেণ্টের রুপোর টাকা দিয়ে বললেন,

"এই নাও তু-ডলার। এটা তোমার।"

বাচ্চার জামার বোতাম আটকে নিজের পকেটে সে টাকাগুলি রাখে।

গিন্নীও আসেন। অপসৃয়মাণ পণ্ডিতের দিকে তাকিয়েই ঘুরে দাঁড়ান যুবতীর সামনে,

"যাওয়ার সময় কাঁদতে পারে। আগেভাগেই কিউবাওকে দিয়ে দাও।"

যুবতী চুপ করে থাকে, বাচ্চাটি কিন্তু মাকে ছাড়তে চায় না। নরম নরম হাত দিয়ে গিন্নীর মুখে থাপ্পড় মারে। গিন্নী চটে যান, "ছেলেকে রাখো, প্রাতরাশ অবধি রাখতে পার।"

রান্নার মেয়েটি যতটা সম্ভব বেশী করে খেয়ে নেওয়ার পরামর্শ দেয় যুবতীকে,

"অনেকদিন ধরেই তো খাচ্ছেন না কিছু। যখন আসেন তখন বেশ ছিলেন। আর এখন। একেবারে রোগা হয়ে গেছেন। আয়নায় যদি নিজের চেহারা দেখতেন—! আজই তিরিশ লি হাঁটতে হবে, সেজন্য বলছিলাম কি, ভাতগুলো ফেলবেন না। সবটা খেয়ে নিন।"

যুবতী আবেগভরে বলে, "সত্যিই তুমি বড় দয়ালু!"

দিনটি ছিল চমৎকার। সূর্য অনেকটা ওপরে উঠেছে। মাকে ছাড়ে না কিউবাও। গিন্নী যখন জোর করে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেলেন, সে প্রাণপণে চেঁচাচ্ছিল, বৃদ্ধার পেটে লাথি মারছিল, চুলগুলি খিমচে ধরছিল। বিনীতভাবে যুবতী আবেদন জানায়,

"তাহলে দুপুরের খাওয়া অবধি বরং থেকে যাই।"

হিংস্রভাবে গিন্নীর আদেশ এলো,

"সব গুছিয়ে নিয়ে ফোট। আজ হোক বা কাল হোক যেতে যখন হচ্ছেই···।"

কিউবাও-এর কান্নার রেশ ক্রমশঃ অস্পষ্ট হয়ে এল।

গোছানোর ফাঁকে ফাঁকে যুবতী কান খাড়া করে কান্নার শব্দ

শুনছিল। পাশে দাঁড়িয়ে রাঁধুনী মেয়েটি তাকে আশ্বস্ত করে ; আসলে নজর রাখে, থলেতে কী জিনিস পোরা হচ্ছে। যে পুরোনো থলে নিয়ে সে এখানে এসেছিল সেটাই সে ফেরৎ নিয়ে যাচ্ছে।

ফটকের বাইরে থেকেও কিউবাও-এর চীৎকার শোনা যায়। তিন লি পথ যাওয়ার পরও কিউবাও-এর কান্নার রেশ তার কানে লেগে থাকে।

সামনে গাঁয়ের রাস্তা। এর শেষ নেই, যেমন অনন্ত আকাশের সীমারেখা নেই। নদীর পাড় দিয়ে সে হাঁটে। আয়নার মতো নদীর জলে তার ছায়া পড়ে। থেমে যাবে না-কি। আত্মহত্যার প্রবল চিন্তা হয়ে ওঠে। নদীর পাড়ে কিছুক্ষণ বসে আবার হাঁটতে শুরু করে।

সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসে, এক বয়স্ক গ্রামবাসীর কাছে জানতে পারে এখনও পনেরো লি রাস্তা হাঁটতে হবে। লোকটির কাছে মিনতি জানায়,

"দাদু, একটা খচ্চর ভাড়া করে দিন। আর হাঁটতে পারি না।"

"কোত্থেকে আসছো, মা ?"

"বাড়ি ফিরছি ; সকালে ভেবেছিলাম সবটা পথই হাঁটতে পারব।"

বৃদ্ধলোকটির করুণা হোল। তিনি একটা খচ্চর ভাড়া করে দিলেন।

রাতের মুখে নোংরা সরু গ্রাম্য গলিপথে খচ্চর পৌঁছে যায়। যুবতীর গাল বসে গেছে, ঝরে পড়া পাতার মতো হলদে তার গায়ের রঙ। চোখ বন্ধ। অতিকষ্টে নিশ্বাস নিচ্ছে। গ্রামবাসীরা বিস্মিত। তারা সহানুভূতি জানায়। খচ্চরের আগমনে গাঁয়ে সাড়া পড়ে গেছে। একদঙ্গল বাচ্চা সেটার পেছনে লেগে গেছে।

খচ্চরের অনুসরণকারী বাচ্চাদের মধ্যে চুনবাও-ও আছে। চুনবাও-এর বাড়ির দিকে যেই না খচ্চরটা ঘুরেছে অমনি বাচ্চাগুলো শূয়োর ছানার মতো চীৎকার করে পাড়া মাতিয়ে দেয়। চুনবাও বিস্ময়ে থমকে যায়। তার ঘরের সামনে যখন খচ্চরটা থামে, দূর থেকে সে তা দেখে

যায়। অন্য বাচ্চাগুলো সন্ত্রস্ত। খচ্চর থেকে নামার পর যুবতীর মাথা ঘোরে। সে উত্তেজিত। সামনেই দাঁড়ানো উস্কুখুস্কো চুলওয়ালা ছেলেটিই যে চুনবাও—এটি তার মাথায় আসে না। আগের মতোই সে বেঁটে। একরত্তি বাড়েনি। ঠিক তিনবছর আগের দিনের মতো এখনও সে অস্থিচর্মসার। যুবতী কেঁদে চেঁচিয়ে উঠল,

"চুনবাও !"

ভয়ে ছেলেরা পালিয়ে যায়। চুনবাও-ও ভয় পেয়েছে, বাবার খোঁজে সে ঘরের মধ্যে দৌড়ে পালায়।

অনেক, অনেকক্ষণ ধরে ভ্যাপসা ঘরের মধ্যে যুবতী বসেই থাকে। স্বামী আর সে বাক্যহারা। রাত যখন বাড়ে, স্বামী মাথা তুললো,

"এখন বরং রান্নাটা সেরে ফেল।"

অতিকষ্টে উঠে চারপাশ খুঁজে বেড়াল "কৈ, বড় জালায় তো চাল নেই···"

অসুস্থ হাসি নিয়ে তার স্বামী জানায়,

"বড় লোকের ঘরে থেকে তোমার অভ্যাস অন্যরকম হয়ে গেছে। আমরা তো কাগজের বাক্সে চাল রাখি।"

ঐ রাতে বাবা তার ছেলেকে বলে, "চুনবাও, মার সঙ্গে তুমি আজ ঘুমোবে ?"

উনুনের পাশে দাঁড়িয়ে চুনবাও কাঁদতে শুরু করে। মা কাছে গিয়ে ডাকতে থাকে,

"চুনবাও, চুনবাও !" যখন সে আদর করতে যায়, চুনবাও পাশ ফিরে শুয়ে পড়ে। বাবা ধমক দেয়,

"মাকে ভুলে গেছো। বেদম মারের দরকার !"

সরু, নোংরা কাঠের তক্তার বিছানায় যুবতী সারা রাত জেগে থাকে। পাশে অপরিচিতের মতো চুনবাও ঘুমিয়ে আছে। ঘুমঘোরে ছোট ছেলেকে দেখতে পায়—মোটাসোটা, সাদা আর কি সুন্দর হয়েছে কিউবাও। কিউবাও যেন তার পাশেই ঘুমিয়ে আছে। ঘুমের মধ্যে কিউবাওকে সে আদর করতে যায়, চুনবাওর গায়ে হাত লাগে। চুনবাও

সবে ঘুমিয়েছে। চুনবাও আস্তে আস্তে নিশ্বাস নিচ্ছে, তার বুকে চুনবাওর মুখ। সজোরে তাকে জড়িয়ে ধরে মা।

নিঝুম রাত যেন অনন্তকালের দিকে যাত্রা করে···

অনুবাদ : সুব্রত পাণ্ডা

মেঙ্ সিয়াঙ্ গিঙের প্রতিষ্ঠা লাভ

লেখক চ্যাও শু লি। ১৯০৩ (মতান্তরে ১৯০৫)-এ স্যান্সিতে জন্ম। পেশা শিক্ষকতা ও সাংবাদিকতা। কিছুকাল লোকসংগীত ও গাথা কাব্যরীতি আয়ত্ত করার চেষ্টা করেন। বক্ষ্যমাণ গল্পটিকে তাঁর সর্বাধিক পরিচিত বা শ্রেষ্ঠ—কোনটাই বলা যাবে না। গ্রাম্য নারীর রাজ-নীতিতে অংশগ্রহণ—এই চিরন্তন সমস্যাটি জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে এই গল্পে। এতে আছে সত্যিকারের এক মহিলার জীবন-কথা। ভাষা-প্রয়োগে লেখক পুরনো ঐতিহ্যবাহী গল্পকারদের অনুসরণ করেছেন, পাশ্চাত্ত্য-ভাবপুষ্ট কথাশিল্পী-দের নয়। কারো কারো মতে মাও-সে-তুং সৎ-সাহিত্যে বা শিল্পতত্ত্বের যে গুণগুলোর উল্লেখ করেছেন, তারই মূর্ত প্রতীক হলো বর্তমান লেখক।



চ্যাও শু লি

১, প্রাচীন রীতি ও নববিধান

কিংজ্যাং নদীর পাশে সেহ্সিয়ান প্রদেশের দক্ষিণ পূর্ব কোণে অবস্থিত সিয়াওকৌ একটি ছোট্ট গ্রাম। এখানকার সবচেয়ে অধিক প্রচলিত পদবী হল নিউ। আরো মাইলখানেক দক্ষিণে ডিংইয়ান্ গ্রামে প্রধান পদবী হল মেঙ্। এই নিউ ও মেঙ্ হল দুই বড় গোষ্ঠী। আর বহু পুরুষ ধরে এদের মধ্যে চালু রয়েছে বৈবাহিক সম্বন্ধ। প্রাচীনকালে যখন স্ত্রীলোকদের মধ্যে ব্যক্তিগত নাম ধরে ডাকার রেওয়াজ ছিল না, তখন ঐরকম পদবীযুক্ত একজন বিশেষ স্ত্রীলোক পাওয়া বেশ কঠিন ছিল, কারণ তখন মেঙ্ পরিবার থেকে আসা শ্রীমতী সিউ বা নিউ পরিবার থেকে আসা শ্রীমতী সেঙ্ ইত্যাদি নামে পরিচিত মহিলার অভাব ছিল না। মেঙ্ সিয়াঙ্গিঙের বাড়ি ডিংইয়াঙে। কিন্তু বিয়ে হয়েছিল এই সিয়াওকৌ গ্রামে। সে নিজে কিন্তু ছিল মেঙ্ পরিবারস্থ শ্রীমতী নিউ।

বহু পুরুষ ধরে দুটো গোষ্ঠী বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ। কিন্তু সেজন্য যে প্রত্যেক দম্পতি-ই সুখী—এমন ভাবার কোন হেতু নেই। বরং বলা যেতে পারে, উল্টোটাই সত্য। এটা একটা বন্য পার্বত্য দেশ। যেমন পূর্বে লোক বলত, 'পর্বত উঁচু এবং সম্রাট অনেক দূরে।' একথাটাকেই নতুন করে বলা চলে, পর্বত উঁচু এবং সরকার অনেক দূরে। এখান থেকে সরকারী জেলা অফিস পনের মাইল দূরে। এই কারণে কিং বংশের রাজত্বকালের শেষ বৎসরগুলো থেকে আজ পর্যন্ত এখানকার রীতিনীতি বিশেষ পাল্টায় নি। মহিলাদের ক্ষেত্রে পুরনো নিয়মগুলো এখনো খাটে—ঘরের বউ হিসেবে একজনকে সহ্য করতে হবে প্রহার ও গালাগালি। কিন্তু একবার শাশুড়ী হয়ে গেলে সে-ই আবার বউকে প্রহার ও অভিশাপ দিতে পারবে। তা না করলে শাশুড়ী হিসেবে ঠাঁট বজায় রাখা যায় না। স্ত্রীদের প্রতি স্বামীদের দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে প্রাচীন নিয়ম বলে—'বিবাহিত স্ত্রী হল গিয়ে টাকা দিয়ে কেনা ঘোড়ার মত—ইচ্ছে করলে তার ওপর চড়া যায়, দরকার হলে মারাও যায়।' পুরুষ যদি তার স্ত্রীকে না ঠ্যাঙ্গায় তাহলে বুঝতে হবে সে তাকে ভয় পায়।

প্রচলিত বিধি মেনে চলা ছাড়াওমেঙ্ সিয়াঙ্গিঙের শাশুড়ীর নিজস্ব একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। সেটা হল তার ক্ষুরধার রসনা। যৌবনকালে বাড়ির বাইরে তার অনেক বন্ধু জুটেছিল। তার স্বামী সেটা পছন্দ করত না বটে, কিন্তু ঝগড়া করারও সাহস পেত না—কারণ যুক্তিতর্কই হোক আর কটূক্তির প্রতিযোগিতাই হোক দু-বিষয়েই সে স্বামীকে হারিয়ে দিতে পারত। যদি স্বামীই ভয়ে থরহরিকম্প হয় তবে পুত্রবধূর যে কি হাল হবে তা সহজেই অনুমেয়।

প্রাচীন গ্রামীণ আইনকানুন ও শাশুড়ীর কঠোর শাসন মেনে চলা মেঙ্ সিয়াঙ্গিঙের পক্ষে দুঃসহ ছিল। তার অবস্থা আরো করুণ করে তুলেছিল তার জীবনের পশ্চাৎ পট। প্রথমেই বলতে হয়, তার নিজের পরিবারে এমন কেউ ছিল না যে তাকে আশ্রয় দেবে। যখন তার পিতামাতা মারা যান, তখন তার বয়স আট বছর এবং সঙ্গে বার বছরের

দিদি ও একটি শিশু ভাই। পরে তার বোনেরও এই সিয়াওকৌ গ্রামে বিয়ে হয়। কিন্তু তার নিজের ও বোনের শ্বশুর-কুলের মধ্যে সম্পর্ক ভালো না থাকায় তার দিদি তার বিয়েতেও আসতে পারে নি। ফলে কনের পাল্‌কিতে নিজেই নিজেকে বিদায় জানায়। এরকম পরিবার থেকে আসার দরুন প্রহারকালে তার পক্ষে কিছু বলার মত কেউ ছিল না।

দ্বিতীয়তঃ, সে এক নিঃস্ব পরিবার থেকে এসেছে।

তৃতীয়তঃ, সে খুব অল্প বয়সে মাকে হারায়, তাই সূচীকার্যে দক্ষতা অর্জন করতে পারে নি।

চতুর্থতঃ, তার পা স্বাভাবিক ভাবেই বেড়ে উঠেছে। সেখানে স্বাভাবিক পায়ের প্রচলন, সেখানে যেমন সংকুচিত পায়ের মেয়েরা বেমানান, ঠিক তেমনি বিসদৃশ এই এলাকার স্বাভাবিক পদবিশিষ্ট মেয়েরা!

পরিশেষে যে শৈশব থেকে গৃহস্থালির কাজ করে এসেছে তার পক্ষে শাশুড়ীর যথেচ্ছ খবরদারী সহ্য করা কঠিন ছিল; বধূকে প্রহার ও গালাগালি করার পক্ষে শাশুড়ীর এই সব কারণই ছিল যথেষ্ট।

২. যার কাঁদাও বারণ

যার প্রতি নির্দয়ভাবে অন্যায় ব্যবহার করা হয় অথচ যার কোন প্রতিবাদের পথ থাকে না, এরকম লোক না কেঁদে পারে না। কিন্তু মেঙ্‌ সিয়াঙ্‌গিঙের সেরকম সুযোগও বড়ো একটা হত না। পিতামাতা জীবিত থাকলে সে তাদের বাড়ি গিয়ে কাঁদতে পারত। যেহেতু সেখানে মাত্র দশ বছরের ভাই রয়েছে, সে গিয়ে তার ভাইয়ের কাঁধে মাথা রেখে কাঁদতে তো পারতোই না, এবং যখন কান্না পেত তখনও তার ভাইয়ের দেখাশোনা করতে যেতে হত। স্বামীর সঙ্গে তার সম্পর্ক ভালো থাকলে কখনো শাশুড়ী খারাপ ব্যবহার করলে সে রাতে গিয়ে তার কাছে বসে দুফোঁটা চোখের জল ফেলতে পারত। কিন্তু এই স্বামীই মার আদেশ পেয়ে তাকে ঠ্যাঙাত। সুতরাং তার কাছে কাঁদতে যাওয়া মানে আর এক দফা ধোলাইয়ের সম্মুখীন হওয়া। অবশ্য মেঙ্‌ সিয়াঙ্‌গিঙের দু-একজন ছিল যাদের কাছে সে অসুবিধার কথা খুলে

বলতে পারত। তার দিদি ছিল নিকট প্রতিবেশী এবং দেখাসাক্ষাৎ হলেই সে কেঁদে প্রাণ জুড়াতে পারত। পাশের বাড়িতে চ্যাংঝেন্ নামে এক তরুণী বউ থাকত। তাকেও মেঙ্ সিয়াঙ্গিঙের মত শাশুড়ীর গঞ্জনা ও প্রহার সইতে হত। দুজনে কণ্ঠলগ্ন হয়ে প্রাণ খুলে কাঁদতে পারত। এছাড়া কাঁদত যখন সে ঘরে-তৈরী-কাগজ শুকোবার জন্য দেওয়ালে টানিয়ে দিতে আসত। এই কাগজ-শুকোবার-দেওয়ালের পাশেই চলত সবচেয়ে বেশী কান্না। তুলোর কুর্তার ভাঁজ করা অংশ দিয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে সেগুলো ভিজে জবজবে হয়ে যেত।

একবার কাঁদতে গিয়ে সে বিপদ ডেকে এনেছিল। কিছু জোয়ার ভাঙানোর জন্য সে গাধাটাকে জুড়ে ছিল বেলন-চাকিতে। হাতা দিয়ে দানাশস্য যথাস্থানে ফেলতে ফেলতে সে হঠাৎ ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। ঐ অবস্থায় দেখা হয়ে গেল খুড়শ্বশুরের সঙ্গে। সে কারণ জানতে চাইলে মেঙ্ তার শাশুড়ী সম্বন্ধে কিছু বিরূপ মন্তব্য করে বসে। দুর্ভাগ্যক্রমে সেই সময় শাশুড়ী ঠাকরুণ স্বয়ং এসে হাজির। সে যে দূর থেকে সব শুনেছে ভদ্রলোকের তা বুঝতে বাকী থাকে না। সম্পর্কে সে ভাসুর হওয়ায় শাশুড়ীর মুখের ওপরেই তিনি সমালোচনা করার একটা বাড়তি সুযোগ পেয়ে যান। পাছে তার যৌবনের কুকর্মের কথা সব ফাঁস হয়ে যায় সেই ভয়ে শাশুড়ী সোজাসুজি কোন উত্তর না দিয়ে প্রসঙ্গ পাল্টে ফেলে।

বাইরের কেউ, বিশেষ করে অন্যান্য বিবাহিত মহিলাদের সঙ্গে বউ কথা বলুক এটা শাশুড়ীর মোটেই অভিপ্রেত নয়। তার নিজের অভিজ্ঞতার সূত্রে সে জেনেছে যে যখনই কয়েকজন অল্পবয়স্কা বউ একত্র হয় তখনই তারা শাশুড়ীদের দোষ ত্রুটি তুলনায় মুখর হয়ে ওঠে। ফলে মেঙ্ সিয়াঙ্গিঙকে পাশের বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে দেখলেই তাতে সে অন্যায় আচরণের গন্ধ পেত। প্রহার ও গালিবর্ষণের সুযোগও মিলে যেত।

পারিং এবার অবিশ্যি মেঙ্ সিয়াঙ্গিঙ্ একটি পুরুষের সঙ্গে কথা পিতাম্বছিল। তবুও সে নিজের কানে শুনেছে সে শাশুড়ীর সমালোচনা

করছে। সে ভাবল : "এভাবে সে নিশ্চয় আমার সম্বন্ধে নিত্য বাইরে নোংরা ছড়াচ্ছে। ওকে একটা শিক্ষা দিতে হবে।" পুরোনো প্রথা অনুসারে শাশুড়ী যদি পুত্রবধূর দোষ ধরতে চায় তবে তাকে ঘুরন্ত জাঁতা-কলের চতুর্দিকে চলমান গাধার মত ত্রুটিহীন হতে হবে। একটি পদক্ষেপও ভুল করা চলবে না। সেদিন হয়েছে কি,মেঙ্ সিয়াঙ্গিঙ অসাবধানতাবশতঃ জাঁতা-কলের একটা ব্রাশ-হাতল চুরমার করে দিয়েছে। তার শাশুড়ীও এটাকে ছুতো করে মেঙের পিতামাতাকে অপমান করল। ঘটনাটা এত অশোভন হলযে মেঙ্ সিয়াঙ্গিঙ আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারল না।

"থামুন মা, আমি আপনার জন্য আবার ওটা বেঁধে দেব।"

'তোমার মারটা বাঁধ গে--' তার শাশুড়ী উত্তর দিল।

"আমার বোন এটার বদলে আমাকে একটা নতুন ধার দেবে।"

"তোমার মারটা পাল্টাও গে........।"

সারালেও হবে না, পাল্টে দিলেও হবে না এবং সর্বোপরি তাকে এসব গালাগালি শুনতে হবে। মেঙ্ সিয়াঙ্গিঙ এখন এত চটে গেল যে হঠাৎ তার বলার সাহস হল : 'আমার নিজের মা বহুদিন মারা গেছেন। আপনিই এখন আমার মা। আর আপনি নিজেকেই অভিশাপ দিচ্ছেন মা।'

"—তোমার মা।"

"মা।"

"—তোমার মা।"

"মা! মা! মা!"

শাশুড়ী অভিশাপ দেওয়া থেকে বিরত হল। পুত্রবধূর মধ্যে নিজের প্রতিদ্বন্দ্বীর সন্ধান পেয়ে শাপ-শাপান্ত করাটা আর তার কাছে প্রীতিদায়ক হল না। "ও যে দেখছি আমার চেয়েও ক্ষুরধার রসনা শানাচ্ছে"—সে ভাবল। "ওকে জব্দ করার জন্য অন্য উপায় বের করতে হবে দেখছি।" পরে অবিশ্যি সে তার পদ্ধতি পাল্টে ফেলে।

৩. মরণেও বাধা

একদিন মেঙ্ সিয়াঙ্গিঙ তার শাশুড়ীর কাছে তার স্বামীর কাপড়

তালি দেওয়ার ন্যাকড়া চাইলে সে তাকে শ্বশুরের কাছে যেতে বলল। পুরোনো নিয়ম অনুসারে শ্বশুরের কাছে তালির কাপড় চাওয়া যায় না। এই যুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে সে শাশুড়ীর সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিল। ফলে তার যুক্তি আর ধোপে টিকল না। ফলে রেগে গিয়ে সে গালি পাড়তে শুরু করল। মেঙের 'যুদ্ধং দেহি' ভাব ও অভ্রান্ত যুক্তি দেখে শাশুড়ী বুঝতে পেরেছিল যে বাক্‌যুদ্ধে তার জেতার আশা কম। তাই সে ছুটল মাঠের দিকে। উদ্দেশ্য ছেলেকে ডাকা।

"মেইনি (এটাই ছিল মেঙের স্বামীর নাম), এক্ষুনি চলে আয়। তোর সেই তরুণী বউয়ের সঙ্গে আদৌ পেরে উঠছি না। সে আমায় জ্যান্ত খেয়ে ফেলতে চায়।"

মা পারল না তরুণী বউকে সামলাতে। তাই ছেলেকে ছোট কর্তা হিসেবে প্রভুত্ব ফলাতে হল। এসে পৌঁছুনোমাত্র সে শক্তহাতে একটা লাঠি নিয়ে মেঙ্‌ সিয়াঙ্‌গিঙের দিকে তেড়ে গেল। পুরোনো নিয়ম অনুসারে কেন বা কি হয়েছে ইত্যাদি প্রশ্ন করার প্রয়োজনীয়তা নেই। কিন্তু মেইনির নিজের কর্তৃত্ব বলতে কিছুই ছিল না। সে ষোল বছরের এক বালক, স্ত্রীর থেকেও একবছর ছোট। মেঙ্‌ সিয়াঙ্‌গিঙ-ও তার হাত থেকে লাঠি কেড়ে নিল।

এতেই আসল গণ্ডগোলের সূত্রপাত হল। পুরোনো নিয়ম অনুসারে কোন স্বামী স্ত্রীকে প্রহার করলে কয়েক ঘা খেয়ে তার পালিয়ে যাওয়ার কথা। এরপর কেউ তার হাত থেকে লাঠি কেড়ে নেবে এবং এখানেই সমস্ত ব্যাপারটার ইতি। মেঙ্‌ সিয়াঙ্‌গিঙ যে মার খেয়ে পালায় নি শুধু তাই নয়, সে তাকে নিরস্ত্রও করেছে। ফলে তার স্বামী দারুণ অপমানিত বোধ করল। রাগে সে একটা কাস্তে তুলে নিয়ে মেঙের কপালে মারল এক ঘা—যার ফলে সৃষ্টি হল একটা রক্তাক্ত ক্ষত। কাস্তেটা টেনে বের করার পরও সেই ক্ষত থেকে গলগল করে রক্ত ঝরতে লাগল।

যারা কলহ থামিয়ে দিয়েছিল তাদের মতে মেইনি অন্যায় করেছে। প্রায় সাবই বলল, যদি তাকে আঘাতই করতে হয় তবে মাথা বাঁচিয়ে

দেহের অন্য জায়গায় করা উচিত ছিল। তাদের বক্তব্য—সে অবৈধ স্থানে আঘাত করেছে। পুরোনো নিয়মানুসারে কোন লোকের তার স্ত্রীকে মারার কারণ জানার দরকার নেই।

লড়াই শেষ হলে সবাই চলে গেল। ভাবখানা এই—যেন এ-ব্যাপারে তাদের কিছু করার নেই। একমাত্র যে বিষয়টাকে হাল্কা-ভাবে উড়িয়ে দিতে পারল না, সে হল, মেঙ্ সিয়াঙ্গিঙ স্বয়ং। সম্পূর্ণ ঠিক পথে থাকা সত্ত্বেও তার মাথা ফেটে রক্তারক্তি। তার পক্ষে তুটো হক কথাও কেউ বলে নি। তাহলে দাঁড়াচ্ছে এই যে যখনই ইচ্ছে হবে তখনই তার স্বামী তাকে তু-ঘা বসিয়ে দেবে। কোন বাধাই মানবে না। এই রকম কি চিরকাল চলবে? এ বিষয়ে সে যতই চিন্তা করল ততই অসহায় বোধ করতে লাগল। অবশেষে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়ে সে কিছু আফিং গিলে ফেলল।

আফিঙের পরিমাণ বেশী না হওয়ায় সে মরল না। তবে অত্যধিক বমি করতে শুরু করল। তার আত্মীয়-পরিজন ব্যাপারটা জানতে পেরে কিছু চিরুনী-ধোওয়া নোংরা জল তার গলায় ঢেলে দিল। তা আফিং ও বমির সঙ্গে বেরিয়ে গেল।

শাশুড়ী বলল: "তুমি যদি আফিং খেতে চাও তবে তো খুব ভালো কথা। আমার এক বয়েম-ভর্তি আফিং আছে। আমার ইচ্ছে সবটুকুই গিলে ফেল।"

মেঙ্ সিয়াঙ্গিঙ তা করতে পারলে সুখীই হত। কিন্তু তা আর শাশুড়ী দেয় নি।

অন্য একদিনের কথা। ক্ষেতের কাজ সেরে ফিরতে মেঙ্ সিয়াঙ্গিঙের সন্ধ্যা হয়ে গেল। তাই তার শাশুড়ী তাকে খেতে দিল না, স্বামীও ঘরে ঢুকতে দিল না। শাশুড়ীর ও স্বামীর ঘরের দরজা, এমনকি উঠানের ফটকও বন্ধ করে দেওয়া হল। উঠানে দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য হল সে। তাকে দেখতে এল তার বোন ও স্যাংজেন্ নামে প্রতিবেশিনী এক বিবাহিতা তরুণী। উঠানের ফটকের ওপাশ থেকে তারা ফিস্‌ফিস্ করে কয়েকটা কথা বলল। ফটক খোলার সাহসও তার ছিল

না। ফটকের একদিকে দাঁড়িয়ে তার বোন ও স্যাংজেন্ নীরবে কাঁদছিল, যেমন অন্যপ্রান্তে শান্তভাবে কাঁদছিল মেঙ্ সিয়াঙ্গিঙ। পরে সে পৈঠার নীচে বসে পড়ল ও কেঁদে কেঁদে একসময় ঘুমিয়েও গেল। যখন জেগে উঠল, তখনও তার শাশুড়ী ও স্বামী গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। শান্ত, নিস্তব্ধ উঠান। তারায় তারায় ঝল্‌মলে আকাশ। আর তার কাপড়-চোপড় ভিজে জব্‌জবে।

পরদিন সকাল বা দুপুরেও তার খাওয়া জুটল না। এভাবে বাঁচা যাবে না—এটা বুঝতে পেরে সে তার ঘরে গিয়ে গলায় দড়ি দিল। তার স্বামী তখন মার ঘরে দিবানিদ্রা সারছে।

প্রতিবেশিনী স্যাংজেন্ আবার তাকে দেখতে এল। মেঙের শ্বশুর, শাশুড়ী ও স্বামীকে নিদ্রিত দেখে সে ভাবল—'কথা বলার এই বেশ সুযোগ।' সে ঘরে ঢুকে মেঙ্ সিয়াঙ্গিঙকে কড়িবরগা থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখে এত ভয় পেয়ে গেল যে চীৎকার করে বেরিয়ে এল। চীৎকারে আকৃষ্ট হয়ে এক দল লোক সাহায্যার্থে ছুটে এল। তার মধ্যে মেঙের বোনও ছিল। তাকে বাহুর মধ্যে নিয়ে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

মেঙকে বাঁচানোর বিস্তর চেষ্টা চলল। অবশেষে সে চোখ মেলল; দেখল যে সে তার বোনের বাহুলগ্ন হয়ে আছে। বোন এদিকে কেঁদে ভাসাচ্ছে।

আত্মহত্যার দুটো চেষ্টাই ব্যর্থ হল। সে আগের মতই দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে লাগল আবার।

৪. কি করে গ্রামের কর্মী হল

১৯৪২ সালে একজন দলের কর্মী এল জিয়াওকৌতে পঞ্চম উপ-এলাকা থেকে। যখন সে গ্রামবাসীদের মহিলাদের জাতীয় রক্ষী-বাহিনীর জন্য একজন নেত্রী নির্বাচন করতে বলল, তারা মেঙের নাম প্রস্তাব করল। তারা বলল: ও দুটো কথা বলতে পারে। এর মানে হল ওর ন্যায় ও সত্যের ওপর রয়েছে অসম্ভব দখল। কিন্তু তার

শাশুড়ীর কাছে এ প্রস্তাব পেশ করার সাহস কারোর ছিল না। শেষে কর্মী নিজেই বলল : আমিই যাব। কিন্তু এ কাজে সে কিছু বাধা পেল। মেঙ্ সিয়াঙ্গিঙের শাশুড়ী বলল : 'এটা ওর কম্ম নয়। ও হল গিয়ে একটা ব্যর্থ আত্মঘাতী। ও তালই সামলাতে পারবে না।' কর্মী যে যুক্তিই দাঁড় করায় তার উত্তরে শাশুড়ী শুধু বলে : 'ও এঁটে উঠতে পারবে না।' মেঙের দলনেত্রী হওয়ার পথে বৃদ্ধা এত জেদের সঙ্গে বাধা দিচ্ছে কেন? এর পেছনে নট্‌কোয়াইট্ নিউর (ভূতপূর্ব শত্রুর গুপ্তচর; এখন অবশ্য আমাদের দলে যোগদান করেছে। তারা একে নট্‌কোয়াইট্ বলে, কারণ এখনও তার সম্পূর্ণরূপে চরিত্র-সংশোধন ঘটে নি।) নিশ্চয় কোনো ভূমিকা আছে।

গোলযোগ-সৃষ্টিতে সিদ্ধহস্ত সেই জু হুয়াইবিঙেব (একজন কুয়ো-মিংটাং সেনাধ্যক্ষ) ফৌজ যখন এই এলাকায় মোতায়েন করা হয়।' তখন নট্‌কোয়াইট্ নিউ ছিল গ্রামের একজন হোমড়া-চোমড়া লোক। পরে জু হুয়াইবিঙের পতন হলে সে স্থানীয় নিরাপত্তা বাহিনীর প্রধান শত্রুর দলে যোগ দেয়। তখন নট্‌কোয়াইট্ তার সঙ্গে শত্রু-এলাকায় দু'একবার সংযোগস্থাপন করে। তারপর, যখন চল্লিশতম সৈন্যবাহিনী সিন্‌সিয়ান্ প্রদেশে মোতায়েন করা হয়,নট্‌কোয়াইট্ নিউ তাদের সঙ্গেও সদ্ভাব রক্ষা করে চলে। খরগোসের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলতেও তার বাঁধে না, আবার শিকারী কুকুরের সঙ্গে শিকার করতেও সে ছাড়ে না। মেঙ্ সিয়াঙ্গিঙের শ্বশুরকুলের সঙ্গে ছিল তার ভারি দহরম-মহরম। যখন কাগজ তৈরীর ব্যবসায় মেঙের শ্বশুর নিউ মিংশী ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে তখন ও সমস্ত জমিজমা অন্য কারো কাছে বন্ধক রাখতে বাধ্য হয়, নট্‌কোয়াইট্ তাকে এক একর ইজারা দেয়। ছোট বয়সে মেঙ্ সিয়াঙ্গিঙের শাশুড়ীর মত নট্‌কোয়াইট্ নিউর স্ত্রীও খুব মিশুকে ছিল। পরস্পারের মাধ্যমে এরা নানা বন্ধুর সংস্পর্শে আসে। দুজনে বহুদিন পর্যন্ত বন্ধুত্ব বজায় রেখেছিল। নট্ ছিল একজন গণ্যমান্য লোক ও নিউ মিংশীর মনিব। আবার দুই স্ত্রী ছিল ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাই দুই পরিবারের মধ্যে ছিল সৌহার্দ্য। উৎপন্ন শস্যের তিন-দশমাংশ নিজের

জন্য রেখে বাকী সাত-দশমাংশ নট্‌কোয়াইটকে দিতে হত; কিন্তু শ্বশুর-শাশুড়ী এখনও এরকম গণ্যমান্য লোকের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখার জন্য গর্বিত বোধ করে।

জু হুয়াইবিঙের পতনের পর আমাদের শ্যানসিহোপে—শ্যাংটং-হোনান্ সীমান্ত অঞ্চলের কর্তৃত্ব এই এলাকায় সম্প্রসারিত হয়। (অন্ততঃ নামে তো বটে)। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে (যেহেতু কথায় বলে পর্বতরাজি অবস্থান করে উচ্চস্থানে, এবং সরকারের অবস্থান আরো দূরে) অধিকাংশ স্থানীয় বাসিন্দা চালিত হত নট্ ও তার বন্ধুদের দ্বারা। কয়েকদিন পর পর নট্‌কোয়াইট্ প্রচার করে যে জাপানীরা কিংবা চল্লিশতম সেনাবাহিনী যে-কোন মুহূর্তে এসে পড়বে; যার-ই আসার কথা থাকুক, সে অনবরত বলতে থাকে—'অষ্টম সড়ক সেনা কোন কাজের নয়।' মেঙ্ সিয়াঙ্‌গিঙের শ্বশুরের কাছে অবশ্য এসব কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হত না। সত্যি বলতে কি, জাপান-বিরোধী-যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর অষ্টম সড়ক বাহিনী না আসা অব্‌দি তার ঘরে-তৈরী কাগজ মোটেই বিক্রি হত না। তাদের উৎসাহে কাগজ তৈরী আবার শুরু হয়; তাদের ব্যবস্থাপনায় সরকার আবার কাগজ কিনতে শুরু করে। সরকারের নির্দেশে আবার সবাই কাগজ তৈরী করতে থাকে। এ-ব্যবসায় নিউ মিংশী নিজেই প্রচুর কামায়। যে-জমি সে অন্যের কাছে ধারের জন্য বন্ধক রেখেছিল, তা উদ্ধার করতে দুবছরও লাগল না। সে দেখল যারা গত দুবছর ধরে কাগজ কিনতে আসত তারা সবাই অষ্টম সড়ক বাহিনীর লোক। সুতরাং এদের 'বাজে' আখ্যা দেওয়া চলে না। কিন্তু নট্‌কোয়াইটের গল্পগাছা শোনার পর তার মত পাল্টাতে সুরু করল। সে নামজাদা লোক—নিশ্চয় জেনেশুনেই কথা বলছে। যেখানে মেঙের শ্বশুর কিছুটা বিশ্বাস ও কিছুটা সন্দেহের দোলায় দুলছে, সেখানে তার শাশুড়ী কিন্তু নট্‌কোয়াইটের স্ত্রীর একেবারে অনুগত শিষ্যা হয়ে গেল। কে কাগজ কিনল বা কি করে জমি উদ্ধার হল—এতে তার মতের কোন হেরফের ঘটল না। সে শুধু এক গুরুকে মেনে চলল—সে হল নটের বউ। চল্লিশতম বাহিনী

দ্রুত এগিয়ে আসছে—একথা নটের বউয়ের মুখে শোনামাত্রই সে আশা করে বসল ওরা বোধ হয় পরের দিন বা তার পরের দিন এসে হাজির হচ্ছে। যখন নটের বউ জানাল যে চল্লিশতম সেনাবাহিনী অচিরেই গ্রামের উপস্থিত সমস্ত রক্ষিবাহিনীর ওপর গুলি চালাবে, সে ভাবল এখন তার কাজ হবে রক্ষিবাহিনার সকল পরিবারকে শবাধার প্রস্তুত রাখতে বলা। তাই এরকম শাশুড়ী যে কখনই মহিলা সংগঠনের নেত্রী হিসেবে মেঙ সিয়াঙ্ গিঙকে মেনে নিতে পারবে না—তা সহজেই অনুমেয়।

তরুণদল-কর্মী যখন দেখল যে সমস্ত যুক্তির প্রত্যুত্তরে মেঙের শাশুড়ী শুধু বউয়ের অক্ষমতার ধুয়ো তুলছে তখন তার ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। 'যদি সে না পারে', সে চীৎকার করে বলল, 'তাহলে আপনাকে পারতে হবে।' সে অবাক হয়ে দেখল যে এই কৌশলে কাজ হয়েছে। মেঙ সিয়াঙ্ গিঙের শাশুড়ীর কাছে গ্রামের কর্মী হওয়া ছিল বিপজ্জনক—কারণ আজই হোক কালই হোক একদিন না একদিন চল্লিশতম বাহিনী এসে সবাইকে গুলি করে মারবে। মেঙ্ সিয়াঙ গিঙের প্রতি ভালোবাসা-টালোবাসা কিছু নয়, বরং কর্মীর আত্মীয় হিসেবে পাছে ঝামেলায় পড়ে সেই ভয়েই শাশুড়ী ওকে কর্মী হতে দিচ্ছে না। এই কারণে সমস্ত প্রত্যাখ্যানের পরও শাশুড়ী নিজেই নেতৃত্বের ভার নিক—এই প্রস্তাব তার মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করল। নিজে দায়িত্ব না নিয়ে যদি পুত্রবধূর ওপর চাপিয়ে দেওয়া যায় তবে ঝামেলা কম হবে। তাই তার সুর অনেকটা নরম হল।

'আরে, এ আমার কর্ম নয়, কোনমতেই নয়। যদি সে সামলাতে পারে, দায়িত্ব নিক।'

দলকর্মীর-ই জয় হল। সেইসময় থেকে মেঙ্ সিয়াঙ গিঙ মহিলা সংগঠনের নেত্রী-পদ গ্রহণ করে।

৫. অদম্য ও অজেয় রূপ

গ্রামের একজন কর্মী হল মেঙ্ সিয়াঙ্ গিঙ। তাই তাকে জনসভায় যেতে হয়। 'মা, আমি সভায় যাচ্ছি।'—শাশুড়ীকে একথা বলেই সে

চলে যায়। একজন তরুণীর সভায় যোগদানের ব্যাপারটা শাশুড়ীকে হতবাক করে দেয়। মেঙ্‌কে নিষেধও করতে পারে না পাছে সেই কর্মী তার ওপর কাজের ভার চাপায়। তার কাছে অষ্টম সড়ক সেনার কোন গুরুত্ব নেই। কিন্তু সে ভেবে দেখল যে তার নিজের ক্ষমতা আরো কম। যদি সে প্রকাশ্যে বিরোধিতা করত, তাহলে পরদিন সকালে চল্লিশতম সেনাবাহিনী তার পাশে এসে না দাঁড়ালে ত্বপুরের মধ্যে তাকে জিলা সরকারী অফিসে নিয়ে হাজির করানো থেকে ঐ কর্মীকে কেউ বিরত করতে পারত না।

মহিলাদের সভায় যোগদান সম্পর্কে শাশুড়ীর ভাবনা অবিমিশ্র ছিল না। তার ইচ্ছে হত একবার গিয়ে দেখে কিন্তু শেষে সে না যাওয়াই ঠিক করল। যদি যেত তাহলে চল্লিশতম বাহিনী এসে অভিযোগ করত সে অষ্টম সড়ক উপদল-পরিচালিত সভায় যোগদান করেছে বলে। পরের দিন কৌতূহলবশে সে জানতে চলল—একদল মহিলা একত্রিত হয়ে সভায় কি বলে। অনুসন্ধান করতে গিয়ে সে মনে প্রচণ্ড ধাক্কা খেল। মেয়েরা চাইছে স্বাধীনতা। স্বামী ও শাশুড়ীর গালাগালি ও মারধোর ওরা সহ্য করতে রাজী নয়। ওরা চায় পদবন্ধনের অবসান। ওরা চায় জ্বালানীকাঠ কুড়োতে, জল আনতে আর ক্ষেতে চাষ করতে, পুরুষ যা করে তাই তারা করতে চায়। পুরুষরা যা খায়, তাই তারা খেতে চায়। তারা চায় নৈশ স্কুলে পড়তে। তার দৃষ্টিতে এটা বিদ্রোহ ছাড়া আর কিছু নয়। শাশুড়ীরা আর স্বামীরা যদি অল্পবয়সী বউদের ঠ্যাঙাতে না পারে, তবে কে ঠ্যাঙাবে? একজন না একজনকে তো ঠ্যাঙাতে হবেই। তার দ্বিতীয় পুত্রবধূ মেঙ (প্রথম পুত্র ও বউ জিয়াং-গুয়ানে চাষ বাস করে)—যত খুশী মার খাক বা গালি হজম করুক কখনই শাশুড়ীকে তার পা বাঁধতে দিত না। নিশ্চয়-ই আরো বড় করার দাবী জানানোর সাহস তার ছিল না। যে-মেয়েরা জল আনবে আর কাঠ কুড়োবে তারা কি আর মেয়ে থাকবে? অশিক্ষিত অবস্থাতেই সে পোষ মানল না। লেখাপড়া শিখে যে সে আরো উদ্ধত ও ত্বর্বিনীত হয়ে উঠবে! ত্বনিয়ার হাল হল কি?

শাশুড়ীর দুর্ভাবনা নিয়ে মেঙ্ সিয়াঙ্গিঙের বিশেষ মাথাব্যথা ছিল না। দলকর্মীর সহায়তায় তার কাজ বেশ সুষ্ঠুভাবেই চলছিল। অনেক সভায় সে যোগ দিত। শীতকালীন স্কুলেও প্রায়ই তাকে দেখা যেত। যদি কোন অল্পবয়সী বউকে শাশুড়ী মারধোর করত বা স্বামী ভয় দেখাত তাহলে সে তা মেঙ্কে বলে দিত। আর মেঙ্ সিয়াঙ্গিঙ জানাত দলকর্মীকে। এরপর চলত সভা, সমালোচনা ও লড়াই।

মেঙ্ যত বেশী উদ্যমে কাজ শুরু করল, শাশুড়ীও পাল্লা দিয়ে তার সম্বন্ধে তত বেশী খবর সংগ্রহ করতে লাগল। এখন সে তাকে মারতেও পারে না, গালাগালিও দিতে পারে না। তাই সে মেইনিকে বলে : 'ও ঐ দলকর্মীকে সব বলে দেয়। ওর সম্বন্ধে কি করা যায় বল ত? মেইনি কোন সমাধান খুঁজে পেল না। সে ঢোক গিলতে লাগল, যেমন ঢোক গিলছিল তার মা।

মেঙ্ সিয়াঙ্গিঙ কাঠ কুড়িয়ে ফিরে দেখল, তার শাশুড়ী মুখ ভার করে বসে গজ্গজ্ করছে।—'লজ্জা লজ্জা!' যখন মেঙ্ খানিকটা জল নিয়ে এল তখনও তার শাশুড়ী মুখ হাঁড়ি করে বসে গজ্গজ্ করছে—'লজ্জা, লজ্জা!'

পদ-সংকোচন বন্ধ করতে উৎসাহ দেওয়ার জন্য দলকর্মী মেঙ্ সিয়াঙ্গিঙকে অগ্রণী ভূমিকা নিতে বলল। মেঙ-ও তাই করল। শাশুড়ী তাই দেখে ঠোঁট কুঁচকাল। মেঙের মুক্ত পায়ের দিকে সে কট্মট্ করে তাকাল।

গ্রামের অল্পবয়স্কা মহিলারা কিন্তু মেঙ্ সিয়াঙ্গিঙের শাশুড়ীর মত ছিল না। তারা যখন মেঙ্ সিয়াঙ্গিঙকে কাঠ কুড়োতে দেখল, তখন তাদের মধ্যে কেউ কেউ ঐ কাজ করার জন্য তার সঙ্গ নিল। তাকে জল আনতে দেখে কেউ কেউ তার সঙ্গে জল আনতে ছুটল। তার মুক্ত পা দেখে তারাও বন্ধন কেটে ফেলল। সব স্বামীই মেইনির মত ছিল না। অনেকেই ছিল প্রগতিপন্থী। একজন বলল, 'অসংকুচিত পা নিয়ে মেয়েরা পুরুষের মতই কাজ করতে পারে।' যদি মেয়েরা জ্বালানিকাঠ ও জল আনে তবে পুরুষদের এই সব বাজে কাজে বেশী সময় নষ্ট

করতে হয় না।'—এ ছিল একজনের মন্তব্য। তৃতীয় জনের মত হল, 'নট্‌কোয়াইট্‌ সর্বদাই বলে চলেছে যে অষ্টম সড়ক ফৌজ কোন কাজের নয়। এখন দেখছি তারা যা সমর্থন করছে তা বেশ ভালই।'

যে যাই ভাবুক না কেন, বউয়ের প্রতি শাশুড়ীর ঘৃণা কিন্তু দিন দিন বেড়েই চলল। এখন সে তাকে পিট্‌তেও পারে না, গালিও দিতে পারে না—তাই তার মনের ঝালও মেটে না। সে ঠিক করল এ ব্যাপারে নট্‌কোয়াইটের স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করবে।

একদিন ক্ষেতে যাওয়ার পথে সে দেখল সামনেই চলেছে নটের বউ। 'একটু দাঁড়াবে ?'—সে চীৎকার করে বলল। নটের বউ দাঁড়াল না, বরং আরো জোরে পা চালিয়ে দিল। শাশুড়ী নটের বউকে ধরার জন্য ছুটল তার পেছনে। তার কানে ভেসে এল :

"আমাদের দুটো পরিবারের মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ এবার কমিয়ে ফেলতে হবে। ভেবো না তোমার দ্বিতীয় পুত্রবধূকে খোলা পায়ে খুব শৌখিন দেখাচ্ছে। যখন চল্লিশতম ফৌজ আসবে তখন তারা নিশ্চয় বলবে সে এক অষ্টম সড়ক সেনার বউ। অষ্টম সড়ক ফৌজের সঙ্গে তোমার পরিবারের লেন-দেন থাকতে পারে। কিন্তু তাই বলে আমরা ঝামেলা পোয়াব কেন ?"

এই অল্প কয়েকটা কথা শুনে ভয়ে মেঙের শাশুড়ীর মাথা থেকে পা পর্যন্ত সারা শরীর অসাড় হয়ে গেল। তার মধ্যে বিরক্তি ও বিদ্বেষ বহুদিন ধরেই ধূমায়িত হচ্ছিল। কিন্তু সে কোনদিন ভাবে নি যে অবস্থা এত বেশী বিপজ্জনক হবে যে সামান্য কথাবার্তাও বলা চলবে না। সে সোজা মেইনির কাছে ছুটল। উদ্দেশ্য জানা ; যদি কোন বুদ্ধি তার মাথায় এসে থাকে। কিন্তু তার মাথায়ও কিছু খেলল না। দুজনেই বসে বসে আগের মত ঢোক গিলতে লাগল।

৬. যাকে বিক্রি করাও যায় না

একবার গ্রামবাসীরা শত্রুচর রেন্ এরহাইয়ের বিরুদ্ধে লড়াই-সভাতে যোগ দিতে তাইকাং গ্রামের দিকে চলেছে। তাদের উদ্দেশ্য করে নট্-

কোয়াইট্ ও তার বন্ধুরা বলল, "তোমরা যাচ্ছ তাহলে ? রেন্ এরহাইয়ের সবকিছুর পেছনে রয়েছে চল্লিশতম ফৌজ। তাই তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলে তোমাদের গর্দান থাকবে না। চল্লিশতম ফৌজ এলেই এর বদলা নেবে।" এই সব মন্তব্য শুনে মেঙ সিয়াঙ্গিঙের শ্বশুর-শাশুড়ী ও স্বামী রীতিমত ভয় পেয়ে গেল। কেউ তাকে সরাসরি বাধা দিতে চেষ্টা করল না বটে, তবে তারা সবাই ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেল। মা ছেলেকে ফিস্‌ফিস্ করে বলল, "এবার সত্যি সত্যি বিপদে পড়লাম।" "সত্যি-কারের বিপদ"—সে ফিস্‌ফিস্ করে উত্তর দিল।

ওদের অদ্ভুত হাবভাব দেখে মেঙ্ সিয়াঙ্গিঙ পর্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়ল। যখন সে অন্যান্য অল্পবয়স্কা মহিলাদের একথা জানাল, তখন তাদের মধ্যেও কেউ কেউ বলল যে এর বাইরে থাকাই শ্রেয়ঃ। মনস্থির করতে না পেরে সে দলকর্মীকে জিজ্ঞেস করল,না গেলে ঠিক হবে কিনা। সে উত্তর দিল, "এটা বাধ্যতামূলক নয়, কিন্তু যদি জনগণ এগিয়ে যায় তবে দলকর্মীকেও যেতে হবে।" এর কোন উত্তর মেঙ্ সিয়াঙ্গিঙের জানা ছিল না। তাই সে যাওয়াই ঠিক করল। কিছু না বলে থাকতে পারবে কিনা—এই ভেবে সে অবাক হল।

তাইকাং গ্রামের মাঠে সে এক জনসমাবেশ লক্ষ্য করল। গীতি-নাট্য উপলক্ষেও এত লোকের ভিড় হয় না। যত লোক কথা বলার সুযোগ পেয়েছে তার চেয়ে বেশী লোক বলতে চেয়েছে। রেন্ এরহাই মাথা নীচু করে রয়েছে, ভয়ে কারো মুখের দিকে তাকাচ্ছে না। এই দৃশ্য দেখামাত্র মেঙের মনোভাবের পরিবর্তন হল। সে বিশ্বাসই করে উঠতে পারল না যে এতগুলো লোকের গুলি খাওয়ার ব্যাপারে কোন চিন্তাভাবনা নেই। বেশ বোঝা যাচ্ছে কোন গণ্ডগোলের সম্ভাবনা নেই। অনতিবিলম্বেই জিয়াওকৌ গ্রামবাসীরা মেঙের নেতৃত্বে রেন্ এরহাইয়ের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে দিতে এগিয়ে চলল।

এই লড়াই-সভার পরে মেঙের সাহস গেল বেড়ে। সে সরকার বদল নিয়ে শত্রুচরের গুজব আর বিশ্বাস করল না। আরো বেশী উদ্যমে কাজ করতে লাগল। শাশুড়ী ছিল ঠিক তার বিপরীত। মেঙ্ সভা থেকে

ফিরতে না ফিরতেই নট্‌কোয়াইট্‌ ও তার বন্ধুরা বলতে শুরু করল : 'আজ হোক বা কাল হোক, সে ঝামেলায় পড়বে।" শরীর-হিম-করা ভয়ে তার শাশুড়ী সমাধান খুঁজে পাওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাতে লাগল। অবশেষে সে মেঙ্‌ সিয়াঙ্‌গিঙকে শায়েস্তা করার একটা জুতসই উপায় বের করল।

একদিন শাশুড়ী মেইনির কাকীকে বলল : "তুবছর ভাল ফসল হয়নি। বাড়ীতে খাদ্য বলতে কিছু নেই। মেইনি বরং তার বউকে জিয়াংগুয়ানে নিয়ে যাক্।" সত্যসত্যই বাড়িতে খাবার কিছু ছিল না এবং মেঙ্‌ শাশুড়ী থেকে আলাদা থাকতে পারলে খুশীই হত। কিন্তু এখন গ্রামে যে কাজ শুরু করেছে তা চালিয়ে নিয়ে যেতে তাকে হবেই। ঐদিন সন্ধ্যায় মেঙ মেয়েদের সাক্ষরতা ক্লাশ নিতে গেছে। এই অবসরে তার শাশুড়ীর সঙ্গে কাকীর আর এক দফা আলোচনা হয়। ক্লাসের লণ্ঠনবাতির জন্য তেল তার বাড়িতে মজুত থাকত। সেই তেল নিতে মেঙকে ফিরে আসতে হয়। তখন তাদের কথাবার্তার কিছু অংশ তার কানে যায়।

"তাকে সিয়াংগিং-এ নিয়ে গিয়ে বিক্রি করতে হবে।" তার মা বলছিল, "আমাদের মেইনির বয়স অল্প। তার আর একটা বউ যোগাড় করার ব্যাপারে কোন অসুবিধে হবে না।"

"তোমার কি ভয় নেই যে সে একথা অষ্টম সড়ক বাহিনীকে বলে দিতে পারে ?" কাকী জিজ্ঞেস করে।

"না। সিয়াংগিং এখন জাপানীদের দখলে।"

শাশুড়ীর পরিকল্পনা যে কত চমৎকার, তা আর মেঙ্‌ সিয়াঙ্‌গিঙের বুঝতে বাকী রইল না। একথা দলকর্মীকে জানাতে দেরীও করল না সে।

কর্মী বলল : "সে সরাসরি তোমাকে কিছু জানায় নি। তাই এ ব্যাপারে কোন প্রশ্ন কোরো না। শুধু বোলো তুমি এখানে ভীষণ ব্যস্ত বলে এখন কোথাও যেতে পারবে না।"

সে যেতে নারাজ। তাই এ-ব্যাপারে শাশুড়ীর আর কিছু করার ছিল না। তার পরিকল্পনাও ব্যর্থ হয়ে গেল।

৭. নেত্রীরূপে আবির্ভাব

সেবার গ্রীষ্মে প্যাং বিংসুন্ এবং সান্ ডিয়ান্য়িং চল্লিশতম ও নয়া পঞ্চম সেনাবাহিনী নিয়ে জাপানীদের সঙ্গে যোগ দিল। এর পর অষ্টম সড়ক বাহিনী লিন্সিয়াং-এ তাদের বিধ্বস্ত করে। যখন নট্কোয়াইট্ ও তার বন্ধুরা শুনল যে চল্লিশতম ও নয়া পঞ্চম বাহিনীর হাজার চল্লিশ লোক জ্যাং নদী অতিক্রম করে উত্তরের দিকে এগুচ্ছে, তখন তারা সে খবর চতুর্দিকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। ঠিক এমনি সময় তারা জানতে পারল যে এক জাপানী ঘাঁটিতে অষ্টম সড়ক বাহিনী তাদের ধরে ফেলেছে। অবস্থা বুঝে তারা চুপচাপ কাটাতে লাগল। কিন্তু ঘটনাটা সহজেই চোখে পড়ার মত বলে তারা জয়ের সংবাদ চেপে রাখতে পারল না। সংবাদটা গ্রামের দলকর্মীদের কানে যেতেই তারা আনন্দে ডগমগ হল ও ঘটা করে তা প্রচার করতে লেগে গেল। সেই সময় থেকে তার দৃষ্টিভঙ্গির সামগ্রিক পরিবর্তন ঘটল। এমন কি যারা আগে নট্কোয়াইটের সরকার-বদল-সংক্রান্ত প্রচারে বিশ্বাস স্থাপন করে-ছিল, তারাও এখন বুঝতে পারল যে নটের সরকারেরই পতন ঘটেছে। এইরকম অপেক্ষাকৃত বেশী অনুকূল পরিবেশে মেঙ্ স্বভাবতই আগের চেয়েও বেশী সুষ্ঠুভাবে কাজ করে যেতে লাগল।

দুর্ভাগ্যক্রমে সেই শরতে ফসল খুব ভালো হল না। সারা গ্রীষ্ম জুড়ে কোন বৃষ্টি হল না। শস্য শুকিয়ে কাঠ, যেন দেশলাইর মত জ্বলে উঠবে। লম্বায় ভুট্টাগাছ মানুষের হাঁটু অব্দিও পৌঁছল না। অর্ধ একর জমিতে ছোট্ট এক ঝুড়ি দানাও ফলল না। তার পরের শরতে চলল সপ্তাহের পর সপ্তাহ অবিশ্রান্তবর্ষণ ওরৌদ্রহীন দিন। একদানা জোয়ারও ফলে নি। শস্যচারার তুলনায় আগাছা হয়ে উঠল লম্বা।

সরকারী প্রশাসন সকলের প্রতি আবেদন জানাল দুর্ভিক্ষের খাবার হিসেবে বুনো গাছ-গাছড়া সংগ্রহ করে রাখতে। গ্রামের কর্মীরা এ বিষয়ে আলোচনা করে মেঙ্ সিয়াঙ্গিঙের ওপর মেয়েদের তালিম দেওয়ার ভার দিল। এই অজন্মায় গ্রামের সবাই বেশ মনমরা। কেউ কেউ বলেও ফেলছে: "গত কয়েক বছর কোন খাদ্যশস্য না পাওয়ায়

বাঁচার কোন আশা দেখছি না। তাই কয়েক মুঠো ঘাসপাতা সংগ্রহ করে লাভটা কি?" মেঙ্ সিয়াঙ্গিঙ দ্বারে দ্বারে ঘুরে মেয়েদের উৎসাহিত করল: "আমরা মরব না। কিন্তু না মরলে নিশ্চয় কিছু খেতে হবে।" —এরকম যুক্তির সাহায্য সে নিত। আরেকটা হল: "শরৎ একবার শেষ হলে কিন্তু বুনো গাছগাছড়া সংগ্রহ করার কোন অর্থ হয় না। বুনো ঘাসপাতা ও তুষের মিশ্রণ কিন্তু শুধু তুষের চেয়ে ভাল।"

এসব বলেই সে ক্ষান্ত হল না। অত্যুৎসাহী কয়েকজন মহিলাকে নিয়ে সে কাজ শুরু করে দিল। খেতে না পেয়ে যে সব পরিবারের লোকেরা 'শান্তিতে মরাই শ্রেয়ঃ'—এই উক্তি করেছিল, তারা যে বদমেজাজের বশেই তা করেছিল, এখন তা বেশ বোঝা গেল। কারণ, যখন তারা দেখল, মেঙ্ সিয়াঙ্গিঙ ও তার সহযোগীদের উঠান বুনো গাছ-গাছড়ায় ভরে গেছে, তখন তারা নিজেরাও তা সংগ্রহ করতে বেরিয়ে পড়ল। মেঙ্ মহিলাদের চারটি দলে ভাগ করে দিল। তারা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে রোজ পাহাড়ে-পর্বতে হানা দিতে লাগল। দিন সাতেকের মধ্যেই নিকটবর্তী পর্বতস্থ সমস্ত গাছ থেকে খাদ্যোপযোগী পাতা তুলে ফেলা হল। তারপর সেগুলো মেয়েদের উঠানগুলোতে শুকোতে দেওয়া হল।

গ্রামের চতুষ্পার্শ্বস্থ জায়গা নিঃশেষিত হলে তারা অন্যান্য গ্রামের দিকে পা বাড়াল। নদীর পশ্চিম তীরে কিছুই না মিললে তারা পূর্ব তীরে এল। এইভাবে শরৎকাল পর্যন্ত চলল। তারপর একদিন প্রচণ্ড হাওয়া এসে গাছের সমস্ত পাতা উড়িয়ে নিয়ে গেল। ততদিনে জন কুড়ি মহিলা প্রায় চল্লিশ টন পাতা সংগ্রহ করে ঘরে তুলেছে।

পাতা-সংগ্রহ অভিযান শেষ হলে তারা শুনতে পেল যে একটা স্থানীয় ওষধি পাউণ্ড প্রতি এক ডলার দরে বিক্রি করা যেতে পারে। শোনা মাত্র মেঙ্ সিয়াঙ্গিঙ্ এগুলো সংগ্রহ করার জন্য মহিলা দল গড়ে তুলল। একাজ অবশ্য সহজতরই হয়েছিল। কারণ প্রত্যেক পরিবার বুনো খাদ্যের যে বিরাট স্তূপ গড়ে তুলেছিল তা দেখে বোঝা যায় যে এখন আর কেউ না খেয়ে মরার কথা ভাবছে না। যখনই পাতার

দিকে তাদের দৃষ্টি পড়ত, তখনি তাদের মেঙ্ সিয়াঙ্ গিঙের কথা মনে পড়ে যেত। তাই সে ভেষজ-সংগ্রহার্থে মহিলা দল গড়ার কথা পাড়তেই মহিলাদের পরিবারের প্রত্যেকে বলে উঠল : "ওর সঙ্গে যাও। ঐ মেয়ে জানে কি করতে যাচ্ছে।" তারা দশ টনেরও বেশী ওষধি সংগ্রহ করে ফেলল, যার বিনিময়ে তারা কুড়িহাজার ডলার উপায় করেছিল।

৮. সম্পত্তি বাটোয়ারা

মেঙ্ সিয়াঙ্ গিঙের ছিল অফুরন্ত কর্মক্ষমতা। তার কাছে দুর্ভিক্ষও হার মেনে নেয়। তাই অনেকেই বলাবলি করছিল, এর জন্য তার শাশুড়ী ও স্বামীর জীবনে এক পরিবর্তন এসেছে। ভালো করে অনুসন্ধান করে জানা গেল এটা সত্য নয়।

মেঙ্ সিয়াঙ্ গিঙ যে বুনো লতাপাতা নিয়ে আসত তা খেতে আপত্তি করে নি শাশুড়ী। সেগুলো কুড়োবার জন্য বাইরে যেতে দিতেই তার যত আপত্তি। সে এক গাদা অল্পবয়সী মেয়েকে প্রলোভন দেখিয়ে ঘরের বার করছে। মূলতঃ 'ঘরের বার' কথাটা দুটো অর্থে ব্যবহৃত হত। সে সময় বদ প্রকৃতির এক শ্রেণীর কয়লাখনির মালিক ছিল যারা কুলি-কামিনদের কিনত শুধু মৃত্যু পথে ঠেলে দেওয়ার জন্য, (এর অর্থ, কোন কর্মী অন্যায় করলে তাকে পিটিয়ে মেরে ফেলা হত।) এসব মজুরদের খনির নীচে আবদ্ধ থাকতে হত। পাঁচ দশ দিনে একবার তাদের সূর্যের মুখ দেখার জন্য ছেড়ে দেওয়া হত। এটাকে বলা হত 'বার হওয়া'। অন্য প্রকারের বহির্গমন হল কোনো বন্দীকে তার কারাকক্ষ থেকে কারা-প্রাঙ্গণে আসতে দেওয়া হয়। আবার তাকে কারা-গৃহে আবদ্ধ করার নাম—যথাস্থানে স্থাপন করা। মেঙ্ সিয়াঙ্ গিঙের শাশুড়ী যে বউয়ের বাইরে যাওয়ার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিল না, তার প্রমাণ মেলে মেঙের বিবাহোত্তর কতকগুলো কাজের মধ্য দিয়ে। তখন সে মাঠে যেত ফসল কাটতে বা বীজোৎপন্ন চারাগাছের পরিচর্যা করতে। শাশুড়ী মনে করত মেঙ কখন বেরুবে বা ঘরে ফিরবে তা ঠিক করার অধিকার একমাত্র তারই আছে। পুরোনো নিয়ম অনুসারে শাশুড়ীর

আদেশে কোন নববধূ বাড়ির বাইরে গেলে তাকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফিরতে হত। যদি সে বাইরে যেতে চাইত, তবে অনুমতি দেওয়া বা না দেওয়া সম্পূর্ণ নির্ভর করত শাশুড়ীর ওপর। অনুমতি দিলেও বউকে শাশুড়ীর মুখভাবের দিকে ভালো করে লক্ষ্য করে যেতে হত। যদি ফিরতে দেরী হত তবে তার ভাগ্যে জুটত প্রহার, বকুনি বা অনাহার। পুরোনো নিয়ম অনুসারে মেঙের পক্ষে গ্রামের সব নারীদের সংঘবদ্ধ করার ব্যাপারটা অভাবনীয় ছিল। সেজন্যই বোধ হয় তার শাশুড়ী এভাবে তাকে বাইরে যেতে দেওয়া অনুচিত বলে মনে করেছিল।

অপর কয়েকজন শাশুড়ীও এই মত পোষণ করত। এই সুযোগে নট্‌কোয়াইটের স্ত্রী একটা গুজব ছড়াল যে বুনো তৃণগুল্ম ভক্ষণে কোন প্রতিকারের আশা নেই। এর ফল হল এই যে কয়েকজন বৃদ্ধা তাদের বউদের বাইরে যাওয়া বন্ধ করে দিল। ব্যাপারটা খতিয়ে দেখার জন্য একটা বিশেষ বৈঠকে মহিলাদের ডাকতে হয় মেঙকে। এইভাবে গুজব নস্যাৎ করা হয়।

গাছপাতা ও ওষধি সংগৃহীত হওয়ার পর মেঙ্‌ সিয়াঙ্‌গিঙ তার কৃতিত্বপূর্ণ কাজের এক সংক্ষিপ্তসার প্রকাশ করে। শাশুড়ীও তাই করে। কটা বুনো লতাগুল্ম মেঙ্‌ সংগ্রহ করেছে তার পরিবর্তে বউয়ের কর্তব্য থেকে সে কত দূরে সরে যাচ্ছে তা উল্লেখ করা হল। তার মতে একটি বউয়ের করণীয় হল: তার চুল ঝাঁটার হাতলের মত সোজা করে আঁচড়াতে হবে আর তার পা পদ্মপাতার ফলকের মত ছোট হবে। সে চা করবে, রাঁধবে, জোয়ার বাছাই করবে, ময়দা পিষবে, ঝোল রাঁধবে ও জল গরম করবে, মেঝে ঝাড় দেবে, আর টেবিল মুছে পরিষ্কার করবে। সকালে ঘটি-বাটি পরিষ্কার করা থেকে রাতে শয্যা-প্রস্তুত পর্যন্ত সমস্ত সময় তাকে শাশুড়ীর তাঁবেদারী করতে হবে—এক মুহূর্তের জন্যও দূরে চলে যাওয়া চলবে না। অপরিচিত কাউকে দেখলেই গা-ঢাকা দিতে হবে যাতে নিজের থেকে না বললে বহিরাগতরা বুঝতে না পারে যে ঘরে বউ আছে। বউদের আদবকায়দা সম্বন্ধে এই ছিল তার ধারণা। যদিও সে নিজে যৌবনকালে সবসময় ঐভাবে চলেছে

কিনা সন্দেহ। সে ভাবল, একজন আদর্শ বউয়ের যেমন হওয়া উচিত তা থেকে মেঙ্ অনেক দূরে সরে যাচ্ছে। ছেলে-বউকে আলাদা করে দেওয়া দরকার।

গৃহস্থালি ভাগাভাগির সাক্ষী হিসেবে মেঙ্ নট্‌কোয়াইটকে থাকতে বলল। এটা যে যুক্তিসংগত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই—যদি তাই না হত তবে সে সম্ভবতঃ রাজী হত না। সে ও তার স্বামী এক একর সমতল জমির দুই-তৃতীয়াংশ ও সমপরিমাণ ঢালু জমি পেল। কিন্তু কোন দানাশস্য পেল না। তার শাশুড়ী বলল, 'এত কম ফসল ফলেছে যে খেতেই সব শেষ হয়ে গেছে।' সংসার ভাগ হওয়ার পর স্বামী চলে গেল মার ঘরে খেতে ও ঘুমোতে। এর ফলে খেয়াল-খুশী মত চলার স্বাধীনতা পেয়ে গেল মেঙ্।

৯. মেঙের প্রভাব বিস্তার

আলাদা হওয়ার পর যে খাদ্য তার ভাগে পড়ল তাতে তিন পাউণ্ড ওলকপিও হয় না। কাজেই তার বুনো লতাপাতাছাড়া কোন খাদ্যই জুটল না। নববর্ষে তার ঘরে খাদ্যশস্য না থাকায় সে প্রায় তিন পাউণ্ড জোয়ার, সাত পাউণ্ড গম ও এক পাউণ্ড লবণ ধার করে ফেলল

জেলা সরকারী অফিস প্রায় পনের মাইল দূরে থাকার দরুন সরকারী কর্মচারীরা কাজ দেখাশোনা করতে পারত না। তাছাড়া স্থানীয় কর্মী জোগাড় করাও শক্ত ছিল। দুর্ভিক্ষের কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য যে মেঙ আপ্রাণ চেষ্টা করেছে আর অন্যদেরও সংঘবদ্ধ করছে, সেই মেঙকে বাড়ি-ছাড়া হয়ে ক্ষিধের জ্বালা সইতে হবে এটা জেলা মহিলা সমিতির কাছে ভীষণ অযৌক্তিক মনে হল। তাকে কিছু খাদ্যশস্য দিয়ে সাহায্য করার জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে অনুমতি চাওয়া হল। জেলা পর্যায়ে মহিলা সমিতির কিছু কাজ পরিচালনা করার জন্য তাকে সেখানে রাখা হল।

চান্দ্র বৎসরের প্রথম মাসে মেঙ্ শ্রমিকনেত্রী নির্বাচিত হল। পঞ্চম উপ-এলাকার শ্রমিক নেতাদের সভা সেরে একদিন সে বাড়ি ফিরছিল। পথে টায়কাং গ্রামে মহিলা সমিতির প্রধানা মহিলাদের গড়ে তুলতে গিয়ে যে শিক্ষা সে লাভ করেছে সে সম্বন্ধে জানতে চাইল। মেঙ্

উত্তর দিল ঃ 'যখনই কোন গোলযোগ বা অশান্তি দেখা দেবে, তখনই তার ভালোমন্দ সবাইকে বুঝিয়ে বলতে হবে। নিজে কাজ করে পথ দেখাবে সবার সামনে একটা সৎ-দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে।' পদবন্ধন থেকে মুক্তি, জ্বালানি কাঠ জোগাড়, জলবহন, লতাপাতা বা ওষধি সংগ্রহ —ইত্যাদি ব্যাপারে নারীসমাজকে সজাগ করার জন্য সে দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে গেল। তার পথ অনুসরণ করে টায়কাং মহিলা সমিতির প্রধানা গ্রামের মেয়েদের নিয়ে চলল এক মাইল লম্বা খাল খনন ও আড়াই একর পোড়ো জমির সংস্কার করতে।

পরের মাসের পনের তারিখে মেঙ্ বৈশান গ্রামের মন্দির প্রাঙ্গণের মেলায় প্রচারকার্যে অংশ নেয়। পার্শ্ববর্তী গ্রামের মেয়েরা তার রীতি-পদ্ধতির তারিফ করল। এবছর কোসিয়ান প্রদেশের সপ্তম জেলার মহিলারা খাদ্যোৎপাদনে কঠোর পরিশ্রম করে। মেঙের প্রভাবের জোড়েই বহু শ্রমিক পরিচালিকা নেত্রীপদ লাভ করে।

১০. কিছু প্রশ্ন

মেঙ্ সিয়াংগিঙের সঙ্গে তার শাশুড়ী ও স্বামীর এখনও এত অসদ্ভাব কেন? এর কারণ কি এই যে সে এখনো খোলা পায়ে শান্ত ধীর পদক্ষেপে হাঁটতে পারছে? এর কারণ কি এই যে সে এত কাজ করায় তাদের আর বিশেষ কিছু করার থাকছে না? এর কারণ কি এই যে সে মাটি আলগা করে তা বেশী সরস করে ফেলেছে? এর কারণ কি এই যে গাছ থেকে সে সব ভোজ্য লতাপাতা ছিঁড়ে নিয়েছে?

তার শাশুড়ী কিন্তু এমন কোন ঘোষণা কখনও করেনি। আমি নট্‌কোয়াইট বা মেঙ্ সিয়াংগিঙের শাশুড়ী ও স্বামীর সম্বন্ধে খাতির করে কথা বলিনি। ভবিষ্যতে শোধরাবার কোন সুযোগ কি তাদের দিচ্ছি না?

এবছর মেঙ্ সিয়াংগিঙ্ মাত্র বাইশে পা দিল। প্রতিবছর শ্রমিক নেতাদের আলোচনা-চক্রে আরেক পরিচ্ছেদ লেখা যেতে পারে—যার মধ্য দিয়ে আমরা জানতে পারব কার চারিত্রিক উন্নতি ঘটেছে বা কার অবনতি ঘটেছে।

অনুবাদ : অভুরঞ্জন রায়

ছদ্মনাম য়ে জু। আসল নাম উ হেলিং। জন্ম ১৯১৩ সাল। ১৯২৭-এ চৌদ্দ বছর বয়সে স্কুল ছেড়ে বিপ্লবী কর্তৃপক্ষ পরিচালিত মিলিটারি একাডেমিতে যোগ দেন। ইতিমধ্যে তাঁর গ্রামে প্রতিবিপ্লবীরা মাথা চাড়া দিয়ে উঠলে কৃষক-বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়। তিনি ছুটে এসে দেখেন তাঁর পিতা ও এক ভগ্নীকে নৃসংশভাবে হত্যা করা হয়েছে। পকেটে চৌষট্টিটি তাম্রমুদ্রা ও ঝুড়িতে শেষ সম্বল সেকেলে কয়েকটা রমোন্যাস নিয়ে তিনি পালিয়ে এলেন ও সৈন্যদলে যোগ দিলেন। কিন্তু ঐ জীবন ভালো না লাগায় শীঘ্রই নানকিং-এ এসে সমসাময়িক চীনা ও পাশ্চাত্য সাহিত্য-পাঠে মন দেন। তারপর চলে আসেন সাংহাই-এ —যেখানে তাঁর জীবনের বাকী অংশ কাটে।

তাঁর মত শক্তিমান ও সার্থক গল্পকার সমযুগে বিরল। অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে কৃষকের আপোষহীন সংগ্রামকে (যা চীনা ইতিহাসের মূল কথা) ঘিরেই তাঁর গল্পগুলো রচিত। ১৯৩৯ সালে ক্ষয়রোগে তাঁর মৃত্যু ঘটলে চীনা সাহিত্য ক্ষেত্রে বিরাট ক্ষতি হয়। আক্ষেপের কথা, এ শতাব্দীর পঞ্চাশ ও ষাট দশকের গোড়ার দিকে এই প্রতিভাবান লেখক আশানুরূপ সমাদর লাভ করেন নি।



য়ে জু

সন্ধ্যাবেলা। সূর্য সবে অস্ত গেছে। বুড়ো লাল-নেকো, ঠিকা মজুর ও জলমহিষ-রাখাল সেই কিউফু ছুটে এল তরুণ মালিকের ঘরে।

"প্রভু হ্যান, কি করি বলুন তো?" বুড়ো ঠিকা মজুর দাড়িতে হাত বুলিয়ে দেঁতো হাসি হেসে নিচু স্বরে বলল, "এই হ্রদের পাহারার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করছিলাম।"

মালিক হ্যানের হাতে ছিল প্রথম পাঠের বই। সেটা নামিয়ে রেখে বলল: "আমিই যাব। বাবা রাজী হয়েছে।"

তাদের মাঝখানে এসে কিউফু জিজ্ঞেস করল: "সত্যি?"

"হ্যাঁ, তাই।"

বুড়ো মজুর দাড়ি থেকে হাত সরিয়ে নিল। আবার দাঁত বের করে হেসে বলল, "তাহলে আজ সন্ধ্যায় আমাদের আর হ্রদে যেতে হবে না?"

"না, তোমরা চলে যেতে পার আর যত খুশী টানতে পার।"

তরুণ কিউফু আনন্দে আত্মহারা হল। আজ রাতে গ্রামের অন্য প্রান্ত থেকে জিওগুইকে নিয়ে নলখাগড়ার বনে আগুন লাগানোর কথা। তাই আজ রাতে যদি পাহারা দিতে না যেতে হয় তবে তার পক্ষে সেটা খুব জুতসই হবে। আর সুরাপানের কথা ভেবে বুড়ো মজুরের সমস্ত মুখ জুড়ে হাসি ছড়িয়ে পড়ল।

বিদ্রূপে ভরা, হাসি-জাগানো এবং কিছুটা অশ্লীল ভঙ্গিতে সে বলে উঠল—"সাবধান বলছি।" তারপর চলে গেল।

মালিক হ্যান হঠাৎ বলে উঠল, "ফিরে আয়।" কিউফু ও বুড়ো মজুর ঘুরে দাঁড়াল।

"ধান-ভানা-কলের শ্রমিকদের বোলো আজ রাতে যেন কোনমতেই তারা হ্রদে না যায়, যদি না……" সে বুকে ঝুলন্ত চকচকে বাঁশীর দিকে আঙুল দেখাল। "বুঝতে পেরেছ?"

বুড়ো মজুর উত্তর দিল: "হ্যাঁ, পেরেছি।"

২

চন্দ্র কৃষ্ণ মেঘমালা ভেদ করে বেরুল।

এদিকে ক্যাসিয়া ও ক্রিসানথিমামকে হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে আসতে দেখা গেল। তাদের খোঁজ খবর করতে পাঠানো হয়েছিল। তাদের কপালে জমেছিল বিন্দু বিন্দু ঘাম। সবজান্তা শ্রীমতী য়ুান শেংকে খবর দিল: "হ্যাঁ, আজ রাতটাই আমাদের কাজেব পক্ষে উপযুক্ত হবে।"

লাল-নেকো চাকর বা অল্প বয়সী অন্য কাউকে চোখে পড়ল না। ঠিকা মজুরের দল তো মদ ও জুয়ায় ডুবে আছে।”

“তবে হ্রদে পাহারা দিচ্ছে কে?”

ক্যাসিয়া অপ্রতিভ হয়ে বলল, “ও হ্যাঁ, প্রাদেশিক রাজধানীর বিদেশী স্কুল থেকে ও ফিরে এসেছে।”

শ্রীমতী য়্যুন শেং মাথা নাড়ল। তারপর তুষ্টু অর্থপূর্ণ হাসি হেসে ক্যাসিয়ার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল।

ক্যাসিয়া লজ্জায় আরক্তিম হয়ে মাথা নত করল। তারপর সজল দুষ্টুমি ভরা চোখ দুটো ডাগর করে শ্রীমতী য়্যুন শেঙের দিকে তেড়ে গেল:

“শ্রীমতী য়্যুন শেং, ওরকম দেঁতো হাসির অর্থ কি? তুমি, তুমি……”

“তোমাকে দেখে নয়। বিলেতী স্কুল থেকে ফেরা ঐ দস্যি ছেলেটার কথা ভেবে হাসছি। চট করে মাসি তাই শেঙা তাওজিউ আর লী সেভেনের মেয়েদের জানিয়ে দাও। যত বেশী হয়, ততই ভালো। পূর্ণিমার রাতে আমাদের নৌকাগুলো আঁকাবাকা হ্রদে মিলিত হবে।”

“হ্যাঁ, ওদের সঙ্গে দেখা করাটাই হচ্ছে উত্তম কাজ।” ক্যাসিয়ার রাগ তখনও পড়ে নি। সে ক্রিসানথিমামের হাত ধরে দ্রুত গ্রামে ফিরে এল।

৩

পদ্মের শুঁটিগুলো অতি শীঘ্র বুড়িয়ে যাবে। নিজেদের দুর্ভাগ্যে ম্রিয়মাণ, আনত ও ম্লান মুখগুলো হ্রদের জলের উপর কোন রকমে উঁচিয়ে আছে। অধিকাংশ পাতারই ভাঙা পাখার দশা। তারা তিন চারটে শুকনো ডাঁটা নিয়ে বাতাসে দুলছে। শেষ শরতের ঠাণ্ডা শিশিরে হ্রদের তীর ঢাকা পড়েছে। দূরে অন্তহীন কাশবনে দুষ্টু ছেলেদের দ্বারা প্রজ্জ্বলিত ছোট বড় অগ্নিশিখা ক্ষণে ক্ষণে চোখে পড়ছে।

মালিক হ্যান হ্রদের ধার ঘেঁসে একটা বড় দাঁড়বাহী নৌকায় নিঃশব্দে বসে ছিল। চোখ দুটো ছিল উচ্চ তীরভূমি ও আকাশের নাগালহীন তারাগুলোর দিকে। সেই বিড়ালাক্ষীর চিন্তায় সে বিভোর। তার দুষ্টুমি ভরা, সজল আঁখি, তার রৌদ্রদগ্ধ, মধুর আবেশে-ভরা লজ্জা রাঙানো মুখ। ফিরে ফিরে মনে পড়ছিল গত জুন মাসের একদিনের কথা, যখন হাতের কাছে সুযোগ পেয়েও হারিয়েছিল। সেদিন হ্রদের পাশে ঘুরতে ঘুরতে প্রত্যক্ষ করেছিল এমন এক হাসি যা আজো ভোলে নি। সে মনে মনে বলল: "তারা আসতে বাধ্য বৈকি। তারা যতজনই হোক আমি বাঁশী বাজাচ্ছি না। আমি শুধু ধরব সেই মেয়েটিকে যার জলভরা চোখ আমাকে মুগ্ধ করেছে।

স্কুলে পড়া সেরা সুন্দরীরাও ওর কাছে কিছু নয়। তারা নানা সুগন্ধ তেল, পাউডার, উগ্র সুগন্ধি ব্যবহার করে, তোমাকে বশ করে সব কিছু করিয়ে নিতে চায়। কিন্তু তাদের পাশে এ হলো গিয়ে প্রকৃতির দুহিতা; ঘাম ও কাদার সৌরভে ভরা। তার গোলাপী গাল, তার সজল দৃষ্টি......"

কি এক সুখ-প্রত্যাশা নিয়ে সে বসে আছে। এদিকে যে শিশির এসে ধীরে ধীরে তাকে সিক্ত করে দিচ্ছে বা হ্রদের ঠাণ্ডা হাওয়ায় তার শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে—সেদিকে কোন খেয়াল নেই। স্কুলে পড়ার সময় দশ হাজার মিটার দৌড় প্রতিযোগিতায় যে সাহস ও বলের দরকার পড়ত তাই দিয়ে নিজেকে সে শক্ত করে নিয়ে আঁকাবাঁকা হ্রদের মোহানার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রইল।

চাঁদ ধীরে ধীরে পূর্ণ গৌরবে প্রকাশিত হল।

8

"এগিয়ে যা, ক্যাসিয়া।"

"কেন শুধু আমাকেই যেতে বলছ? আর তুমি—?" ক্যাসিয়া তখনও রেগে আছে। সে দশ ফুট লম্বা দোলনাকৃতি পদ্মনৌকাটা চালাচ্ছে। ছোট দাঁড়ের আঘাতে জলে ভাসমান চাঁদ যেন টুকরো

টুকরো হয়ে যাচ্ছে। তার নিকটতম সাথীরা বেশ বুঝতে পারছে যে সে কর্ণমূল পর্যন্ত আরক্ত হয়ে আছে।

"ওরে আহাম্মক, ও তোর কোন ক্ষতি করতে পারবে না।" শ্রীমতী য়্যুন শেং তার নৌকা এমন ভাবে চালাল যাতে দুটো নৌকা একজোড়া হাঁসের মত পাশাপাশি এগুতে লাগল।

"ওকে একবার এখানে নিয়ে আয়। তারপর আমরা দেখে নিচ্ছি।"

ক্যাসিয়া তখনও রাজী হচ্ছে না। অন্যেরা তাকে বিপদে পড়তে দেবে না—একথা সে ভালোভাবে জানে। তবুও সে তা করতে চাইছে না। তার মনে পড়ে গেল গত জুনের এক স্নিগ্ধ সন্ধ্যার কথা—কিভাবে বিদেশী স্কুলে পড়া ঐ ঘৃণ্যব্যক্তিটা পশুর মত আচরণ করেছিল।

শ্রীমতী য়্যুন শেং ও লি সেভেনের কন্যারা ক্যাসিয়াকে উৎসাহিত করতে চেষ্টা করল। অবশেষে সে শান্ত হয়ে দাঁড় তুলে নিল।

সে এত নিচু হয়ে দাঁড় বাইছিল যে তার মাথা নৌকার তলদেশ প্রায় ছুঁই-ছুঁই করছে। তার হৃদয় উদ্বেগ-আশংকায় চূর্ণ হতে লাগল। পদ্মের ডাঁটা ও পাতার মধ্য দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে গেল পদ্মবীজ-সংগ্রাহক তরীটা। হঠাৎ সে হাল্কা ফিসফিসে ডাক শুনে পিছনে তাকাল। শ্রীমতী য়্যুন শেং ও অন্যান্যরা অনেক পিছনে পড়ে গেছে। তারাই সাহস ও সংকল্প জোগানোর জন্য ডাকছে।

সাহসে বুক বেঁধে সে যত জোরে পারে দাঁড় বাইতে লাগল। তার নৌকা তীর বেগে ছুটল দক্ষিণ দিকে।

৫

মালিক হ্যান হন্যে হয়ে সেই মেয়েটাকে খুঁজেছে। ফলে তার চোখ দুটো প্রায় অবসন্ন হয়ে পড়েছে। এমন সময় দূরে দেখতে পেল একটা পদ্ম-নৌকা তার দিকে এগিয়ে আসছে। পরিচিত, তন্বী, লাবণ্যময়ী নারীটিকে চিনতে তার দেরী হল না। তার তরী বাওয়ার নৈপুণ্য দেখে সে বিমোহিত হল আনন্দে ডগমগ হয়ে সে তার ভারী নৌকা যত জোরে সম্ভব চালিয়ে দিল সেই মেয়েটির দিকে।

ক্যাসিয়া দাঁতে দাঁত চেপে হ্যানের নৌকাকে চক্রাকারে তার পিছু পিছু আসতে প্রলুব্ধ করল। যখন সে দেখল অন্যদের কাছাকাছি এসে গেছে ইচ্ছে করে অমনি সে থেমে গেল। তারপর সোজা ছুটল হ্যানের নৌকার দিকে।

হ্যান তার নৌকা থামাতে হাত বাড়িয়ে দিল। ক্যাসিয়াও তার নৌকায় ঝাঁপিয়ে পড়ল। ছেলেটি তাকে বাহুপাশে আবদ্ধ করতেই বাঁশীটা তার কাঁধ থেকে জলে পড়ে গেল।

তারপর চলল ধ্বস্তাধ্বস্তি, হাতাহাতি। ইতিমধ্যে এক ডজন নৌকা এক ঝাঁক বুনো হাঁসের মত ছুটে এসে তাদের ঘিরে ধরল। বড় দাঁড়-বাহী তরীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল ডজন খানেক মেয়ে।

ক্যাসিয়াকে উদ্ধার করে ওরা হ্যানকে বন্দী করল।

"ওকে ওর বেল্ট দিয়ে বেঁধে ফেল'।"

হ্যান চিৎকার করার চেষ্টা করতেই এক মুঠো কাঁচা তুলো তার মুখে পুরে দেওয়া হল।

ক্যাসিয়া কাঁদছিল! সে হেরে গেছে। দু-দুবার সে মালিক হ্যানের মুখ আঁচড়ে দিয়েছে। হ্যানের চোখ বেদনায় বিস্ফারিত হয়েছে। দু-গাল বেয়ে রক্ত ঝরে পড়ছে।

শ্রীমতী য়্যুন শেং তার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, "ও বোলতার বাচ্চা!" আর মনের খুশীতে বকে চলল, "বেজম্মা কাহাঁকা। জীবনে কোনদিন কষ্ট পেয়েছিস? মজা লুটতে এসেছিলি, নারে?"

"আয়, আমরা সবাই ওকে রেখে পালাই। ও রাতটা এখানেই কাটাক!"

ভীড়ের মধ্য থেকে একটা নিষ্করুণ বিদ্রূপের হাসি ভেসে এল।

৬

চাঁদ ধীরে ধীরে পশ্চিমে ঢলে পড়েছে। ডজন খানেক পদ্মবীজ-সংগ্রাহক তরী হ্রদের বুকে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াচ্ছে আর ডজনখানেক কাঁচি একসঙ্গে বীজ কেটে চলেছে।

ক্যাসিয়ার ক্ষুব্ধ ভাব এখনো কাটে নি। চোখ মুছতে মুছতে পদ্মবীজ কাটছে। অবশ্য অন্যদের থেকে কমই সংগ্রহ করছে। শ্রীমতী য়্যুন শেং তাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করছে—

"কিছু মনে করিস না। আমরা জানি তোকে কি ঝামেলা পোয়াতে হয়েছে। আমাদের থেকে কিছু কিছু তোকে দেব।"

হ্রদের ওপর দিয়ে মৃদু বাতাস বয়ে গেল। বিশৃঙ্খল ঢেউগুলো গাছের গোড়া ও পাতাগুলো জড়িয়ে ধরছে। তরীগুলোও দোলনার মত দুলছে।

"চট্‌পট্ কর। নাহলে ঠিকা মজুরের দল আমাদের ধ'রে ফেলবে।"

প্রত্যেক তরী ভরে গেছে দেখে মেয়েরা ভারী খুশী। কোনো বুড়োর শাসানির ভয় নেই ; কোন পাজী মজুরও ওদের পিছু নেবে না।

আঁকাবাঁকা হ্রদ থেকে ফেরার পথে ওরা শান্তমনে গান ধরেছে :

পদ্ম চুরি করে ফিরছি মাঝরাতে
সবাই যখন ঘুমে অচেতন।
ধনীরা গরিবের কষ্ট বোঝে না
কিন্তু গরিবেরা জানে ধনীরা আদপে কি।
তরী চালাও আরো জোরে
যদি হ্রদ-প্রহরীর দল পিছু নেয়, তবে নেই রক্ষে।

৭

ধেনো মদ টেনে টেনে বুড়ো মজুরের নাক আরো লালবর্ণ হয়েছে। পরের দিন সকালে যখন সে আলস্য ভরে তার খড়ের তৈরী ঝুপড়ি থেকে বেরিয়ে এল, তখন সূর্যের আলো প্রাচীরের তল পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।

কতকগুলো পুরোনো কাঁচা তুলো দিয়ে চোখ ঘসে টলতে টলতে সে তরুণ মালিকের পড়ার ঘরে ঢুকল :

"মালিক হ্যান, মালিক হ্যান"—

শরত-সকালের এক দমকা ঠাণ্ডা হাওয়া ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

বুড়োর এবার সন্দেহ হল। মনে মনে বলল : মজার ব্যাপার দেখছি। ঐ মেয়ে-শয়তানগুলো নিশ্চয় ওকে জাদু করেছে।

সে তার কুকুরের গর্তে ফিরে গেল এবং চিৎকার করে কিউফু-কে উঠে পড়তে বলল। আগের দিন রাতে আগুন জ্বালাতে গিয়ে তার সব চুল পুড়ে গেছে।

"জাহান্নমে যা, ক্ষুদে শয়তান। চট্‌পট্‌ গিয়ে মালিক হ্যানকে ধরে আন।"

বুড়ো ও ছেলেটি অনেক চেষ্টার পর হ্রদ থেকে মালিক হ্যানের নৌকা টেনে নিয়ে এল।

মালিক হ্যানের মুখ ফুলে গেছে। দেখতে ঠিক হাকিমের মত লাগছে। তার রক্তাক্ত ক্ষতগুলো শুকিয়ে হয়েছে বেগুনীবর্ণ। সে বুড়ো মজুরের কানের পাশে এক মোক্ষম চড় বসাল। বিশ্রীভাবে চেঁচিয়ে উঠল : "কোথায় ছিলি তোরা? মরে গিয়েছিলি নাকি? জাহান্নমে যা সব।"

মজুরটি হাসবে কি কাঁদবে বুঝতে পারল না। সে জোরে নাক ঘসল।

"হুজুর, আপনি কিন্তু বাঁশী বাজান নি। কেন, বলুন তো?"

"জাহান্নামে যা।" তরুণ মালিক বিড়বিড় করে বলল। বিকট চিৎকার করার পর তার স্বর লোপ পেয়েছে মনে হল।

"আয় আমার সঙ্গে আয়। সব বাবাকে খুলে বলব। ওদের সর্দার হল ঐ য়্যুন শেঙের স্ত্রী। আমি বলছি জাহান্নামে যাবে ও। ওর এখনও ভাড়া বাকী। টাকাও শুধতে পারে নি। তিন মাস ওর স্বামীকে ঘর ছাড়া করে রাখব। তখন ওরা বুঝতে পারবে কি ধাতুতে আমি গড়া।"

আগুনে-পোড়া মাথায় হাত দিয়ে বালক কিউফু বোকার মত দাঁড়িয়ে রইল। সে তার নোংরা চোখ দিয়ে অল্পবয়স্ক মালিকের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল। কখন আর এক ঘা এসে তার মাথায় পড়ে— এই ভয়ে কাঁদছিল। ভেবে অবাকও হচ্ছিল যদি, বিশ্রী রাত ভর তরুণ মালিককে ঐ ভাবে বন্দী অবস্থায় কাটাতে হত তাহলে কিই না ঘটত?

অনুবাদ : ঋভুরঞ্জন রায়

চ্যাং তিয়েন য়ি—১৯০৬ বা ১৯০৭ সালে নানকিং-এ জন্ম। ১৯৩১ থেকে ১৯৩৭ সালের মধ্যে চারটি উপন্যাস ও ৬ খণ্ড ছোট গল্প প্রকাশ করেন।

চীন-জাপান যুদ্ধকালে ঐ যুদ্ধের পটভূমিকায় কিছু রোমান্টিক গল্পও লেখেন। ইদানীং তিনি শিশুদের উপযোগী গল্প লিখছেন। তাঁর লেখায় ব্যঙ্গরস প্রকট। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক-দের তিনি বিদ্রূপ-বাণে জর্জরিত করেছেন। সমসাময়িক সাহিত্য বিচার করলে সহজেই তাঁর প্রকাশভঙ্গির বিশিষ্টতা চোখে পড়ে। ভাষার ব্যাপারে তাঁর পরিমিতিবোধ সত্যই অনন্য।

মহানুভবতা



চ্যাং তিয়েন-য়ি

রিক্সাটা মন্থরগতিতে কয়েকশ গজ রাস্তা পেরিয়ে এসেছে। চালকের বয়স চল্লিশ কি পঞ্চাশের কোঠায় হবে। সে শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে লোহার হাতল দুটো চেপে রেখেছিল যাতে সেগুলো ওপরের দিকে ঠেলে না ওঠে। ঠিক নাকের শেষ প্রান্তে একটি বড়ো স্বেদবিন্দু টলটল করছিল।

"ও মশাই, কোথায় যেতে হবে?"

কোনো উত্তর এল না। ভদ্রলোকের চোখদুটো সামনের দিকে নিবদ্ধ। বাঁকানো ঠোঁট দুটো শক্ত করে চেপে রয়েছেন। প্রকাণ্ড গিরগিটির মত দশাসই চেহারা।

সব্‌জিবিক্রেতারা ঠেলাঠেলি করে রাস্তা ধরে পণ্য হেঁকে চলেছে। ফুটপাত জুড়ে তাদের পসরা সাজিয়েছে—তবুও তাদের দেখে মনে হচ্ছিল তাদের আরো জায়গা চাই। তাই তারা রাস্তার মাঝখান পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে।

রিক্সাচালক রাস্তা ধরে এঁকেবেঁকে চলেছে। যখনই রিক্সা গর্তে পড়ে যাচ্ছে, তখনই সেটা একদিকে হেলে পড়ছে। ফলে তার কব্জীতে দারুণ লাগছে। ভদ্রলোক পিঠটাকে আসনের সঙ্গে আরো সেঁটে দুটো হাত দিয়ে আস্তিন দুটো আরো শক্ত করে আঁকড়ে ধরেছেন। গাড়িটায়

একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ছিট্‌কে পড়তে তাঁর হাত তুটো আস্তিন-যুক্ত করে টাল সামলে নিতে হচ্ছে। গাড়িটা খুব আস্তে চলেছে বলেই যে এই বিপত্তি—সে সম্বন্ধে তাঁর কোনো সন্দেহ ছিল না।

"বলি ব্যাপার কি হে? নেতিয়ে পড়লে নাকি?"

এদিকে রিক্সাচালক একরাশ বরফের টুকরোর ভেতর দিয়ে পথ করে নেওয়ার কাজে ব্যস্ত ছিল। সে পিঠ বাঁকিয়ে এত নিচু হয়ে কাজ করছিল যে পেছন থেকে তার মাথাও সবটা দেখা যাচ্ছিল না। হঠাৎ হাতলতুটো ওপর দিকে চিতিয়ে উঠল আর ভদ্রলোকও পেছনের দিকে ছিটকে পড়লেন। নাক থেকে বেরিয়ে এল একটা অদ্ভুত আওয়াজ। দাঁতে দাঁত ঘসে হুংকার ছাড়লেন।

ততক্ষণে রিক্সাওয়ালা এক তরুণ আনাজ বিক্রেতার সঙ্গে ঝগড়া লাগিয়ে দিয়েছে। একে অপরের মুখের কাছে মুখ এনে অনর্গল গালি দিয়ে চলেছে। ভদ্রলোকের চৈতন্য হল—আর এসব নোংরা লোকদের বাড়তে দেওয়া উচিত হবে না। রিক্সায় সজোরে পা ঠুকে তিনি বল্লেন—"ওহে, ঝগড়া থামিয়ে চল দিকি বাপু।"

রিক্সাচালক মুখ ঘুরিয়ে তাকাল। ঘামে কপাল ভেসে যাচ্ছে; তু-ইঞ্চি পুরু দাড়ি ভিজে একেবারে জবজবে।

"এই লোকটা আমার রিক্সা মাড়িয়ে পাটাতন ভেঙ্গে দিয়েছে। মশাই, এটা ঠাট্টার ব্যাপার নয়।······আহাম্মক কোথাকার! মাথায় যদি কিছু থাকে! আমি ওর ওপর গিয়ে পড়েছি একথা সে বলবে কেন?"

ভদ্রলোক সামনের দিকে ঝুঁকে বললেন: "তোমার সাহস তো কম নয়?"

"আপনি কি বলছেন? আমি কি আপনার সঙ্গে কথা বলেছি?"

"হুঁ, তাহলে এই মাত্র কি বলছিলে? ফুটবোর্ডের কি হয়েছে আমাকে বল।"

রিক্সাচালক এক হাত মুক্ত করে ন্যাকড়া দিয়ে সারা মুখ মুছে নিল। হাতল ছেড়ে দেওয়া মাত্রই সেটা ওপরের দিকে ওঠবার উপক্রম করল।

সে তৎক্ষণাৎ শক্ত করে টেনে ধরল। তার যে কষ্ট হয়েছে সেটা তার চাপা গোঙানির শব্দে বোঝা গেল। সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার সেই বরফের টুকরোগুলোর দিকে নজর রাখতে হচ্ছে, পাছে সে পিছলে পড়ে। পরনে শতচ্ছিন্ন পাজামা। লিকলিকে পাদুটো চলেছে কোনরকমে টলতে টলতে। নিশ্চয় তার পা দুটো ঘায়ে ভরে গেছে।

পাছে কেউ শুনে ফেলে সেই ভয়ে নিচু স্বরে বলে চলেছে - "পাটা-তনটা ভেঙ্গে গেল। এটাকে সারাতে আবার কিছু খরচ পড়বে। ওই ডেঁপো বজ্জাতটাকে আমি দেখে নেব। আর এই ভদ্দরলোককেও বলিহাবি বাবা মাত্র চল্লিশ পয়সায় এতোখানি পথ টেনে নিয়ে যেতে হবে। আর ওজন কিরে বাবা!"

সে সুর চড়িয়ে বলল: "ও মশাই, শুনছেন? আর কত দূর? এখনও কি সেখানে এসে যাই নি?"

সে নাকটা কুঁচকাতেই ঘামের একটা বড় ফোঁটা মাটিতে পড়ে গেল। তার হাতের চামড়া ফুটিফাটা—লাল শিরাগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আর লোনা ঘামের ছোঁয়ায় স্থানে স্থানে জ্বালা করছে।

ভদ্রলোক ভাবলেন, নিশ্চয় এগারটা বেজে গেছে। দুপুরের খাবার সেরেই ছুটতে হবে সহরে কাজটা সম্বন্ধে জানাতে। শালা রিক্সা-ওয়ালাটাকে আবার চল্লিশটা পয়সা গুণতে হবে।

অবশ্য মুখে কিছু বললেন না। রিক্সায় ভারিক্কি মেজাজে গ্যাঁট হয়ে বসে রইলেন। যদি ব্যাটা বেশী বক্‌বক্ করে তবে এক দাঁত-খিচুনিতে থামিয়ে দিতে হবে—"চোপরাও! জলদি চালাও।"

নিচু-তলার লোকদের সঙ্গে এরকম ব্যবহারই তিনি করে এসেছেন। রিক্সাতে স্রেফ এক ঘণ্টা বসে থাকার জন্য চল্লিশটা পয়সা গুণতে হবে। অথচ ঐ বদমাশটা কমতি হয়েছে বলে গজ্‌গজ্ করছে। পিঠটাকে আরো সেঁধিয়ে দিয়ে বাহুদুটো আড়াআড়ি করে চেপে বসলেন —তবুও যেন তাঁর আরাম হচ্ছে না। সচরাচর তিনি রিক্সায় চড়েন না। চেনের যদি বাইরে যাওয়ার তাড়া না থাকত তবে তাঁরও তার থেকে পাঁচ ডলার উদ্ধারের জন্য এমন হন্যে হয়ে ছুটতে হত না। সেক্ষেত্রে চল্লিশ

পয়সা জলে ফেলে সে কিছুতেই এমন কচি খোকা সাজত না। মুখ শক্ত করে চেপে রইল—ভয় পাচ্ছে কেউ তাতে কিছু ঠেসে দেয়।

চালক নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল; "ও মশাই, এসে গেছি কি?" কোন উত্তর নেই।

আসলে ভদ্রলোক চেনের বাড়ির দরজা দেখতে পেয়ে গেছেন। তিনি একটা কু-মতলব আঁটছিলেন। তাই কিছু বলছিলেন না। আশা করেছিলেন আরেকটু বেশী খাটালেই রিক্সাওয়ালাটা ক্লান্তিতে এতই নেতিয়ে পড়বে যে আর একপাও এগুতে পারবে না। আর তারও ভাড়া গুণতে হবেনা। না হলে তার সমূহ ক্ষতি।

তাদের পেছনে মোটর গাড়ি থেকে কে যেন চেঁচিয়ে উঠল। ওটার পাশ কাটাতে গিয়ে রিক্সাটা রাস্তার একধারে নিয়ে আসতে হল। সেখানে রয়েছে একটা ডোব। ব্যস্, আর যায় কোথায়? রিক্সাটা গেল আটকে। পেছনে থেকে একনাগাড়ে হর্ন বেজে চলেছে।

রিক্সাচালক হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—"সবুর করুন, সবুর করুন।" বাঁ-দিকের চাকাটা গর্তে ঢুকে গেছে আর ভদ্রলোকও একপাশে ছিটকে পড়েছেন। গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে চালক রিক্সাটাকে টেনে তুলতে চেষ্টা করল। তার ডান পা ঊর্ধ্বে তুলে দিয়েছে—সে খেয়াল ছিল না। ফলে এক সময় পা হড়কে গেল আর হাতল দুটোর মাঝখানে জবুথবু হয়ে পড়ে রইল। ভদ্রলোক টাল সামলাতে না পেরে প্রথমে পড়ল চালকের ঘাড়ে ও পরে গড়িয়ে তার পাশে মাটিতে।

চারিদিকে লোক জড়ো হল। কতকগুলো চ্যাংড়া তারস্বরে চেঁচাচ্ছে আর বয়স্কেরা ঠেলে সামনে আসতে চাইছে। এক মহিলা পা ঠুকে চ্যাঁচামেচি লাগিয়ে দিল। এদিকে ভদ্রলোক পায়ের ওপর ভর দিয়ে উঠে পড়লেন। প্রথমেই ধরাশায়ী চালককে এক পলক দেখে নিলেন। তারপর তার নজর পড়ল নোংরা হাত দুটোর দিকে। তার কোন আঘাত লাগে নি বটে তবে তার কোটের জায়গায় জায়গায় ধুলো লেগেছে।

তিনি ভাবলেন, রিক্সাচালকই এই ঝামেলা পাকিয়েছে। কাজ

সম্বন্ধে তার মোটেই সন্তুষ্টি ছিল না—সাড়া পথ খুঁত খুঁত করেছে। এবার বাছাধনকে সমুচিত শিক্ষাই দিতে হবে। মুখে-চোখে বিরক্তির ভাব এনে তিনি হাত-পা নাড়তে শুরু করলেন। দর্শকেরা গভীর আগ্রহের সঙ্গে প্রতীক্ষা করছিল কখন তিনি আস্তিন গুটিয়ে তাকে পেটাতে শুরু করবেন।

কিন্তু তেমন কিছু ঘটল না। তাদের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে তিনি বোঝাতে চাইলেন যে সমস্ত ব্যাপারটাই খুব বিরক্তিকর। ব্যাগ থেকে ধুলো ঝাড়ছেন আর সর্বক্ষণ রিক্সাওয়ালার বাপান্ত করছেন।

এদিকে ভীড় ক্রমেই বেড়ে চলেছে। প্রত্যেকেই চেষ্টা করছে ভীড় ঠেলে সামনের দিকে আসতে। ত্রিকোণ ব্যাজ-অাঁটা বিলিতি পোশাক-পরা একজন অনায়াসে দুপাশের লোককে সরিয়ে জায়গা করে নিল। তার হাবভাব দেখে মনে হচ্ছিল যেন একমাত্র তারই সামনে এগুবার অধিকার আছে। বুক চিতিয়ে এগিয়ে এল সব নষ্টের গোড়া রিক্সা-চালককে জব্দ করার জন্য।

চালক বেচারা উঠতে চেষ্টা করে চলেছে, কিন্তু কিছুতেই পারছে না। তার বুড়ো আঙুল থেতঁলে গেছে। অন্যান্য আঙুলগুলোতেও দারুণ চোট লেগেছে। হাঁটু দুটো হিমশীতল মাটিতে বারে বারে ঘসা-খাওয়ার ফলে স্থানে স্থানে দারুণ ছড়ে গেছে। পায়ের পাতা কুঁকড়ে গিয়ে নিঃসাড় হয়ে পড়েছে।

"কোথায় যাচ্ছে সেদিকে লক্ষ্য না রেখে ও দোষ করেছে বৈকি"—জনৈক বৃদ্ধের মন্তব্য শোনা গেল।

রিক্সাওয়ালা দুহাতের ওপর ভর দিয়ে উঠতে চাইল। তার বাহু দুটো কাঁপছে। উপরের দিকে মুখ তুলতেই ভদ্রলোকের সঙ্গে চোখা-চোখি হয়ে গেল। কোমরে হাত দিয়ে তিনি পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন। মুখটি নিতান্ত পান্‌সে করে বললেন: "এখন কি করবে ভেবেছ কি?"

মাঝারি আকারের একজন স্কুলের ছাত্র লাফিয়ে এক পলক দেখে নিয়ে বলল, "ওকে থানায় নিয়ে যান, থানায় নিয়ে যান।" তারপর মুখভঙ্গি করে হাসতে হাসতে চলে গেল।

রিক্সাওয়ালার পা-দুটো রীতিমত কাঁপছিল—সে কিছুতেই তার পা সোজা করতে পারছিল না। তার মুখের বলিরেখাগুলো জমে কঠিন-রূপ ধারণ করেছে। পাজামার ফোঁকড় গলে নোংড়া হাঁটু দেখা যাচ্ছে। সেখান থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ঝরছে। এসবের দিকে দৃকপাত না করে সে রিক্সাটা ভালোভাবে পরীক্ষা করে যেতে লাগল। —কোনো ক্ষতি হয়েছে কিনা। আর নিচু গলায় শাপশাপান্ত করতে থাকল।

সাহেবী পোশাক পরা লোকটি প্রত্যেকের দিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে ছোটখাটো একটা বক্তৃতা দিয়ে ফেলল। আইনগত দিক খতিয়ে পরিশেষে তার সুচিন্তিত রায় ঘোষণা করল : "কারোর ওপর দোষ চাপিও না। রিক্সাযাত্রীর নিরাপত্তার ভার তুমি ছাড়া আর কে নেবে বল।" সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোক গলা খাঁকারি দিয়ে বলে উঠল : "খুব হক কথা। ......লোকটার কথা আর বলবেন না। সাড়া পথ জ্বালিয়েছে—ওহে তুমি নিজেকে কি মনে কর, শুনি? চড়ানোর বেলায় তো বেশ উৎসাহ দেখালে—সে কি এভাবে ফেলে দেবার জন্য? আচ্ছা লোক তুমি।"

রিক্সাওয়ালা টেলিগ্রাফের থাম ধরে দাঁড়িয়ে রিক্সার চাকার স্পোক-গুলো খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে দেখছিল অক্ষত আছে কিনা। সে মাথা নিচু করে থাকলেও বেশ বোঝা যাচ্ছিল তার লক্ষ্য রয়েছে ভদ্রলোক কি করে তার উপর।

কয়েকজন এগিয়ে এল একসঙ্গে ভদ্রলোককে উপদেশ দিতে। তাদের মতে রিক্সাচালকের গাফিলতির জন্যই ব্যাপারটা ঘটেছে। তবে তার জন্য তাকে মাশুলও গুণতে হয়েছে। সে নিজে আঘাত পেয়েছে। সুতরাং ব্যাপারটার এখানেই ইতি হওয়া ভাল। আবার থানা-পুলিশ করাটা মোটেই শোভন হবে না।

গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে সবাই তাকিয়ে আছে সেই গিরগিটি-মুখো ভদ্রলোকের দিকে। তিনি একবার থুতনিতে মোচড় দিলেন, ও ঠোঁট কোঁচকালেন। তারপর শান্তকণ্ঠে বললেন : আচ্ছা, "আমি অল্পেতেই একে ছেড়ে দিলাম।" তারপর তিনি রাস্তা ধরে পা চালিয়ে দিলেন।

ভীড়ের মধ্যে অনেকেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। ব্যাপারটা মনোমত হওয়াতে কেউ বা আনন্দে শিস্ দিল। ভদ্রলোকের অসীম দয়া। সাহেবী পোশাক-পরা লোকটি তো বিস্তর মাথা নেড়ে ঐ বিষয়ের ওপর আরেকটা বক্তৃতা দিয়ে দিল।

বেচারা রিক্সাওয়ালা দাঁতে দাঁত ঘসল আর নাকে মোচড় দিল। তার চোখে জল এল। "আমাকে আবার অতটা পথ হেঁটে ফিরে যেতে হবে সহরের পশ্চিম প্রান্তে। এতটা পথ আমাকে দিয়ে টানিয়ে নিল— শালার যেন ভাল না হয়। এই নিয়ে শালা রিক্সাসমিতি আবার আমাকে না ঝামেলায় ফেলে।"

দীর্ঘশ্বাস ফেলে চল্লিশোত্তীর্ণ একজন বলল: "এসব নিয়ে অযথা চিন্তা কোরো না। তোমার ভাগ্য ভাল যে অমন দিলদরাজ লোক পেয়েছিলে। অন্য কেউ হলে কি কাণ্ডটাই না বাধাত?" সুর মিলিয়ে অন্য এক ফেরিওয়ালা বলল: "বাস্তবিকই উনি খুব উদার।"

প্রত্যেকেই দেখতে পেল, ভদ্রলোক রাস্তা পেরিয়ে একটি বাড়ির দরজা দিয়ে ঢুকছেন। দরজায় ধাক্কা দেওয়ার আগে তিনি একবার পিছন ফিরে তাকালেন। তারপর পকেটে হাত ঢুকিয়ে মুদ্রাগুলো নেড়ে চেড়ে দেখে আশ্বস্ত হলেন— না, ঠিকই আছে। মুখে হাসি-হাসি ভাব ফুটে উঠল। প্রত্যেকবার রিক্সায় চড়লেই যদি অমন ঘটত তাহলে জীবনটা কি সুখেরই না হত।

অনুবাদ: ঋভুরঞ্জন রায়

দ্বীপে কয়েকদিন



য়েই উ

য়েই উ একজন প্রথিতযশা ছোটগল্প লেখক। Nan Xing Ji নামক গল্পসংগ্রহ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। উনান প্রদেশের দূরবর্তী স্থানগুলিতে ভ্রমণ করতে গিয়ে তিনি চোরাইচালানকারী সরাইখানার মালিক, বিদেশে কর্মরত চীনা শ্রমিকদের সান্নিধ্যে এসেছিলেন। জাপানের সঙ্গে যুদ্ধের সময় তিনি কতকগুলো দেশাত্মবোধক গল্প ও উপন্যাস লেখেন। ১৯৪৯ সালের পরও তাঁর লেখা অব্যাহত থাকে।

মেঝে অত্যন্ত ঠাণ্ডা বোধ হওয়ায় সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠলাম ও জামাকাপড় পরতে শুরু করলাম। সম্মুখে নীল, পাণ্ডুর সমুদ্র প্রসারিত। তার শান্ত বুকে বাদামী রং-এর জাহাজগুলো ভাসছে। ঘরের দেওয়ালগুলো কোমর-প্রমাণ উঁচু হওয়ায় সমস্ত দৃশ্যটা দেওয়ালে টানানো ফ্রেমে আঁটা প্রকাণ্ড ছবির মত মনে হল। তাদের ওপর কয়েক গজ অন্তর একটা থাম ছাড়া আর কিছু ছিল না। তাই দৃশ্য উপভোগ করার জন্য বাইরে বারান্দায় যাওয়ারও দরকার ছিল না।

ডানদিকে মূল ভূখণ্ড প্রত্যুষের কচি আলোয় অবগাহন করছে। তীরে নারকেল গাছের সারি এগিয়ে চলেছে দূরে যেখানে সমুদ্র ও আকাশ কোলাকুলি করছে। বাম দিকে গম্ভীর ও উন্নত পর্বতশৃঙ্গগুলো আকাশের দিকে মুখ উঁচিয়ে আছে। যেখানে পর্বতরাজি সমুদ্রকে স্পর্শ করেছে সেখানে এক আধুনিক সহরের লাল-ছাদওয়ালা বাড়িগুলো থেকে বেরিয়ে আসছে কালো ও হলদে রং-এর ধোঁয়ার কুণ্ডলী। বাধ্য হয়ে রাত্রিযাপনের যে বিরক্তি মনে জমে ছিল তা মনোরম পরিবেশে অনেকটা ফিকে হয়ে গেল। জায়গাটা সত্যি খুব ভালো লাগল।

আমার ঠিক পাশেই বসেছিল বছর পঞ্চাশের এক বৃদ্ধ। দ্বীপে আসার পর থেকেই সে খিট্‌খিট্‌ করছে। হঠাৎ তার দীর্ঘশ্বাস পড়ায় মনে হল আবার বুঝি তার বিলাপ শুরু হবে। কিন্তু তেমন কিছু না

করে মুখ শক্ত করে চেপে সে দূরে তটভূমির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখলাম, দূরে তীরস্থ বনভূমিতে কালো ধোঁয়া ছড়াতে ছড়াতে কি যেন একটা আমাদের দিকে ছুটে আসছে। ধোঁয়া ভাসতে ভাসতে গাছগুলোর উপর দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। বাঁশী বাজিয়ে ট্রেন থামল। ধোঁয়ার কুণ্ডলী আবার আকাশ ছেয়ে ফেলল। এতক্ষণে বুঝলাম ঐ বৃদ্ধ কেন দুঃখ করছে। আগের দিন সে আমাকে জানিয়েছিল যে তীরে পৌঁছে ট্রেনে চেপে দূরবর্তী কোন জায়গায় সে যাবে।

গতরাতে কংক্রিট মেঝেতে শীর্ণ দেহ নিয়ে সে শুধু এপাশ-ওপাশ করেছে। আর থেকে থেকে সে বিড় বিড় করে বকেছে: "কি রকম নিয়মকানুন বুঝি না বাপু, যার জন্য স্বল্পভাড়ার যাত্রীদের এ ভাবে কষ্ট পেতে হয়।"

সময়টা ছিল এপ্রিল মাস। আর স্থানটা নিরক্ষীয় অঞ্চল। মাদ্রাজ, কোলকাতা, রেঙ্গুন ইত্যাদি যেসব বন্দর থেকে আমরা জাহাজে চড়েছি —সেগুলো ভারত মহাসাগরীয় টাইফয়েড-আক্রান্ত বন্দর বলে ঘোষিত হয়েছে। তাই মহামারী-নিবারক কেন্দ্রে নির্দেশ এসেছে নোংরা তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের একসপ্তাহ ধরে বীজাণুমুক্ত করেই যেন তীরে পাঠানো হয়। গতরাত্রে প্রহরীর অধীনে এখানে আসার পর আমাদের বাক্স-বিছানা সব শোধনের জন্য যথাস্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। ফলে সে-রাত আমাদের কংক্রিটের মেঝেতে শুতে হয়েছে খালি গায়ে। রাত্রির প্রথম দিকটায় ঠাণ্ডা সুখকরই বোধ হল, কিন্তু শেষ দিকে আর্দ্র, সামুদ্রিক হাওয়া বইতে থাকায় শীত-শীত বোধ করি। ঐ বৃদ্ধের অবস্থা হয়ে ওঠে আরো কষ্টকর। দিনের আলো ফুটতে না ফুটতে শুরু হয়ে যায় ওর হাঁচি ও কাশি। এখন সে লিকলিকে হাত দুটো দিয়ে দেয়াল আঁকড়ে ধরেছে। তার শীর্ণ, স্বল্পস্ফুট, কাঁপা-কাঁপা ঠোঁটদুটো জানিয়ে দিচ্ছে যে সকালের সমুদ্রের হাওয়া তার মোটেই সইছে না। সে চেয়ে আছে অপলকে সমুদ্রের দিকে। মূল ভূখণ্ড ও দ্বীপের মধ্যবর্তী সমুদ্রে পারাপারে ব্যস্ত দুটো বাদামী রঙয়ের স্টিমার। ওপর ও নিচের ডেক-সমেত

দুটো জাহাজই যাত্রীতে ঠাসা। ওদের সামনে ও পেছনে সাদা ফেনার রাশি। যার জন্য সাগরের আয়নার মত মসৃণ বুকে সৃষ্টি হয়েছে দু-সারি ঢেউ। চমকে-ওঠা ভাসমান গাঙচিলগুলো রুপোলি পাখায় ভর করে আলো ছড়াচ্ছে আর চক্রাকারে ভোরের আকাশ পরিক্রমা করছে।

কিছুটা উত্তেজিত, কিছুটা স্বপ্নের ঘোরে বৃদ্ধ বিড় বিড় করে বলে চলল: "অতিরিক্ত ভাড়া দিয়ে আমার দ্বিতীয় শ্রেণীতে চড়া উচিত ছিল।" আমি তাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করলাম: "ধৈর্য ধরতে পারলে এ ক'টা দিন কাটতে দেরী হবে না।" সে শিউরে উঠে এমন-ভাবে তাকাল যে আমি অবাক না হয়ে পারলাম না এতক্ষণ অসাবধানে কথা বলার জন্য খুবই দুঃখিত—এরকম ভাব দেখিয়ে সে হঠাৎ সুর পাল্টে ফেলল: "যদি বেশী টাকা পয়সা আনতাম তাহলে আমার এমন দশা হত না।"

তার শীর্ণ, তোবড়ানো গাল অস্বাভাবিক রক্তিম হয়ে উঠেছে। একটু থেমে সে বলে চলল, "এই অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নিতে বলছ, তাই না? জেনে রাখ, আমি সেটা পারব না। কারণ আমার জরুরী কাজ রয়েছে।" মাথা তুলিয়ে সে দালানটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। চোখে মুখে তার ভীত, ত্রস্ত ভাব।

দালানটা ছিল প্রায় ষাট গজ লম্বা আর বার গজ চওড়া। কোন আসবাবপত্র ছিল না। একদিকে মাদ্রাজ থেকে আগত সাত আট জন বেঁটে কৃষ্ণকায় ভারতীয় মেঝেতে গোল করে আসনপিঁড়ি হয়ে বসে পিতলের কাপে কফি পান করছে। অপর প্রান্তে বৃদ্ধ ও আমি ছাড়া আর একজন চীনাকে দেখা গেল—সে নাক ডাকিয়ে দিব্যি ঘুমুচ্ছে। পরনে কালো তুলোর পায়জামা। গায়ের জামা আলগা হয়ে মেঝেতে ঝুলছে। ফলে তার তামাটে পেশল বুক ও বাহু বেরিয়ে পড়েছে। এখানকার কনকনে বাতাস বা ঠাণ্ডা কংক্রিটের মেঝে—কিছুতেই তার কোন অসুবিধে হচ্ছে না। সবই যেন তার থাকার পক্ষে অনুকূল।

ভারত মহাসাগরে তিন দিন অবস্থান কালে তার সঙ্গে আমার পরিচয়। টিকিট না থাকায় ক্যাপ্টেন তার সঙ্গে পশুর মত ব্যবহার

করল ; তারপর জাহাজের পেছন দিকে লোহার রেলিং-এ ছুঁড়ে ফেলে দিল। তার মনে এর কোন রেখাপাত ঘটে নি। যে-ই তাকে দেখতে আসছে তার দিকে তাকিয়ে ব্যঙ্গের হাসি হাসছে আর বেপরোয়া গান গাইছে।

কেউ হয়তো কৌতূহল ভরে জিজ্ঞেস করল, "কি করে জাহাজে জায়গা পেলেন মশাই ? এ যে তাজ্জব ব্যাপার !"

"জাহাজে জায়গা না পাওয়াটা যে আরো তাজ্জব ব্যাপার হত।" যেমন প্রশ্ন ঠিক তেমন তার ঔদ্ধত্য-ভরা জবাব।

ভারত ও বর্মা মুলুক থেকে মালয় উপদ্বীপে যেতে হলে চাই পাস-পোর্ট—যা ছাড়া কোনো জাহাজের টিকিট কেনা যেত না। তারপর রয়েছে কাস্টমসের কড়া নজরদারি। এবার নাবিকদের পর্যন্ত বিছানা-পত্র নিয়ে আসতে হয়েছে নিজের হাতে। তাই ঐ টিকিট-হীন, লুকিয়ে-আসা যাত্রী সবার কৌতূহলের উদ্রেক করেছিল।

এ ছিল আমার প্রথম সমুদ্র যাত্রা। তাই সারা দিনরাত জাহাজের পিছনদিকে কাটাতাম—সমুদ্রকে আরো ভালো করে দেখার জন্য। এর ফলে ঐ লোকটি হয়ে গেল আমার নিকটতম প্রতিবেশী। তার গান আমার মুখে ফিরতে লাগল। একবার তার মুখে সমুদ্রের গান শুনে প্রশ্ন করেছিলাম, "তুমি কি কখনও নাবিকের কাজ করতে ?"

"কেন নয় শুনি ? এই তো এখন নাবিক হয়েছি।"

চোরা চাহনি ছুঁড়ে দিয়ে সে তার শৃঙ্খলিত হাত দুটো তুলে এক-পাশ থেকে আর এক পাশে নাড়াল। তারপর হো হো করে হাসতে শুরু করল। মনে হল ও নিশ্চয় নেশাগ্রস্ত। তার থেকে আসল কথা বের করা কঠিন কাজ। আমিও তার প্রকৃত পরিচয় জানতে চাই নি। কিন্তু যখন আমাদের টাইফয়েড-নিবারক অফিসের নৌকায় একসঙ্গে তোলা হল, তখন বৃদ্ধ একে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল। আর গত রাতে দ্বীপে আহারকালে ঐ বৃদ্ধই খুব ভদ্রতা করে তার সামনে মাংসের ঝোলের খোলা টিন রেখেছিল। এসব কথা মনে পড়ায় আমি বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করি—"ঐ লোকটিকে চেনেন ? ও কি করে ?"

বৃদ্ধ আমার চেহারা আগাগোড়া দেখল মাত্র, কিন্তু কোন উত্তর দিল না। সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে বলল : "হাঁটার পক্ষে চমৎকার দিন।"

তারপর আমাদের ও বিপরীত দিককার দালানের মাঝখানে খোলা জায়গার দিকে পা বাড়াল। এ জায়গাটা দালানের চেয়েও প্রশস্ত। আমাদের দিকটায় পরিষ্কার বেলেমাটির ওপর ছাতার মত কয়েকটা গাছ শোভা পাচ্ছে। তাদের ছায়ায় জনা দুই নাকে সোনার নলক-পরা ভারতীয় রমণী কতকগুলো ইট জড়ো করে কড়া চাপিয়ে মাখন দিয়ে পিঠে তৈরী করছে। অন্য প্রান্ত শানবাঁধানো। ওখানে জলের কল দেখা যাচ্ছে। সাদা পোশাক-পরিহিত কয়েক জন ভারতীয় পশ্চিম দিকে মুখ করে প্রার্থনায় রত। আমাদের দিককার দুজন নারীর মত এঁরাও বোম্বে থেকে এসেছে এবং অন্য দালানে অবস্থান করছে। এটা তাহলে একটা ক্যাম্প; মোট দুটো পাকা বাড়ী ও একখণ্ড পোড়ো জমি। জমির চারপাশে লোহার রেলিঙের বেড়া আর দক্ষিণ দিকে তালাবন্ধ ছোট দরজা। আমাদের পেছনে এবং বামদিকে এমনি আরো অনেক ক্যাম্প রয়েছে।

ইতিমধ্যে একজন শ্বেতাঙ্গ ও দু'জন মালয়বাসী ডাক্তারকে আসতে দেখা গেল। তাদের হুকুমে দালানবাসী সবাইকে বালির ওপর কোমর অব্দি গা খালি করে দাঁড়াতে হল লাইনে। সবার আগে সাহেব এসে আমাদের খালি গায়ে লাঠি দিয়ে আঘাত করে পরীক্ষা করতে লাগলেন। তারপর মালয়বাসী ডাক্তাররা আমাদের প্রত্যেকের কব্জীতে বসন্তের টিকা দিলেন। আমার ঠিক পেছনেই ছিল সেই বুড়ো। সাহেব তার কাছে যেতেই তার মুখে-চোখে একটা করুণ ভাব ফুটে উঠল। সে মাথা নুইয়ে মালয় ভাষায় বলল : "সেলাম সাহেব।" তারপর ঐ ভাষায় কাকুতিমিনতি করতে লাগল তাড়াতাড়ি ছাড়া পাওয়ার জন্য। দেশে তার অসুস্থ ছেলে পড়ে রয়েছে। তাকে দেখা নিতান্ত দরকার। সে সম্পূর্ণ রোগমুক্ত—এই বলে সে অফিসারকে আশ্বস্ত করতে চাইল, যাতে তিনি সেদিনই তাকে ছেড়ে দেন। এসব বলার সময় তার নাক দিয়ে অনবরত জল ঝরছিল। তার অতি শীর্ণ বুক ভেদ করে যেন হাড়গুলো

বেরিয়ে আসতে চাইছে। লোলচর্মসার সেই বৃদ্ধের দিকে সাহেব বিন্দুমাত্র নজর দিলেন না। প্রথমে মাথা নিচু করে তার কথা শুনলেন, তারপর অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে এগিয়ে চললেন।

ঘরে যে জোয়ান ছেলেটি নাক ডাকাচ্ছিল তাকে এতক্ষণে আমাদের ঠিক পাশেই দেখা গেল। সাহেব দৃষ্টির অন্তরালে চলে যেতেই সে বৃদ্ধকে রাগানোর জন্যই যেন রেলিঙের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল: "চলে যাওয়াটা কোন সমস্যাই নয়। শুধু ঐ রেলিঙটা টপকাতে হবে।"

আমি হেসে বললাম: "তবে তুমি তা করছ না কেন?" সে দুহাত প্রসারিত করে গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিল: "কেন করব শুনি! পয়সার বিনিময়েও এর চেয়ে তোফা থাকবার জায়গা কোথাও মিলবে না।"

যে ভারতীয় আর্দালীরা জায়গাটা দেখাশোনা করত তারাই দুপুরের দিকে এসে রেলিঙের মধ্যেকার দরজাটা খুলে দিল। তারপর আমাদের ক্যাম্পের বাইরে এসে খাবার নিয়ে যেতে বলল। গতরাত যেখানে কাটিয়েছি সেটা একটা দোকানের মত মনে হল। রেশন সরবরাহের ভার পড়েছিল দু'তিনজন বেঁটে ভারতীয় মুসলমানের ওপর। এদের গায়ের রং না কাল, না গাঢ় বাদামী। অন্যান্য খাবার এবং টিনও তারা বিক্রি করছিল। আমাদের তিনজনের খাদ্যসামগ্রী এক সঙ্গে দেওয়া হল। যুবকটি আলু ও শুকনো মাছ আমার হাতে চালান করে দিয়ে নিজে চাল ও আনাজের ছোট্ট প্যাকেটগুলো নিল। তারপর মুখে প্রভুসুলভ ভাব ফুটিয়ে বৃদ্ধকে বলল: "আপনি বরং ঐ জ্বালানী কাঠের বোঝাটা নিয়ে আসুন। আশা করি, কিছু মনে করবেন না।"

জ্বালানী কাঠের বোঝা বইতে বৃদ্ধের পরিশ্রম হবে মনে করে ওকে আমার সঙ্গে বোঝা পাল্টে নিতে বললাম। কিন্তু যুবক কড়া দৃষ্টি হেনে বুঝিয়ে দিল আমি যেন নিজের চরকায় তেল দি। ফিরে যেতে যেতে সে বুড়োকে পরিহাসে জর্জরিত করতে লাগল: "মালিক লি, আপনাকে নিশ্চয় গত দশ বছর বা তারও বেশী এমন জঘন্য কাজ করতে হয় নি।"

বৃদ্ধ কোন উত্তর করল না। শুধু তার ফ্যাকাসে গাল দুটো আবার লাল হয়ে উঠল।

রান্নার বেলায়ও যুবকের মাতব্বরী অব্যাহত রইল। তার নির্দেশে গাছের তলায় বসে আলু ছাড়াতে বসলাম। সে তিনটে ইট দিয়ে উনুন তৈরী করে তার সামনে উঁচু হয়ে বসে ভাতের হাঁড়ি লক্ষ্য করছে। কাঠ কাটা, আনাজ ধোয়া ইত্যাদি খাটুনির কাজগুলো সে ঐ বুড়োকে দিয়ে করাচ্ছে। আর মাঝে মাঝে ঠাট্টা বা কটুকাটব্য করছে : "শুধু বয়সই হয়েছে, বুদ্ধি একটুও বাড়ে নি—না হলে ঐ ভাবে কেউ কাঠ কাটে ?"

বুড়ো শাকসবজী ধুতে গেলে আমি যুবককে এই নিষ্ঠুর ও কদর্য খেলা থামাতে বললাম।

"আপনি একে নিষ্ঠুর বলছেন ? আপনি কি জানেন আমাদের প্রতি ও কি রকম ব্যবহার করেছে ! শুধু ভাববেন না ও আমাদের গালাগাল করেই শান্ত হত। ওর চামড়ার জুতোর সরু অংশ দিয়ে আমাদের বিস্তর লাথি মারত।" এই বলে দেখানোর উদ্দেশ্যে সে তার পা স্টোভের দিকে বাড়িয়ে দিল।

তারপর তার মেজাজ ঠাণ্ডা হল—অন্তত বাইরে থেকে তাই মনে হল। সে বলল : "এখন তাকে জ্বালিয়ে কিছুটা আনন্দ পেতে চেষ্টা করি। পুরনো দুর্ব্যবহারের বদলা নিতে চাইলে অবশ্য..........." সে ঘৃণাভরে বুড়োর দিকে তাকিয়ে চুপ করল। আসল কথা জানার ইচ্ছে প্রবল ছিল। তাই অন্য একটা প্রশ্ন করলাম, "ও ওখানে কি কাজ করতে ?"

"ওকেই জিগ্যেস করুন। ওর নিশ্চয় স্মরণ থাকবে।" এই বলে সেই তরুণ মুখ কুঁচকে উনুনের আগুন উসকানোর দিকে মন দিল।

বারান্দায় ঠাণ্ডায় খাবার নিয়ে খেতে বসে গেলাম। মাঝখানে বসল ঐ যুবক—ঠিক যেন গৃহকর্তা। খেতে খেতে সে বুড়োর নানা দোষ ধরছে। বৃদ্ধ বেশ বুঝতে পারল যে সে ইচ্ছে করে তাকে অসুবিধেয় ফেলার চেষ্টা করছে। তাই ক্রুদ্ধ, জ্বলন্ত দৃষ্টি হেনে সে শুধু উত্তর দিয়ে যেতে লাগল।

"শ্রম না করে, বিন্দুমাত্র ঘাম না ঝরিয়েই, আপনি হাতের কাছে

খাবার তৈরী পেতে চান। একটা বেজীর যেমন রাজহাঁসের ডিমের দিকে লোভ থাকে, আপনারও তাই। কিছু জ্বালানী কাঠ কাটা বা আনাজপাতি পরিষ্কার করা—এমন কিছু সাংঘাতিক কাজ নয়। আপনাকে কেউই পাহাড়ের গা থেকে পাথর ভাঙতে বলেনি। মূল ভূখণ্ড ও দ্বীপস্থিত সহরের দিকে খাবার-কাঠি তুটো দেখিয়ে বলল: "ঐসব বাজে জায়গায় কিছু লোক আছে যারা শূয়োরের মত অলস কিন্তু পিঠে বুটের লাথি মারতে ওস্তাদ। আমরা কিন্তু মোটেই ওরকম নই। আরে ছিঃ ছিঃ, শুকনো মাছটা মোটেই সুবিধের হয় নি। বেজম্মা কাঁহাকা! এখানে তরকারী তেমন ভালো নয়—"এই বলে সে গজ্ গজ্ করতে লাগল।

সেদিন বিকালে বুড়োকে অস্থিরভাবে বারান্দায় পায়চারি করতে দেখা গেল। বাতাসে বাঁশীর শব্দ ভেসে আসতেই সে ক্ষণকালের জন্য থেমে চোখ আড়াল করে দূরের পানে তাকাল।

পরদিন সেই সাহেব ও মালয়ের ডাক্তারেরা আমাদের আবার পরীক্ষা করতে এলেন। বুড়ো আরো করুণভাবে অনুনয়-বিনয় শুরু করে দিল। সে জানাল: "যদি ছাড়া না হয় তবে তাকে যেন অন্তত অন্য ক্যাম্পে চালান দেওয়া হয়।" এবার সাহেব মুখ খুললেন। মুখ থেকে শুরু বেরুল—"না!" যুবকটি বুড়োর দিকে তাকাল কিন্তু কিছু বলল না। শুধু মুখ বাঁকিয়ে দেঁতো হাসি হাসল।

বুড়োর খুব অস্বস্তিতে কাল কাটছিল। তার খাওয়া-দাওয়া কমে গেল, পায়চারি করা বা সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকা—সব বন্ধ হয়ে গেল। শুধু আড়ালে বসে শান্তভাবে কাশতে লাগল। অপরদিকে যুবকের মেজাজ শরিফ হতে শুরু করল। সে প্রাচীরের ওপর উঠে থামের দিকে পিঠ দিয়ে বসত আর সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে বারংবার তারস্বরে গেয়ে চলত: "খাঁচায় বদ্ধ পাখি আমি; ডানা আছে, তবু উড়তে নারি।"

ঐদিন সন্ধ্যাবেলায় আমাদের মালপত্র সব ফেরত পেলাম। বুড়ো তার জিনিসপত্র সযত্নে আমার মালের কাছাকাছি রাখল। যুবক নিদ্রা

গেলে সে আমাকে বাইরে বারান্দায় ডেকে নিয়ে বসাল। তারপর মুখেচোখে তোষামুদির ভাব ফুটিয়ে বলতে শুরু করল : "তোমার জিনিসের ওপর নজর রাখতে ভুলো না। ও একেবারে গোল্লায় গেছে। "কোন কিছুতেই ওর বাঁধে না। ওর দিকে লক্ষ্য করলে বুঝবে— তোমার হাতের মুঠোয় যতটুকু জিনিস ধরে সেটুকুও ওর নেই।" সে একটু কাশল। "ভেবো না, আমি ওর ভয়ে ভীত। কিন্তু ও আমায় কলুষিত করুক—এ আমি চাই না। রেঙ্গুনে থাকাকালে ও কখনো হোটেলের দাম মেটাত না। প্রত্যেকে তা জানে। তুমি নিজের চোখেই তো ওকে জাহাজে আটক দেখলে। এটা প্রথম বারও নয়। আমি ওকে হাড়ে হাড়ে চিনি। আমাকে জ্ঞান দিতে আসে—ওর সাহসের বলিহারি।" আবার সে কাশল। "আমার বয়স পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে। তুমি কি মনে কর এখনও আমি জানি না যে আহার জোটাতে হলে খাটার দরকার। ও একটা বোকা-মূর্খের মত কথা বলেছে। ওর দিকে তাকালেই বুঝতে পারবে ওর এখন দরকার শুধু ভিখারীর পাত্র ও যষ্টি। বাচ্চা বয়সে ওর সম্বন্ধে আমার ধারণা ছিল ভাল। তখন ও ছিল উৎসাহী ও পরিশ্রমী। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রদোষ ঘটল—চুরি দিয়ে হাতেখড়ি। এখন সে একেবারে নষ্টচরিত্র। লালচুলওয়ালা শয়তানদের আইনে দোষী ও নির্দোষের একই বিচার কেন তা আমি বুঝে উঠতে পারি না। রোগ-টোগ থাকলে অবশ্য ভিন্ন কথা ; কিন্তু সুস্থ লোকদের এখানে আটকে রাখার কি কারণ থাকতে পারে? আমার ছেলেটা বাস্তবিকই মৃত্যুশয্যা নিয়েছিল। কিন্তু এখন তার অবস্থা কি জানি না।"

কথাগুলো বলেই সে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে কাশির দমক। সে থুতু ফেলতে ছুটল বালিয়াড়িতে।

সমুদ্রের বুকে এখন অন্ধকারের রাজত্ব। শুধু জেলে নৌকার লালবাতির ওঠানামা ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না। রেলওয়ে স্টেশনকে যে কয়েকটা গাছ আড়াল করেছে তাদের ফাঁক দিয়ে মাঝে মাঝে আলোর ঝিকিমিকি না খেললে দিনের বেলা ভুলেই যেতাম যে

দক্ষিণদিকে প্রধান ভূখণ্ড বর্তমান। বাঁদিকের দ্বীপটিতে রং-য়ের ছড়াছড়ি। প্রত্যেক গৃহে উজ্জ্বল আলো জ্বলছে। দিনের থেকে অনেক বেশী সুন্দর ও প্রাণবন্ত দেখাচ্ছে সহরটাকে। সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বুড়ো বলল—"এত কাছে, তবুও এত ভিন্ন···জগতে বড়ো ও ছোটর পার্থক্য অবশ্যই থাকবে······এরকম বিশ্রী জায়গায় তোমার আমার মত ভদ্রলোকের থাকা কষ্টকর হতে বাধ্য।"

ফেরী জাহাজ আলোয় ঝলমল করতে করতে জল কেটে চলেছে—ওপরে ও নিচে ডেকে যাত্রীদের পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। ওদের দিকে হাত উঁচিয়ে বলতে লাগলাম : "বলতে গেলে ঐ যাত্রীদের মধ্যে কেউ কেউ আছে যাদের অসুবিধেও কম নয়। কি নৌকায় কি ট্রেনে ঐসব তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের অবস্থা এই মুহূর্তে আমাদের মত ভালো নয়। দৃষ্টিটা আর একটু প্রসারিত করা যাক। আহারের আশায় কেউ ঐ ডেক থেকে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ছে না তা কি আপনি হলফ করে বলতে পারেন?"

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এল : "বটেই তো, বটেই তো। ওরা এর চেয়ে আর কি ভালো আশা করতে পারে? ওরা কেউ হল গিয়ে কুঁড়ের বাদশা, কেউ কুচক্রী, কেউ মাগীবাজ, আবার কেউ বা জুয়াড়ী, কেউ বা······"

আমি রেগে গিয়ে প্রশ্ন করলাম : "আপনি কি বলতে চান যে ওদের মধ্যে ভদ্রগোছের কেউ নেই? আমি নিজেই অনেককে জানি।"

হঠাৎ বুড়ো কথার মোড় ঘোরাল : "আছে, নিশ্চয় আছে। তবে আমি যা বলছিলাম, তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ যে অদৃষ্ট নিয়ে জন্মায়—এ তারই কথা। আর নসিবের জোরও চাই বৈকি!"

তার কথাবার্তায় বুঝলাম, বুড়ো শ্রেণী-সংস্কারে ঘোর বিশ্বাসী। সেই বিশ্বাসে চিড় ধরানো শক্ত ভেবে আর তর্ক বাড়ালাম না। হাই তুলে বললাম, "রাত হয়েছে, চলুন শুতে যাই।"

ভিতরে ঢুকে তার প্রথম কাজ হল বাক্স-পেঁটরার তালাগুলো অক্ষত আছে কিনা পরীক্ষা করে দেখা। তারপর সে ঝুড়িগুলোর চতুর্দিকের

দড়িটার দিকে তাকাল। উদ্দেশ্য—তার বাঁধন কেউ খুলেছে কিনা দেখা। সবশেষে ট্রাঙ্ক ও ঝুড়িগুলো এমনভাবে সাজিয়ে রাখল যাতে তালা ও গিঁটগুলো তার ঠিক পাশেই থাকে। তারপর মেঝেতে বিছানার ওপর বসে পড়ল। কিন্তু শোয়ার আয়োজন না করে পায়ের কাছে বিছানো বাক্সপেঁটরার পিতলের অংশগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া শুরু করল। কখনো সেগুলো গুণছে, কখনো দীর্ঘশ্বাস ফেলছে, কখনো বা কাশছে।

মাথার ওপর জোরালো আলো থাকায় চোখে ঘুম আসছিল না। তার ওপর বুড়োর অবিরাম, বিরক্তিকর কাশি। অবশ্য আলো থাকার ফলেই বুড়োর রাত্রিকালীন অবস্থা সম্বন্ধে একটা স্পষ্টতর ধারণা করতে পারলাম। মজার ব্যাপার এই যে—বুড়োর নাকডাকানিতে আপাত-দৃষ্টিতে মনে হল বুড়ো গভীর ঘুমে অচেতন, কিন্তু কারোর উঠে বাইরে যাওয়ার বিন্দুমাত্র আওয়াজ শুনলেই স্বপ্নচরের মত বুড়ো ধড়্মড়্ করে উঠে বসছে ও চারদিকে বড়ো বড়ো চোখ করে তাকাচ্ছে।

পরের দিন রাতে তার থেকে একটু দূরে শুয়েছিলাম। সেজন্য ঘুমও ভাল হয়েছিল। কিন্তু বুড়ো আরো অসুস্থ হয়ে পড়ল। কাশির দমকে ঘুম হল না। দ্বীপে অবস্থানের চতুর্থ দিন সকালে সাহেব আমাদের পরীক্ষা করতে এলেন। বুড়ো তার রুগ্ন দেহটাকে টেনে নিয়ে তাঁর পায়ের কাছে ফেলল। উঠতে গিয়েই মাথা ঘুরে পড়ে গেল। সেই যুবকটি আনন্দে আটখানা হয়ে চ্যাঁচাতে লাগল : "বেশ হয়েছে, ঠিক হয়েছে। ওর চেয়ে আমার মত গরিব হওয়া ও শান্তিতে সকাল পর্যন্ত ঘুমানো ঢের ভাল। আর আমার বোঁচকাবুচকিও নেই যে কেউ চুরি করবে এই ভয়ে মরব।"

পরে যখন বৃদ্ধের অবিরাম করুণ আর্তনাদ সবারই অন্তর স্পর্শ করেছিল, শুধু ঐ যুবকটি ভুরু কুঁচকে রেগে আমাকে বলেছিল : "ইচ্ছে হচ্ছে ওটাকে লাথি মেরে তাড়াই। সত্যি বলছি, আমি আর সইতে পারছি না।"

আমি তক্ষুনি ডাক্তার ডাকতে পরামর্শ দিলাম আর রক্ষীদের বললাম

তাকে রুগীদের ঘরে নিয়ে যেতে। এই অনুরোধ করা হলে উত্তর এল যে একজন ডাক্তার আসছে।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা—তবুও ডাক্তারের দেখা নেই। এদিকে রোগীর কাতরানি আরো বেড়ে গেল। যুবক এতক্ষণ চাপা স্বরে বকাবকি করছিল, এখন কাঁচা খিস্তিখাস্তা শুরু করে দিল। তার বিচারে সমস্ত লালচুলো শয়তান আর মালয়বাসীদেরও মরা উচিত।

সে-রাতে আবার জরুরি বার্তা পাঠানো হল। সেই মালয়বাসী ও ইংরেজ-ডাক্তার ভুর ভুর করে মদের গন্ধ ছড়াতে ছড়াতে এসে হাজির। রোগনির্ণয়ের পর তাঁরা জানালেন যে বুড়ো সাংঘাতিক রকমের নিউমোনিয়ায় ভুগছে। যদি রোগীর পয়সাকড়ি থাকে তবে তাকে পরদিন সকালে ফেরী-নৌকা করে পাশের দ্বীপে বড়ো হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হবে। অন্যথায় তার জন্য করার কিছুই থাকবে না। তাকে এখানেই অবিলম্বে মৃত্যুর প্রহর গুণতে হবে।

বৃদ্ধের দিকে ঝুঁকে বললাম তাকে হাসপাতালে যেতে পয়সা খরচ করতে হবে। পরের দিন সেখানে যাওয়ার মত যথেষ্ট অর্থসম্বল নিয়ে এসেছে কিনা জিগ্যেস করতেই সে রক্তবর্ণ, উদ্‌ভ্রান্ত দুটো চোখ বিস্ফারিত করে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। বার কয়েক পুনরাবৃত্তির পর মনে হল সে শুনেছে। শেষে সে তার কম্পিত হাত তুলে বাদামী রংয়ের চামড়ার বাক্সের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করল। তারপর হাত নামিয়ে নিয়ে চোখ বুজল। একটা কথাও বলল না। মুখটা তখনও হাঁ-করা। সে রীতিমত হাঁপাচ্ছে।

আমি সোজা হয়ে বসে পাশে দণ্ডায়মান সেই যুবকের দিকে তাকালাম। দেখে খুব উত্তেজিত মনে হল। সমানে মাথা চুলকোচ্ছে—কিসের দুশ্চিন্তা তাকে পেয়ে বসেছে। সে হঠাৎ ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ডাক্তারেরা চলে গেলে আমি বারান্দার খোলা হাওয়ায় বেরিয়ে এলাম। সমুদ্রের বুকে পিচঢালা অন্ধকার। কোনো আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে না। শুধু মাঝে মাঝে হঠাৎ আলোর ঝলকানি এসে বুঝিয়ে

দিচ্ছে যে পাশের দ্বীপে একটা সহর আছে। আর পাহাড়গুলো আকাশী রং গায়ে মেখে তারার মত দীপ্তি দিচ্ছে। দূরে যেখানে আকাশ সমুদ্রের সঙ্গে মিশেছে সেখানে বাতিঘরের ক্ষীণ আলো মিট্‌মিট্‌ করে চেয়ে আছে নির্জন সাগর-পানে। সেখানে কতক্ষণ ছিলাম খেয়াল নেই। হঠাৎ লক্ষ্য পড়ল, সেই যুবকটি দু'হাতে মাথা গুঁজে চুপ করে বসে আছে।

"এখানে কি করছ? রাত হয়েছে—ভেতরে যাচ্ছ না কেন?" কয়েক মুহূর্ত কাটার পর দু'হাত মুক্ত করে সে উত্তর দিল: "ভারী মজার ব্যাপার, যদিও একটা কথা ভেবে খুব কষ্ট পাচ্ছি।"

"কি কথা?" জিজ্ঞেস করে তার পাশে গিয়ে বসলাম।

"এক সময় সুমাত্রায় রবার গাছ কাটার কাজ নিয়েছিলাম। যে নড়বড়ে চালায় আমরা বাস করতাম তাতে ছিল বেজায় ইঁদুরের উপদ্রব। দিনমানেও তাদের হাত থেকে রেহাই ছিল না। অবসর পেলেই লাঠি দিয়ে ওগুলোকে মারতাম। কিন্তু ওরা ছিল রীতিমত ধূর্ত। তাদের মারা ছিল ভারী শক্ত। বিশেষতঃ যখন তারা মনের আনন্দে চারদিকে লাফালাফি করত বা গর্তে গা ঢাকা দিত। একটা মারতে পারলেই নিজেকে ধন্য মনে করতাম। মনোকষ্টের কারণটা বলে ফেলি। একদিন হয়েছে কি ঘরে ঢোকামাত্র মেঝের ঠিক মাঝখানে একটা ইঁদুরকে দেখলাম। তাড়াতাড়ি লাঠি তুলে নিয়ে দরজা ও গর্তের মুখগুলো বন্ধ করে দিলাম। বাছাধন, এবার যাবে কোথায়? খুবই উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম। ইঁদুরের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকার দরুণ খেয়ালই ছিল না কোথায় পা ফেলছি। একটা শূন্য বাটির ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লাম; মনে মনে বললাম: আচ্ছা মুস্কিল তো! কিছুক্ষণ পরে আমারই অবাক হবার পালা: বেচারাতো নড়ছে না। হয়তো বদ্ধ কালা হবে। লাঠির এক খোঁচা দিলাম—ও উল্টে পড়ে গেল। এত দুর্বল হয়ে পড়েছিল যে উঠে দাঁড়াতে অসম্ভব সময় নিল। দৌড়াতে চেষ্টা করল কিন্তু পারল না। নিশ্চয় কোন রোগে ভুগছে। আমি মারার জন্য লাঠি ওঠালাম। কিন্তু কি কারণে জানি না আমার

সব শক্তি হারিয়ে ফেললাম। ততক্ষণে আমার সব উৎসাহ নিভে গেছে; অবশ্য ওটাকে মারলেও যে আমার কিছু আসত-যেত তাও নয়। শুধু চেয়েছিলাম একটু বেশী আনন্দ কুড়োতে।”

সে উঠে পায়চারি শুরু করে দিল। আমি বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু অনেকক্ষণ ঘুম এল না। প্রথমে দূরের দক্ষিণ ভারতীয়দের ক্যাম্প থেকে বিরহের সংগীত কানে ভেসে এল। কিন্তু তাও ক্রমে মিলিয়ে গেল। উঠানের গাছগুলোতে নিশাচর পাখির পাখার ঝটপটানির শব্দ কানে এল। তীরে আছড়ে-পড়া ঢেউয়ের শব্দ কখনো মৃদু, কখনো প্রবল বোধ হল।

তখন মাঝরাত। হঠাৎ দেখলাম যুবকটি উঠে মেঝের ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছে। সে কয়েকবার কাশল। যখন নিশ্চিন্ত হল যে কেউ নড়াচড়া করছে না, তখন গিয়ে উপস্থিত হল সেই অসুস্থ বৃদ্ধের কাছে। তারপর নতজানু হয়ে তার গায়ে কি যেন হাতড়াতে শুরু করল।

আমি ভাবলাম : দেখি তুমি কত নিচে নামতে পার। এর শেষ কোথায় দেখার আশায় স্থির হয়ে শুয়ে রইলাম। কিছুক্ষণ পরে তার হাতে দেখতে পেলাম সুতোয় গাঁথা কিছু বস্তু। সেগুলো সে বাদামী রঙয়ের চামড়ার স্যুটকেসের তলায় ঢোকাতে লাগল। সেগুলো যে চাবি তা বোধগম্য হওয়ার আগেই দেখি স্যুটকেস খোলা। তারপর চট্ করে সে একটা পয়সার থলে বের করে আনল যেন ঐ জায়গাটা তার আগের থেকেই জানা। আমি শিউরে উঠলাম এই ভেবে যদি সে সব পয়সা নিয়ে নেয়, তবে বুড়োর পক্ষে তা মারাত্মক হবে। সে কিন্তু থলে থেকে কোন টাকা-পয়সা নিল না; বরং পকেট থেকে কিছু একটা জিনিস বের করে থলের মধ্যে রেখে দিল। তারপর বাক্সে থলেটা রেখে সেটা বন্ধ করে, তালা লাগিয়ে, চাবির গোছা রোগীর পকেটে পুরে দিল। শেষে হামাগুড়ি দিয়ে স্বস্থানে গিয়ে চোখ বুঁজল। আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারলাম না। সে কি করতে চায়? আমি ইচ্ছে করে পাশ ফিরে শুলাম। বুঝিয়ে দিলাম আমি ঘুমুই নি। সে মাথা তুলে আমার দিকে একবার তাকাল ও পরমুহূর্তে আবার শুয়ে পড়ল।

পরদিন সকালে সাহেবরা বৃদ্ধের অর্থসম্বল সম্বন্ধে খোঁজ নিতে এক চীনাকে পাঠালেন। সে তার নোট-বইয়ে বিশদ করে সব টুকে নিল। তারপর নেহাত-ই নিশ্চিন্ত হবার জন্য সে বৃদ্ধকে থলের টাকা-পয়সা গুণে দেখতে বলল। তাতে প্রদত্ত অর্থের পরিমাণের ব্যাপারে সে নিজেও নিঃসন্দেহ হতে পারবে। পাশে দাঁড়িয়ে সেই যুবক—তার দেঁতো হাসি আমার নজরে এড়ায় নি। কিন্তু এ হাসির সঙ্গে আগের হাসির অনেক তফাত। ধূর্তামি ও বিদ্রূপ মুছে গিয়ে সেখানে প্রশান্তির ছাপ বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

অসুস্থ বুড়ো মাথা তুলে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে ফেলল: "ওরা আমাদের নিয়ে যা-নয়-তাই করছে। একে তোমরা মহামারী নিয়ন্ত্রণ বলবে? চেয়ে দেখ, ওরা আমার কি হাল করেছে? তার চেয়েও বড়ো কথা—সুস্থ অবস্থায় ওরা আমাদের দেশে পাঠিয়ে দেবে না। আর এখন অসুস্থ অবস্থায় তীরে পাঠিয়ে দেওয়ার গরজ কত! এই ভাবে আমাদের বোকা বানিয়ে চলেছে।"

এদিকে যুবক নিজের মনেই তিক্ত সুরে বলে চলেছে—"ঐ লাল-চুলওয়ালা শয়তানগুলো যে নোংরার একশেষ তা বলাই বাহুল্য। আর ঐ বুড়ো আহাম্মকটার কথা বলছ। ওর অসুখ না হলে এক চোট দেখে নিতুম—ওর বাপ-ঠাকুরদার নাম ভুলিয়ে দিতুম।" একটা সিগ্রেট মুখে পুরে সে চুপ করল।

হঠাৎ আমার মাথায় বিদ্যুতের মত খেলে গেল গতরাতের কথা।—যখন সে আগের দিন রাতে চুরি করা টাকা ফেরত দিচ্ছিল। আমি যে সব জানি তা ইঙ্গিতে প্রকাশ করে ফেললাম: "গত রাতের ব্যাপার তো? আমি সব দেখেছি।"

সিগ্রেট টানতে টানতে সে অতীত দিনের অনেক কথাই অকপটে বলে গেল। আগে তাকে কোন ব্যক্তিগত প্রশ্ন করলে সে ঠাট্টাচ্ছলে তার উত্তর দিত। এখন আর সেরকম নেই। সে স্বীকার করল যে এই করেই সে খায়। তার বিচারে এ বেশ মজা।

সিগ্রেটের ছাঁই ঝাড়তে ঝাড়তে সে বলল: "কিছু কিছু লোক

আছে যারা বেজায় আত্মম্ভরী। কিন্তু তাদের বড়াই করার মত কি আছে বলুন? বাকী সবাইয়ের চেয়ে তাদের নিশ্চয় একটা বেশী নাক বা চোখ নেই। হয়তো তারা একটু বেশী ভালো পোশাক-আসাক পরে বা তাদের পকেটে একটু বেশী পয়সা আছে। এসব লোকদের আমি মোটেই সহ্য করতে পারি না। এই ব্যবসায় যখন আমি প্রথম হাত পাকাই তখন এটাকে মোটেই গুরুত্ব দিইনি। বরং নেহাত কৌতুকবশেই এটা গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু পরে ট্রামে, ভিড়ের মধ্যে বা সর্বত্র ঐসব লোকদের দেখে ভাবতাম : তোমাদের এত দেমাক কিসের জন্য? রোসো, তোমাদের কিছুটা জব্দ করি। ব্যাপারটা একটা সত্যিকারের তামাসা হয়ে দাঁড়াল। আমি লোভ সামলাতে পারলাম না। আফিং-এর নেশার মত পেয়ে বসল। হাতঘড়ি বা কলম সাফাই করতে গিয়ে হয়তো মনে হয়েছে কাজটা ভালো হচ্ছে না। তার জন্য যে অপকর্ম বন্ধ হয়েছে তা নয়।”

হেসে জিগ্যেস করলাম : “এ যাত্রায় কেমন আমদানী হ'ল?”

“আরে দূর, দূর, একেবারে দেউলে হয়ে গেছি?”

“দেশে ফিরে কি করবে ঠিক করেছ?” তার জন্য উদ্বিগ্ন না হয়ে পারলাম না। ভ্রূ-ভঙ্গি করে স্বভাবসুলভ ব্যঙ্গ হাসি হেসে বলল : “আবার নতুন করে সব শুরু করতে হবে।” তারপর সিগ্রেটে একটা সুখটান দিয়ে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

“তীরে পৌঁছেই আমাকে কাজ শুরু করতে দিয়ে তারা মিত্রতার হানি ঘটাতে চায় না। কিছুদিন তারা আমাকে তাদের সঙ্গে থাকতেও আমন্ত্রণ জানাতে পারে।” ঠাট্টার সুরে কথা কয়টি বলে সে চলে গেল।

অবশেষে দ্বীপ ত্যাগ করার দিন উপস্থিত হল। চূড়ান্ত পরিদর্শনের জন্য সমুদ্রতীরে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ালাম। সূর্যের তেজ প্রখর হলেও যাওয়ার অনুমতি পেয়ে সবার আনন্দ আর ধরে না। ফেরী নৌকায় উঠব-উঠব করছি এমন সময় পাশের দ্বীপ থেকে পুলিশ এসে সেই যুবকটিকে মোটর বোটে ধরে নিয়ে চলল। কেবিনের দরজার ফাঁক দিয়ে মাথা বের করে সে পরম উৎসাহে হাত নেড়ে নেড়ে বিদায়

জানাল ; মুখে সেই দেঁতো হাসি। ভাবখানা এই যেন তাকে বিদায় জানাতেই আমরা এবং ভারতীয়েরা সমুদ্রতীরে মিলিত হয়েছি।

হাওয়ার নামগন্ধও ছিল না। সেই মোটর বোটের চতুর্দিকে ছিল ফিকে সবুজ জলরাশির অপার বিস্তার। আর তা সূর্যের প্রচণ্ড তাপে দগ্ধ হয়ে টগ্‌বগ্‌ করে যেন ফুটছিল।

অনুবাদ : ঋভুরঞ্জন রায়

দ্বিতীয় প্রজন্ম



মাও তুন

আধুনিক চীনা সাহিত্য জগতে লু সুনের পরেই মাও তুনের (১৮৯৬—১৯৮১) প্রসিদ্ধি। কথা-সাহিত্যিক হিসেব তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয়। পুরনো চীনা সমাজের সমস্ত পাপের বিরুদ্ধে তিনি কশাঘাত হেনেছেন। মাও তুন তাঁর ছদ্মনাম, আসল নাম সেন ইয়েন-পিঙ। ১৯১৯ সাল থেকেই 'নতুন সাহিত্য' আন্দোলনে যোগ দেন। সাংহাই থেকে প্রকাশিত 'ফিক্‌শান' পত্রিকার সম্পাদক হন। ১৯৩৭-৪৫ সাল পর্যন্ত লিটারারী ফ্রণ্ট নামক্ পত্রিকা সম্পাদনা করেন। তাঁর অসংখ্য উপন্যাসের মধ্যে 'রেইনবো'; 'দ্য কাংকার', 'করোশান', 'বিফোর এণ্ড আফটার দ্য চিংমিং ফেসটিভ্যাল' বিখ্যাত। তিনি বহু ছোটগল্প রচনা করেছেন। ১৯৪৯ সালে চীনের সংস্কৃতি মন্ত্রী হন; ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত ওই পদে ছিলেন। জাতীয় মুক্তির বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় পদে পরে অধিষ্ঠিত থেকেছেন। সংগ্রামী লেখক হিসাবে তিনি তরুণ লেখকদের ও পাঠকদের কাছে শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন।

সে কাগজের পাতাটা সমান করে নিয়ে কলমটা হাতে তুলে নিল। যেখানে সে বসে আছে সেখান থেকে দরজাটা যদিও দেখা যাচ্ছিল না, দরজাটা নিঃশব্দে খুলতে শুনলো। পদশব্দে বুঝতে পারলো, তার ছেলে সিয়াঙ ঘরের ভেতর এসেছে।

লেখার টেবিলের উল্‌টো দিকে টানা আলমারীর ওপরের ঘড়িতে সময় বলছে এগারোটা বেজে বারো বা তেরো মিনিট। আবার কি ঘড়িটা স্লো যাচ্ছে? সে ভাবলো এবং পেনটা নামিয়ে রাখলো।

"বাবা, আজ বিকেলে আমাকে বাণিজ্যভবনে যেতে হবে।"

"আচ্ছা"—সে বললো, তার মনটা তখন সে যে রচনাটা লিখছে, তাতে নিবদ্ধ। একটা বাগ্‌ধারা তার মাথায় এসেছে এবং সেটা নিয়েই সে ভাবছিল। তার ছেলে উত্তর না পেয়ে বেরোবার জন্যে ঘুরে দাঁড়ালো।

তারপরে সে ভাবলো : বাণিজ্যভবনে, এ্যাঁ ? তার ছেলের কথাটা শেষ পর্যন্ত মনে রেখাপাত করলো। গত কালই তার স্ত্রী অভিযোগ করেছে যে সিয়াঙ যখন-তখন তার ইস্কুলের বন্ধুদের সঙ্গে বেরিয়ে যাচ্ছে। মাঝেমধ্যে তারা ওয়েন মিয়াও পার্কের মত দূর দূর জায়গায় হেঁটে চলে যাচ্ছে—যাতায়াতে প্রায় সাত মাইল। সিয়াঙের মায়ের ধারণা তার বয়সের ছেলের পক্ষে এটা একটু বাড়াবাড়ি।

"বাণিজ্যভবনে কি করতে যাচ্ছ ?"—তার বাবা জিজ্ঞেস করলো।

"একটা মিটিং করতে।"—একটা চাপা হাসির রেখা ছেলেটির ঠোঁটের কোণে খেলে গেল।

ওহো। এখন তার স্মরণ হলো যে আজই তো ত্রিশে মে।*

তাহলে তুমি ইতিমধ্যেই সেই পর্যায়ে পৌঁছেছ যখন প্রচার অভিযানে যোগ দেওয়া চলে।—সে মনে মনে ভাবলো। তার ছেলের মুখটা খুঁটিয়ে দেখলো।

"আমি আরও ছু-জনের সঙ্গে যাচ্ছি। ছু'জনেই আমার ইস্কুলের বন্ধু"—বললো সিয়াঙ। সে এত কথা বাবাকে বলতো না যদি না তার আশঙ্কা থাকতো যে বাবা তাকে একা যেতে দেবে না। তার 'ব্যক্তিগত ব্যাপারে' বরাবরই সে অত্যন্ত চাপা।

"তুমি পথ চেনো তো ?"

"হ্যাঁ। আমি যে ছেলেদের সঙ্গে যাচ্ছি তারা অন্তত চেনে।"

"ঠিক আছে। কিন্তু হেঁটে যেতে পারবে না। বাসে করে যাবে আসবে। আমি তোমাদের বাসভাড়া দিয়ে দেবো।" সে আবার রচনাটায় মনোনিবেশ করলো। শুধু আর কয়েকটা শব্দ লিখলেই এই অনুচ্ছেদটা শেষ হয়ে যায়। তার পরে দুপুরের আহারে বসতে পারে।

সে লিখে চললো, শুনতে পেলো পাশের ঘরে বই-এর তাক থেকে তার ছেলে একটা বই নিলো এবং সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল।

* ১৯২৫ সালের ত্রিশে মে সাংহাই-এর বৃটিশ অধিকৃত এলাকার সুতা-কল শ্রমিকদের ধর্মঘটের সমর্থনে শ্রমিক ও ছাত্ররা মিছিল বের করলে, ইংরেজ পুলিশ গুলি চালায়। বহুজন নিহত ও আহত হয়।

অনুচ্ছেদটা শেষ হলো, সে পড়ে দেখলো। মাথা নেড়ে কলমটা লেখার টেবিলের ওপর রাখলো।

সিয়াঙকে বাস ভাড়া দেবার জন্যে দুটো টাকা নিয়ে সে-ও নিচে নেমে গেল।

সিয়াঙ একটা চেয়ারে বসে, তার মুখে ধূর্ত হাসি—সে যখন মনে ভাবে বড়োরা কোনো সামান্য ব্যাপারে অতিরিক্ত হৈচৈ জুড়েছে, তখন সে এই হাসিটা মুখে লাগিয়ে রাখে।

সিয়াঙের মা জামা ইস্তিরি করছিলো। "বাণিজ্যভবনের বাইরে একটা জনসভায় সিয়াঙ যেতে চাচ্ছে। তুমি কি ওকে যেতে বলছো?" —সিয়াঙের মা জিজ্ঞেস করলো। "ও জানে তুমি 'না' বলবে না, তাই তোমাকেই আগে বলেছে। আমার মনে হয় ওর যাওয়া উচিত নয়: এতে বিপদ ঘটতে পারে। কিন্তু ও বলছে তুমি আগেই সম্মতি দিয়েছো।"

"আমার মনে হয় না বিপদ কিছু ঘটবে।" কথা বলতে বলতে বাপ ছেলের দিকে এগিয়ে গেল এবং খুব খুঁটিয়ে ছেলেকে দেখলো। তাহলে প্রচারের অভিযানে যোগ দেবার মতো বয়সে তুমি পৌঁছে গেছ—সে ভাবলো। শুধুই কি একটা তামাশা দেখার জন্যে, নাকি সত্যিই তুমি······?

"ধরো, যদি তারা তোমাকে গ্রেপ্তার করে? কি বলবে তুমি?" মা সিয়াঙকে জিজ্ঞেস করলো।

"আমি বলবো আমি শুধু দেখতে এসেছিলাম"—ছেলে উত্তর দিলো। আবার সে ধূর্তের মতো হাসলো।

মা দ্রুত বাপের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো, "দেখো, অভিযোগের উত্তর ওদের সব তৈরীই। ওরা সংগঠিত আমি বলছি। এমন কি ওরা পুলিশের সঙ্গে একটা মারামারিও চাইছে।"

বাবা কিছুই বললো না। তার ছেলে নীরবতা ভাঙলো।

"ওরা আমাদের বেশী টাকা পয়সা নিয়ে যেতে বারণ করেছে। ওরা বলেছে কোনও কাগজ বা পেন্সিলও সঙ্গে এনো না।"

"তার মানে, ইস্কুল থেকে তোমাদের যেতে বলেছে?"—বাপ জিজ্ঞেস করলো।

"না।"

"বেশ, তা হলে কে বলেছে? বাণিজ্যভবনে আজ একটা জনসভা হবে, জানলে কি করে?"

"ইস্কুল থেকে সরাসরি ওদের যেতে বলেনি, কিন্তু ইস্কুল ওদের যেতে উৎসাহ যুগিয়েছে। ওদের ইস্কুলের খাতায় অনুপস্থিত বলে ঢেঁড়া দেওয়া হবে না। কয়েকজন মাস্টারমশাই-ও যাচ্ছেন।" —বললো মা।

"কিন্তু আমরা একসঙ্গে যাচ্ছি না। আমাদের মাস্টারমশাইরা ভিন্ন দলে যাবেন।"

"আচ্ছা।" বাবা মা'র দিকে তাকালো। সিয়াঙের মা অবশ্যই ঠিক ঠিক আন্দাজ করেছে। ছাত্ররা পুলিশের সঙ্গে একটা হাঙ্গামা চাইছে। আর অন্য কিই বা ঘটতে পারে? এটা কুওমিনতাঙ চীন, ১৯৩৬!

ইস্তিরি করা শেষ করে মা বৈদ্যুতিক ইস্ত্রিটা নিভিয়ে দিল। সে বললো, "এখনো আমার মনে হচ্ছে ওর যাওয়া উচিত নয়, ও খুবই ছেলেমানুষ।"

"আমাকে একটু ভাত আর ডিমভাজা দাও, দেবে, না, কি?"—ছেলে তাড়া লাগালো। "আমাদের দলটা বারোটায় একত্রিত হবে।"

"এখনও বারোটা বাজেনি?"—বাবা জিজ্ঞেস করলো। সাধারণত মধ্যাহ্নের আগে সিয়াঙ দুপুরের খাবার খেতে আসে না।

মা বললো, "ইস্কুলে ওদের একঘণ্টা আগে ছেড়ে দিয়েছে, আর আগে ছাড়া হয়েছে বলে খাতাপত্তরে দেখানো হবে না।"—বলে সে রান্নাঘরে ঢুকে গেল।

ছেলের দিকে তাকিয়ে থেকে বাবা এগারো বছর আগের ত্রিশে মে-র দিনটা স্মরণ করছিল। তখন সিয়াঙের বয়স মাত্র দু-বছর। সবে ও হাঁটতে শুরু করেছে। সেদিন সন্ধ্যেয় নানকিং রোড রক্তে রাঙা হয়ে গিয়েছিল। এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে সমস্ত দোকান বন্ধ রাখার

দাবিতে বাণিজ্যভবনের সামনে এক জনসভায় সিয়াঙের মা দু-জন বান্ধবীর সঙ্গে গিয়েছিল। ফিরে এসে সে শিশুকে দুইহাতে জড়িয়ে ধরেছিল। অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে বলেছিল, "সমাবেশে আমাদের অংশটার পিছনে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্ররা ছিল। অশ্বারোহী পুলিশ আমাদের সামনেটা ছত্রভঙ্গ করে দিল; অনেক বাচ্চাকে মাড়িয়ে চলে গেল। আমি একটা ছেলেকে দেখলাম—বারো কি তেরোর বেশী বয়স হবে না—ঘোড়ার খুরের নিচে পড়ে গেল। ভাগ্য ভালো, আমাদের এক স্বেচ্ছাসেবী ঠিক সময়ে ওকে তুলে নিয়েছিল। আমি সিয়াঙের কথা ভাবছিলাম। আশাকরি ও যখন বড়ো হবে, তখন পৃথিবীটা অন্যরকম হয়ে যাবে।"

তারপরে যতবারই মিছিল হয়েছে, প্রত্যেকবার ইস্কুলের বাচ্চাদের চাবুক মারা হয়েছে আর ঘোড়ার খুরের নিচে দলিত করা হয়েছে, মা বাড়ি ফিরে সিয়াঙকে বুকে জাপটে ধরেছে। প্রত্যেকবারই আবেগ-ভরে সেই এক প্রার্থনা উচ্চারণ করেছে।

১৯৩৫ সালের ১৬ ই ডিসেম্বর* পিকিঙে মিছিলে আহত ছাত্রদের কিছু ছবি সিয়াঙের মা সম্প্রতি দেখেছিল। সে সিয়াঙকে সেই ছবিগুলো দেখিয়েছিল। বলেছিল, "সিয়াঙ, হাতে ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা ছেলেটার ছবিটা দেখ্, ও তো তোর চেয়ে খুব বড়ো না। আহা! কি করে ওরা বাচ্চা-দেরকে এরকম পশুর মতো মারতে পারে?"

আর এখন সিয়াঙ-ও প্রচার অভিযানে যোগ দিচ্ছে। অসংখ্য শিশু, যারা এগারো বছর আগে সিয়াঙের বয়সী ছিল, আজকে তার মতোই, উত্তেজনায় আর কৌতূহলে ভরা জীবনে প্রথম একটা মিছিলে যোগ দিতে যাচ্ছে।

যদিও এইসব ভাবনা বাবাকে বিচলিত করেছিল, তবু কিভাবে যে কিছুটা স্বস্তিও বোধ করছিল।

* ১৯৩৫ সালের ষোলই ডিসেম্বর চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে ত্রিশ হাজারেরও বেশী ছাত্র বিশাল মিছিল নিয়ে চিয়াং কাই শেকের কাছে "গৃহযুদ্ধ বন্ধ করতে জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ গড়ে তোলার' দাবি জানায়।

বাপ আর মা বসে বসে সিয়াঙের গব্‌গব্‌ করে ভাত ও ডিম ভাজা খাওয়া দেখছিল। বাবার মনে হল ছেলেকে কিছু বলা উচিত; কিন্তু কিভাবে যে শুরু করবে তা সে বুঝতে পারছিল না। কিভাবে সে ছেলেকে বোঝাবে? সিয়াঙ তো আসলে শিশু মাত্র।

ছেলের মা আগে কথা বললো। "সভার শেষে যদি কোনও কুচকাওয়াজ হয়, আমি চাই না তুমি তার সঙ্গে যাও। কথাটা কানে গেছে, সিয়াঙ?"

সিয়াঙ একাগ্রভাবে গলা দিয়ে ভাত নামাচ্ছে।

"তোমার মা ঠিকই বলছে"—বাবাও সম্মতি জানালো।

"তোমার ফুসফুসের অসুখটা সদ্য সেরেছে। অতিরিক্ত হাঁটাহাঁটি তোমার পক্ষে ভালো হবে না। যদি তারা তাড়া ক'রে মিছিলকে শহরের অন্য কোনও অংশে ছত্রভঙ্গ করে দেয়, যেসব জায়গা তুমি চেন না, বলা তো যায় না, তুমি হারিয়ে যেতে পারো। বাড়ি আসার পথ কি করে খুঁজে পাবে?"

ছেলে দ্রুত খেয়ে যাচ্ছিল, ধূর্ত চাহনি তার চোখে। কিন্তু এখন সে দুঃখিতভাবে প্রত্যুত্তর দিল, "তোমরা ভয় পাচ্ছ কেন? আমি যদি কোথায় আছি ঠিক না করতে পারি, আমি তো লোককে জিজ্ঞেস করতে পারি! আমি তো একটা রিকশায় করেও ফিরতে পারি!" তার পরে সে হাত বাড়িয়ে বললো, "আমার বাস-ভাড়া?"

বাবা তাকে দু'টাকা দিতে সিয়াঙ বেরিয়ে গেল। সিয়াঙ ফটক দিয়ে বেরিয়ে গলির শেষ মাথা দিয়ে চলে যাওয়া পর্যন্ত মা দরজায় দাঁড়িয়ে থাকলো।

ঘরের মধ্যে ঘুরে আসতে আসতে মা তিরস্কারের ভঙ্গিতে সিয়াঙের বাবাকে বললো,

"ওকে যেতে দেওয়া তোমার উচিত হয় নি।"

"এবারে আমরা যদি ওকে যেতে না দিতাম তা হলে পরের বার ও আমাদের না বলেই যেত।"

"কিন্তু ও এতো ছেলেমানুষ।"—মা দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

বাবা মাথা নেড়ে একটা সিগারেট ধরালো। তার মন অসমাপ্ত রচনাটি সম্পর্কে ভেবে চলেছে। আজ রাত্রেই লেখাটি দিতে হবে।

দুপুরের খাবার সময় বাড়িটা মনে হল অসাধারণ রকম শান্ত।

যেন অনেকটা স্বগতোক্তির মতো মা বললো, "প্রথমে আমি ভেবেছিলাম আমিও ওর সঙ্গে যাবো। ভেবেছিলাম সভার পরে যদি মিছিল হয়, আমি ওকে বাড়ি নিয়ে আসবো। তারপরে ভাবলাম, আমার না যাওয়াই ভালো। কেননা অনেক লোকের সঙ্গে দেখা হত সন্দেহ নেই, যারা আমাদের চেনে। এবং সম্ভবত আমার সঙ্গে ফিরে আসতে ও রাজি হতো না......"

বাবা সশব্দে হাসলো। "ঠিকই তো, আসতে চাইতো না। ও জনগণের সঙ্গে এগিয়ে যেতে চায়—মায়ের আঁচলে বাঁধা হয়ে থাকতে চায় না।"

"কিন্তু ও তো কিছুই বোঝে না। নিজের হৃদয়োচ্ছ্বাসে যা খুশী ভাবছে। এটা তো অন্ধ সাহস। তোমার ওকে শেখানো উচিত।"

"কি ভাবে? কি শেখাবো ওকে? সম্ভবত ও তা বুঝবে না।" আবার সে উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠলো, কিন্তু মুখের চামড়ায় টানটান গাম্ভীর্য।

দুপুরের খাবার বাকি সময়টুকুতে তারা সিয়াঙ সম্পর্কে আর কিছু কথাবার্তা বললো না।

একটা সিগারেট ধরিয়ে ধীরে ধীরে পায়চারী করতে করতে সিয়াঙের বাবা কয়েকবার থেমে স্ত্রীর দিকে তাকালো। উত্তেজনায় তার দু-গালে রক্তোচ্ছ্বাস। শেষ পর্যন্ত সে এগিয়ে এসে স্ত্রীর মুখোমুখি দাঁড়ালো। বললো, "আমার ধারণা সিয়াঙের ছেলের যখন ইস্কুল যাবার সময় হবে, তখন জনসভা আর বিপদ-জনক থাকবে না। চীনের বিপ্লব হল দীর্ঘ কঠিন সংগ্রাম।"

"আমি জানি সিয়াঙ খুবই সাহসী হয়ে উঠবে। ও যদি বিশ বছরের ছেলে হতো আমি তাহলে এতটুকু চিন্তা করতাম না। কিন্তু ও যে মাত্র তেরো! মনে হয় ও এখনই কুড়ি বছরের হয়ে যাক!"

"চিন্তা কোরো না। কখনো কখনো দিনগুলো অত্যন্ত দ্রুত কেটে যায়।"

বাবা ও মা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসলো। তাদের চোখদুটো

একটু ভেজা-ভেজা। তারপরে তাদের হাসিতে আরো সুখের, স্বাভাবিক ছোঁয়া লাগলো।

তাদের অজান্তেই কখন বিকেল শেষ হল। কিন্তু ছ'টা বেজে যাবার পরে সময় আবার অদ্ভুতভাবে চলতে লাগলো—কখনো মনে হয় কাটতে চাইছে না, কখনও মনে হয় প্রায় দৌড়োচ্ছে। সিয়াঙের মা ভাবতে লাগলো কোথায় কোথায় খোঁজ নেওয়া উচিত আর চিন্তা করতে লাগলো সাহায্য করার জন্যে কাকে কাকে বলবে।

রাত্রি আটটা বাজলে বাবাও চিন্তিত হল। এক বন্ধু দেখা করতে এলেন, জনসভায় বিলি করা কিছু ইস্তাহার হাতে। তিনি জানালেন পুলিশের সঙ্গে সভায় কোনও হাঙ্গামা হয়নি। শুনে সিয়াঙের মা কিছুটা আশ্বস্ত বোধ করলো।

কিন্তু সে অন্য নানা দুশ্চিন্তার বিষয় নিয়ে ভাবতে লাগলো। "সিয়াঙ কি পথ হারিয়ে ফেললো? যদি গাড়ি-চাপা পড়ে গিয়ে থাকে?" একজন মায়ের কাছে তার সন্তান সবসময়েই সদ্যোজাত মেষশাবকের মতোই অসহায়।

ন'টা পনেরোর পরে শেষ পর্যন্ত ছেলে বাড়ি ফিরলো। যে মুহূর্তে সে ঘরে ঢুকে টেবিলের ওপর ইস্তাহারগুলো দেখতে পেল তৎক্ষণাৎ সে চীৎকার করে বললো, "এগুলো পেলে কোথায়?" সে তার আনা ইস্তাহারগুলো পকেট থেকে বের করলো।

তার বাবা-মা হাসিতে ফেটে পড়লো, মা দু'হাত দিয়ে ছেলেকে জড়িয়ে ধরলো। "মিছিল কেমন হল? মাকে সব গুছিয়ে বলো।"

"আমরা কুচকাওয়াজ করে ত্রিশে মে শহীদদের সমাধিতে গেলাম। তারপরে আমরা নর্থ রেলওয়ে স্টেশানে যেতে চেয়েছিলাম, কিন্তু সৈন্যবাহিনী আমাদের বাধা দিল, আর আমরা ছড়িয়ে পড়লাম। আমার একটুও পা-ব্যথা ক'রে নি।" লাল অক্ষরে ছাপা একটুকরো কাগজ বের করে ও বললো, "এইগুলো আমাদের স্লোগান। আজ সত্যিই আমরা এই আওয়াজ তুলেছি।"

অনুবাদ : সুজিৎ ঘোষ

বা জিন চীনের সম সাময়িক সুবিদিত ও ঔপন্যাসিকদের মধ্যে অন্যতম, ১৯০৪ সালে সিচুয়ানের চেঙড়ু-তে ধনী সামন্ত-পরিবারে জন্ম, ১৯২৬-এ ফ্রান্সে যান এবং সেখানেই তাঁর প্রথম উপন্যাস 'ধ্বংস' শেষ করেন। ১৯২৮-এ সাংহাই-এ ফিরে 'সমুদ্রের স্বপ্ন' এবং অন্যান্য অনেকগুলি ছোটগল্প লেখেন। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস; 'কুয়াশা'; 'বৃষ্টি এবং 'বিদ্যুৎ' (ত্রয়ী উপন্যাস); 'পরিবার; 'বসন্ত' ও 'শরৎ' (ত্রয়ী উপন্যাস); তিনি স্বদেশী ভাষা থেকে অনেক বই চীন। ভাষায় অনুবাদ করেন; যেমন—টুর্গেনিভের 'বাবা ও ছেলে'। তিনি বর্তমানে ন্যাশন্যাল পিপলস্ কংগ্রেস-এর কর্মসমিতির সদস্য এবং অল-চাইনা ফেডারেশন অফ লিটেরারি এ্যাণ্ড আর্ট ক্ল্যাসিক্স-এর ভাইস-চেয়ার ম্যান।

ক্রীতদাসের হৃদয়



বা জিন

"আমার আত্মীয়-স্বজন সকলেই ক্রীতদাস ছিল!" একদিন পেঙ সগর্বে আমাকে বলেছিল।

আমার অনেক বন্ধু তাদের পারিবারিক ইতিহাস শুনিয়েছে, সকলেই একইভাবে আত্মপ্রসাদের সঙ্গে ঘোষণা করেছে, "আমাদের পূর্বপুরুষের বহুসংখ্যক ক্রীতদাস ছিল।" বেশির ভাগ পরিবারের এখনো অনেক ক্রীতদাস আছে, যদিও আগের তুলনায় সংখ্যায় অনেক কম অথবা আদৌ নেই, এবং তাদের ব্যবহার ও কথাবার্তা থেকে এটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে সেই সোনার অতীতের দিকে পেছন ফিরে তাকাতে তারা নস্ট্যাল্জিয়া বোধ করে।

আমার কথা বলতে হলে বলতে হয়, আমার মনে আছে আমার প্রপিতামহের চারজন ক্রীতদাস ছিল, আমার পিতামহের আটজন; এবং আমার বাবার ষোলোজন। আমি উত্তরাধিকারসূত্রে তাঁর কাছ থেকে ওই ষোলোজন ক্রীতদাস লাভ করেছিলাম, ক্রীতদাস মালিক হিসেবে বেশ গর্ব করার মতো। এবং আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা এই যে, সেই ষোলোজন বেড়ে একদিন বত্রিশ জনে দাঁড়াক।

কিন্তু তারপরে আমার জীবনে পেঙ-এর আবির্ভাব হল, এবং সে আমাকে বলতে সংকোচ করে না, এমনকি সদম্ভে—যে, তার পূর্বপুরুষেরা সকলেই ক্রীতদাস ছিল। আমার মনে হয় সে নিশ্চয় পাগল হয়ে গেছে।

আমি পেঙ-এর অতীত জানিনা, কিন্তু আমরা বন্ধু। এই বন্ধুত্বটা ঘটেছিল অদ্ভুতভাবে। সে হঠাৎ-ই আমার জীবনে অনুপ্রবেশ করেছিল। তা ঘটেছিল এইভাবে :

একদিন বিকেলবেলা কিছু ভাবতে ভাবতে কলেজ থেকে বেরিয়ে হাঁটছিলাম, কোথায় যাচ্ছি সে-সম্পর্কে কোনো হুঁশ ছিল না। একটা গাড়ি আমার পেছনে পেছনে আসছিল, গাড়ির হর্ন বাজছিল, কিন্তু আমি স্পষ্টত শুনতে পাইনি। আমি চাপা পড়েই যেতাম, যদি না একটি শক্ত হাত আমাকে আঁকড়ে ধরে প্রাণপণে টেনে না সরাত। আমি বিপদ থেকে রক্ষা পেলাম। যখন আমি ভারসাম্য ফিরে পেলাম, ঘুরে দেখলাম একটি লম্বা রোগা যুবক আমার পেছনে, আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমার ধন্যবাদের উত্তরে সে কোনোরকম সাড়া দিল না, হাসল না পর্যন্ত, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে আমাকে অচল করে তুলল। শেষে যেন নিজেকেই শুনিয়ে বলল, "ভবিষ্যতে আরো সাবধান হওয়া ভালো।" এই বলে সে চলে গেল। কিন্তু আমরা পরিচিত হলাম।

কলেজে আমরা আলাদা আলাদা বিভাগে পড়তাম। আমি সাহিত্য পড়তাম, সে সমাজ-বিজ্ঞান। আমরা একই বক্তৃতা শুনতাম না, কিন্তু প্রায়ই আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ হয়ে যেত। প্রতিক্ষেত্রেই আমরা কিছু মন্তব্য করতাম, অথবা কোনো কথাই বলতাম না, কেবল নিরুত্তাপ দৃষ্টি বিনিময় হত। তথাপি, আমরা বন্ধু হয়ে গেলাম।

আমরা কদাচ আলাপ-আলোচনা করতাম, এবং আমরা কখনো আবহাওয়া সম্পর্কেও কোনো ছোটো-খাটো কথা বলতাম না।

আমরা কেবল কোনো নির্দিষ্ট বিষয়েই কথাবার্তা বলতাম।

আপনি হয়তো বলবেন আমরা ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলাম, তথাপি আমি তাকে ভালোবাসতাম না। কেবল কৃতজ্ঞতাবোধ এবং কৌতূহলের

খাতিরেই আমি তার বন্ধু হয়ে উঠেছিলাম। হয়তো আমি তাকে শ্রদ্ধা করতাম, কিন্তু নিশ্চয়ই তাকে পছন্দ করতাম না। তার চেহারায় কোনোরকম অমায়িক ভাব ছিল না, কথাবার্তা বা ব্যবহারেও না। যেখানেই সে থাকত, তাকে একগুঁয়ে বলে মনে হত।

আমি তার অতীত সম্পর্কে কিছুই জানতাম না, যেহেতু সে-সম্পর্কে কোনোদিন কিছু সে বলেনি। কিন্তু কলেজে তাকে যেরকমটা দেখেছিলাম তা বিচার করে আমার মনে হয়েছিল সে খুব ধনী পরিবারের সন্তান নয়। সে খুব মিতব্যয়ী, উপস্নাতকদের অস্বাভাবিক প্রতিযোগিতায় সম্পূর্ণ অযোগ্য। সে পশ্চিমী ঢঙের জামা-কাপড় পরত না, সিনেমা দেখত না বা নাচে যোগদান করত না। ক্লাসের বক্তৃতার বাইরে তার ঘরে লেখাপড়া বা খেলার মাঠে কিংবা শহরে ধীরে সুস্থে হেঁটে-বেড়ানো—ইত্যাদিতে সময় অতিবাহিত করত। সে কখনো হাসত না, শুধু নিঃশব্দে গুম হয়ে বসে চিন্তা করত।

হাঁা, আমি প্রায়ই অবাক হতাম—সে কি ভাবে। তিন বছর ধরে আমরা সহপাঠী ছিলাম, এবং আমার যতোদূর মনে হয় সে সমস্ত সময়টা ভাবনা-চিন্তা করেই কাটিয়ে দিয়েছিল।

একদিন আমি জিজ্ঞেস না করে পারলাম না। "সবসময় তুমি কি চিন্তা করো, পেঙ?"

"তুমি বুঝবে না", সে ঔদাসীন্যের সঙ্গে জবাব দিল, তারপর সরে পড়ল।

সে ঠিকই ছিল—কিন্তু আমি বুঝতাম না কেন একজন যুবক ওরকম বিষণ্ন এবং পাগলাটে হবে। আমার দুর্বোধ্য বিস্ময় এই ধাঁধা সমাধান করতে আমাকে আগ্রহী করে তুলত।

আবিষ্কার করলাম আমিই তার একমাত্র বন্ধু। অবশ্যই সে আরো কিছু লোককে চিনত, কিন্তু কেউই তাকে বড়ো আমল দিত না, বিশেষত যেহেতু সে কারো সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে কোনোরকম ইচ্ছা প্রকাশ করত না। সে প্রত্যেককে ভ্রূকুটি করত, এমনকি সহপাঠিনীরাও যখন তাকে আহ্বান করত তখনও সে হাসত না। এবং যদিও আমাদের মধ্যে

ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল, তবু সে আমার সঙ্গে ভীষণ নির্লিপ্ত ব্যবহার করত। আমি বুঝেছিলাম এই কারণেই তাকে আমি অপছন্দ করি।

আমি তার অধ্যয়নের অভ্যাস লক্ষ্য করতাম। সে অতিমাত্রায় নির্বিচারে অদ্ভুত সব বিষয়ের বই পড়ত, যে-সব বইয়ের আমি কখনো নামও শুনিনি। তার মধ্যে কিছু কিছু বই লাইব্রেরির তাকে বছরের পর বছর পড়ে থাকত কিন্তু কেউ ছুঁয়েও দেখত না সে সব রকমের বইই পড়ত : একদিন হয়তো উপন্যাস, পরদিন দর্শনের ওপর কোনো নিবন্ধ, তার পরদিন ইতিহাস। সুতরাং তার অধ্যয়ন থেকে তাকে বুঝে ওঠা কার্যত দুঃসাধ্য ছিল, ওইসব বইয়ে কি আছে তা জানতে পারতাম না, যদি না সেগুলো পড়ার কষ্ট আমি স্বীকার করতাম।

একদিন বিকেলে আমাকে না জানিয়ে সে আমার ঘরে এল। ওই সময় আমি বাইরে একটি আরামপ্রদ বাসাবাড়িতে বাস করছি। আমার ওপর-তলার ঘরের সামনে কলেজে যাওয়ার পথ, এবং সেখান থেকে গল্ফ-খেলার মাঠও দেখা যেত।

পেঙ ভেতরে এল এবং সৌজন্য প্রকাশের ধার না ধেরে তার পুরনো গাউনের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে নিঃশব্দে আমার সাদা সোফার ওপর ধপ্ করে বসে পড়ল। আমি আমার ডেস্কে পড়াশুনো করছিলাম। তার দিকে এক নজর তাকিয়ে আবার আমি মাথাটা নিচু করলাম। আমার চোখগুলো বইয়ের পাতায় এবং আমার মন তার পুরনো গাউনের নিচে আমার নতুন সোফার ওপর নিবদ্ধ।

"ঝেঙ, চীনে কতজন ক্রীতদাস আছে তা তুমি জানো?" সে হঠাৎ কর্কশ স্বরে জিজ্ঞেস করল।

"খুব সম্ভব কয়েক লক্ষ," আমি আগোছালভাবে জবাব দিলাম। কয়েকদিন আগে এক বন্ধু এ-ব্যাপারে যে সংখ্যাটা উল্লেখ করেছিল তার সত্য-মিথ্যা যাচাই করিনি এবং এ-সম্পর্কে আমার ধারণাও ছিল না।

"কয়েক লক্ষ? না, কয়েক কোটি।" পেঙ উদ্বিগ্নস্বরে বলল। "এবং, যথার্থ পরিসংখ্যান অনুযায়ী চীনের তিনচতুর্থাংশ লোকই ক্রীতদাস।"

"বেশ, তবে আমি নই," আমি আত্মপ্রসাদের সঙ্গে চিন্তা করলাম। কিন্তু পেঙের দিকে তাকানোর জন্যে আমি মাথা তুললাম, তার উত্তেজনায় আমিও খানিকটা বিমূঢ় হয়ে পড়েছিলাম।

"তোমাদেরও ক্রীতদাস আছে?" সে অপ্রাসঙ্গিকভাবে এবং রুক্ষ-স্বরে জিজ্ঞেস করে বসল।

আমাদের একজনও ক্রীতদাস নেই—শুনলে সে নিশ্চয় আমাকে ঘৃণা করবে। যদিও তার ধারণা ভুল যে আমাদের ক্রীতদাস নেই, কেননা বাস্তবে আমাদের ষোলো জন ক্রীতদাস আছে। আত্মতুষ্টির সঙ্গে হেসে আমি বড়াই করে বললাম, "আমার মতো ব্যক্তির নিশ্চয়ই ক্রীতদাস আছে। আমাদের বাড়ীতে ষোলজন ক্রীতদাস আছে।

সে শ্লেষাত্মক হাসি হাসল, এবং আমি লক্ষ্য করলাম, দৃষ্টিতে শ্রদ্ধা বা ঈর্ষার পরিবর্তে একরাশ ঘৃণা ফুটিয়ে সে আমাকে দগ্ধ করতে লাগল। বাস্তবিকপক্ষে সে ষোলজন ক্রীতদাসের মালিককে ঘৃণা করতেই চেয়েছিল। ব্যাপারটা আমাকে খুবই অবাক করল। আমি বিশ্বাস করতেই পারছিলাম না। এর কারণ আবিষ্কারের চেষ্টা করতে গিয়ে হঠাৎ আমার মনে হল যে এ তার ঈর্ষা, কারণ সে নিজে মিতব্যয়ী এবং তাদের নিজেদের একজনও ক্রীতদাস নেই। সুতরাং আমি সহানুভূতির সঙ্গে বললাম, "অনুমান করি তোমাদের পরিবারেও ক্রীতদাস আছে?"

সে আবার আমার দিকে এক নজর তাকাল; তার চোখে গর্ব ফুটে উঠেছে দেখে আমি বিস্মিত হলাম। "আমার আত্মীয়-স্বজন সকলেই ক্রীতদাস," সে ঘোষণা করল, যেন কোনো মহৎ কীর্তি নিয়ে সে অহঙ্কার প্রকাশ করছে।

"কখনো না," আমি দ্বিধাগ্রস্ত স্বরে বললাম। "বন্ধুর কাছে তোমার এরকম বিনয় না করলেও চলবে।"

"বিনয়? কেন আমি বিনয় করব?" সে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, যেন আমি অদ্ভুত কিছু বলছি।

"কিন্তু তুমি স্পষ্ট করেই বললে যে তোমার লোকেরা সকলেই ক্রীতদাস।"

"তারা তা-ই।"

"এবং তুমি একজন কলেজের ছাত্র........" আমি সন্দিগ্ধভাবে বললাম।

"ক্রীতদাসের ছেলে কেন কলেজের ছাত্র হতে পারবে না?" সে বিদ্রূপ করে বলল, "আমি বলার স্পর্ধা রাখি যে তোমার পূর্বপুরুষদের মধ্যেও কেউ কেউ ক্রীতদাস ছিলেন।"

যেন কেউ আমার মুখে বেত্রাঘাত করেছে এইভাবে আমি লাফিয়ে উঠলাম, এবং এটা মর্মান্তিক অপমান এই ভেবে তার মুখোমুখি হওয়ার জন্যে এগিয়ে গেলাম।

"তুমি আমার পূর্বপুরুষদের তোমার পূর্বপুরুষদের মতো বলে মনে করো?" আমি রাগে তার দিকে কটমট করে চেয়ে থাকলাম। "তোমার আর আমরে মধ্যে বিস্তর ফারাক। শুনে রাখো, আমার বাবার ষোলো-জন ক্রীতদাস ছিল। আমার পিতামহের আটজন, আমার প্রপিতা-মহের চারজন; এবং তার আগে তাঁদের আরো বেশি ছিল।" সত্যি বলতে, অতো পুরনো সময়ের কথা আমার জানা ছিল না। আমার বৃদ্ধ প্রপিতামহ হয়তো একজন ছোটোখাটো ব্যবসায়ী ছিলেন, তাঁর একজনও ক্রীতদাস ছিল না; অথবা তিনি একজন ক্রীতদাসেরই সন্তান ছিলেন—আমি এইটুকুই জানি। কিন্তু আমি সর্বদা কল্পনা করতে ভালোবাসি যে তিনি একজন উচ্চপদের অফিসার ছিলেন, তাঁর একটি সুরম্য অট্টালিকা ছিল, আর ছিল অগুণ্‌তি উপপত্নী, সেইসঙ্গে কয়েকশ ক্রীতদাস।

আমি এ নিয়ে সর্বদা ঘ্যানঘ্যান করতাম না হয়তো, তবে অনেককে বেশ কয়েকবার নিশ্চয়ই বলেছিলাম, "আমার পূর্বপুরুষেরা উচ্চপদস্থ অফিসার ছিলেন।" এবং সে আমার মুখের সামনে স্পর্ধা করে বলল যে আমি ক্রীতদাসদের বংশধর। সারা জীবনে আমি এরকম অপদস্থ কখনো হইনি। এটা মেনে নেওয়া অসম্ভব, আমার পেছিয়ে যাওয়া চলবেনা। আমি তার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে থাকলাম।

কিন্তু আমাদের চোখাচোখি হলে তার কঠিন দৃষ্টি ক্রমশ আমাকে

শীতল করে তুলল। আমি অনুভব করলাম আমার চেয়ে তার প্রতি-রোধশক্তি অনেক বেশি। এবং আমি আমার জায়গায় গিয়ে বসলাম।

"হ্যাঁ, আমি তোমার কথা বিশ্বাস করলাম, কারণ, স্বভাবত তোমার মতো একজন ক্রীতদাস-প্রভুর পরিবারেই জন্মে থাকে। কিন্তু আমার মতো কেউই ও-জাতীয় পরিবারে জন্মায় না। তার জন্যেই আমি গর্বিত।" তার আচরণ অসহ্য হয়ে উঠল। সে স্পষ্টত আমাকে বিদ্রূপ করছে। ঈর্ষা নিশ্চয় তার মনকে বিকল করে তুলেছে। আমি না হেসে পারলাম না।

তার মুখটা কালো হয়ে উঠল এবং যেন আমার মুখদর্শন করতে চায় না—এইভাবে সে তার হাত দিয়ে নিজের মুখটা আড়াল করল। "তুমি কাকে বিদ্রূপ করছ? হ্যাঁ, আমি ক্রীতদাসের বংশধর হিসেবে গর্ববোধ করি। কারণ আমাদের হৃদয় এতো গভীরভাবে সম্পর্কান্বিত ...তুমি কি জানো? এরকম চমৎকার ঘরে উষ্ণ লেপের মধ্যে মিষ্টি স্বপ্ন দেখছ, তুমি এইসব বিষয়ে কতোটুকু জানো? আমার ইচ্ছা করে তোমার মতো লোকের চোখ খুলে দিই।...হ্যাঁ, আমি ক্রীতদাসদের সন্তান, আমি অস্বীকার করি না। আমি সগর্বে তা ঘোষণা করতেও পারি। আমার বাবা-মা ছিলেন ক্রীতদাস, এবং তার আগে আমার পিতামহ এবং প্রপিতামহ। আরো পিছিয়ে গেলে দেখবে, আমাদের বংশে এমন একজন কেউ ছিলেন না যিনি ক্রীতদাস নন।"

আমি ভাবলাম সে নিশ্চয় পাগল হয়ে গেছেএবং কোন দুর্ঘটনা ঘটার আগে কৌশলে তাকে ভাগিয়ে দিই। কিন্তু সে ঋজু ভঙ্গিতে বলে যেতে লাগল :

"হ্যাঁ, তোমার ষোলোজন ক্রীতদাস আছে। তুমি তৃপ্ত, সুখী এবং গর্বিত। কিন্তু কিভাবে তোমার ক্রীতদাসেরা জীবন নির্বাহ করে তা কি তুমি জানো? তাদের একজনের গল্পও কি আমাকে বলতে পারো? না, নিশ্চয়ই পারো না।"

"ঠিক আছে, আমাকে কিছু গল্প বলতে দাও... আমার পিতামহ

একজন অনুগত ক্রীতদাস ছিলেন। আমি তাঁর মতো অনুগত আর একজনও দেখি নি। তিনি প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে তাঁর মালিকের বাড়িতে কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন। একজন ক্রীতদাসের ছেলে বলে তিনি খুব তরুণ বয়স থেকেই কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন। আমার মনে আছে তাঁর চুলগুলো ছিল ধূসর। আমরা বাড়ির পেছনে একটা ভাঙা চালাঘরে বাস করতাম—আমার বাবা, মা, ঠাকুরদা এবং আমি। আমার মা যে সেখানে প্রায়দিনই ঘুমোতেন তা নয়, কেননা মনিব-বাড়িতে গৃহকর্ত্রী এবং যুবতী মহিলাদের সেবাতেই তাঁকে সর্বদা ব্যস্ত থাকতে হত। আমার ঠাকুরদাকে আমাদের প্রভু এবং প্রভুপুত্রদের অহরহই গালমন্দ করতে শুনতাম। তাঁর মুখ লাল হয়ে উঠত এবং তিনি নত-মস্তকে সে-সব মেনে নিতেন। শীতকালে বাতাসে আমাদের চালাঘর নড়ে উঠত, ফাটল দিয়ে বরফের মত ঠাণ্ডা বাতাস প্রবেশ করত, এবং শক্ত তক্তার ওপর শুধুমাত্র একখানা পাতলা লেপের মধ্যে ঘুমোবার সময় আমরা ঠাণ্ডায় জমে যেতাম। আমরা তিনজন—আমি—তখন একে-বারেই শিশু, আমার বুড়ো ঠাকুরদা এবং যুবক বাবার সঙ্গে কাঠ, শুকনো পাতা ও খড় কুড়িয়ে এনে মেঝেয় আগুন জ্বালাতাম। আগুনের চারপাশে বসে যখন আমরা শরীর গরম করতাম, তখন ঠাকুরদার জিবটা আলগা হয়ে পড়ত, তিনি আমাদের স্মৃতিকথা শোনাতে থাকতেন, ধর্ম-কথা শোনাতেন, আমাদের সৎ হতে এবং তাঁর মতো বিশ্বস্ততার সঙ্গে প্রভুগৃহে কাজ করতে উপদেশ দিতেন। সততার পুরস্কার মিলতে বাধ্য, তিনি বলতেন। আমার বাবা ভাল বক্তা ছিলেন না। ঠাকুরদার বক্তৃতা শেষ হতে হতে আগুন নিভে আসত, এদিকে অনেক রাতও হয়ে যেত, আমরা তিনজনই বিছানায় শুয়ে পড়তাম, রাত ভীষণ ঠাণ্ডা বলে আমরা পরস্পর ঠাঁসাঠাসি করে ঘুমোতাম।

"অবশেষে ঠাকুরদার পুরস্কার এল। একবার গ্রীষ্মকালের এক সকালে আমরা জেগে তাঁকে দেখতে পেলাম না, এবং পরে তাঁকে আবিষ্কার করা গেল, তিনি বাগানের একটা গাছের ডালে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। মা আমাকে তাঁকে শেষ দেখা দেখতে দিতে

রাজী হলেন না, এবং তাঁর মৃতদেহটি একটা কাঠের পা'টায় শুইয়ে, ওপরের দিকটা মাত্বরে ঢেকে তাড়াতাড়ি সরিয়ে ফেলা হল। আমরা সকলে তাঁর লম্বা, ময়লা পাগুলোই দেখতে পেলাম শুধু। সেই আমার ঠাকুরদাকে শেষ দেখা।

"তিনি কেন গলায় ফাঁস দিয়েছিলেন? কারণটা ছিল খুবই সরল: আগের দিন আমাদের প্রভু আবিষ্কার করলেন তাঁর কিছু মূল্যবান জিনিস খোয়া গেছে, এবং চুরির ব্যাপারে তিনি ঠাকুরদাকেই দায়ী করলেন। ঠাকুরদা মালিকের কাছে প্রতিবাদ করেছিলেন—তিনি তাঁর প্রভুর গৃহে চুরি করার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারেন না। কিন্তু এজন্যে প্রভু তাঁর কানে থাপ্পড় মেরেছিলেন, যাচ্ছেতাই গালমন্দ করে-ছিলেন, এবং ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্যে আদেশও দিয়েছিলেন। ঠাকুরদা ভয়ানক লজ্জা পেয়েছিলেন, প্রভুর বিশ্বাস অর্জন করতে পারেন নি এবং তাঁর দয়ার মর্যাদা রাখতে পারেন নি বলে ভয়ানক মর্মাহত হয়েছিলেন। তা ছাড়া, অতো বছর দাসত্ব করে একটা পয়সাও জমাতে পারেন নি, যা দিয়ে ওই ক্ষতি পুষিয়ে দেওয়া যায়। সুতরাং বিশ্বস্ততার সঙ্গে পঞ্চাশ বছর ধরে দাসত্ব করে একটা শিশুগাছের ডালে নিজের বেলট্ দিয়ে তাঁকে গলায় ফাঁস দিতে হল। এই ছিল তাঁর 'পুরস্কার'।

"যদিও গোটা পরিবারের সকলেই তাঁর প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করলেন, তবু তাঁরা ধরে নিলেন যে তিনি একজন চোর ছিলেন। সুতরাং আমি কেবল একজন ক্রীতদাসের সন্তানই নয়, একজন চোরের নাতিও বটে। সে যাক্, আমি বিশ্বাস করিনা আমার ঠাকুরদা কোনো জিনিস চুরি করেছিলেন। তিনি খুব ভালো মানুষ ছিলেন। প্রত্যেকদিন বিকেলবেলায় আমার বাবা আমাকে তাঁর দুই বাহুর মধ্যে জড়িয়ে নিয়ে ঘুম পাড়াতেন, সারাদিনের খাটনির পর ক্লান্তিতে অল্পক্ষণের মধ্যেই ঢুলতে থাকতেন। কিন্তু ঠাকুরদার কথা ভেবে সে-রাত্রে আমি ঘুমোতে পারি নি। তাঁর সদয় মুখটা মনে পড়ায় আমার দুচোখ বেয়ে জলের ধারা নেমেছিল। আমার হঠাৎ মনে হল আমি তাঁর বাহুর মধ্যেই আছি এবং তাঁকে গভীরভাবে আলিঙ্গন করে আছি, ফোঁপাচ্ছি—

'ঠাকুরদা, আমি বিশ্বাস করিনা তুমি কখনো চুরি করতে পারো। চোর নিশ্চয় আর কেউ।'

'তুমি কি বলছ, ক্ষুদে ষাঁড়?' আমি বাবার কণ্ঠস্বর চিনতে পারলাম। ষণ্ড-বৎসরে জন্মেছিলাম বলে আমার আদুরে নাম ছিল 'ক্ষুদে ষাঁড়।' আমি আমার চোখগুলো মুছলাম কিন্তু আমার বাবা—তিনিই আমার পাশে শুয়ে ছিলেন—চোখের জল দেখে ফেলেছিলেন। আমি কান্নায় ফেটে পড়ায় তিনি ঘুমোতে পারলেন না। দুচোখে জল নিয়ে তিনি আমাকে এই বলে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন, 'তোমার ধারণাই ঠিক, ক্ষুদে ষাঁড়। তোমার ঠাকুরদা কখনো চুরি করেননি। আসল চোর কে আমি জানি।' তাঁর বাহুদুটি দৃঢ়ভাবে ধরে আমাকে বলার জন্য প্রার্থনা করলাম, এবং একটু দ্বিধা করে তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'বেশ, তুমি প্রতিজ্ঞা করো কাউকে বলবে না।' আমি প্রতিজ্ঞা করলাম, এবং একটি শিশুর কথাকে কেউই মূল্য দেবে না, শেষ পর্যন্ত তিনি তিক্তস্বরে বললেন, 'চোর মালিকের বড়ো ছেলে। তোমার ঠাকুরদাও তা জানতেন। তুমি ভুলেও কাউকে বলবে না। তোমার ঠাকুরদা মালিকের ছেলের দোষ ঢাকা দেওয়ার জন্যে নিজের জীবন দিতেও ইচ্ছুক ছিলেন, সুতরাং প্রকাশ্যে সত্য কথা বলতে পারি না। তিনি মারা গেছেন, এবং তুমি যদি কাউকে এখন একথা বলো, কেউ আমার কথা বিশ্বাস করবে না। এবং তাতে আমাদের ভোগান্তিই বেড়ে যাবে।'

পেঙ থামার আগে একটি তির্যক হাসি দিয়ে বলল, "বাবার কথাগুলো আক্ষরিকভাবে হয়তো বলতে পারলাম না। তাঁর বক্তব্যের সারমর্মটিই তোমাকে বললাম। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কিছুই যে ছেড়ে যাইনি সে-সম্পর্কে আমি দৃঢ়নিশ্চিত। তুমি নিশ্চয় ভাববে না যে আমি সব বানিয়ে বলেছি।"

আমি নিঃশব্দে মাথা নেড়ে তাকে বলে যেতে বললাম।

"আমি বাবার যুক্তি কি, তা বুঝতে পারি নি, কিন্তু আর কোনো প্রশ্নও জিজ্ঞেস করতে আমার সাহস হয়নি। তথাপি আমাকে ঠাকুরদাকে হারাতে হয়েছিল এবং তাঁর জন্যে আমি খুব কেঁদেছিলাম।

"আমার বাবা-মা আমাকে খুব ভালবাসতেন। আমরা পরস্পর পরস্পরকে খুবই ভালোবাসতাম। আমার ঠাকুরদার মৃত্যুর পর বাবাকে সর্বদা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখতাম এবং তিনি কদাচিৎ হাসতেন।

"একদিন বিকেলে—তখন শীতকাল—আমি এবং বাবা ঘরের ভেতর আগুন পোহাচ্ছিলাম, এমন সময় বাইরে থেকে একটা গোলমাল কানে এল, কেউ চেঁচিয়ে বলছে, 'রক্ষা করো, রক্ষা করো!' ভয়ে আমি বাবার কোলের মধ্যে সেঁধিয়ে গেলাম; কষে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে থাকলাম। তিনি ফিসফিস করে বললেন, 'ভয় পেয়োনা। তুমি তো তোমার বাবার কাছেই আছো।' তারপর বাইরে নিস্তব্ধতা নেমে এল। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই কেউ ভেতরে ঢুকে বলে গেল বাবাকে মালিক ডেকেছেন। অনেকক্ষণ হয়ে গেল তিনি ফিরলেন না, আমি ভীষণ ভয় পেলাম। তারপর তিনি মাকে সঙ্গে করে ফিরে এলেন, তাঁরা দুজনেই কাঁদছেন। বাবা আমাকে দুহাতে তুলে নিলেন, ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে আমাকে জোরে জোরে ঝাঁকাতে লাগলেন; এবং নৈরাশ্যে ভেঙে পড়ে মায়ের সঙ্গে কি-সব কথা বলে চললেন। সেই রাত্রে আমরা তিনজনে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে নিদ্রা গেলাম। আমার বাবা-মা কি বিষয়ে কথা বলাবলি করলেন আমি তার কিছুই বুঝতে পারলাম না। যতখানি স্মরণ হয়, তা হল : 'তার চেয়ে বরং আমি মরি। আমার বেঁচে থাকার অর্থ কি? আমরা মনিবের গোলাম, তিনি যা বলবেন তা-ই আমরা করতে বাধ্য....যদি আমার আরো ছেলে থাকত এবং তাদেরও ছেলেপুলে হত—তাহলে তারা ক্রীতদাসের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি করত,—এই নিয়তি থেকে অব্যাহতি পাওয়ার কোনো উপায় নেই। আমি যদি বেঁচে থাকি, ক্ষুদে ষাঁড়কেও ক্রীতদাসের জীবন মেনে নিতে হবে, এবং এইভাবে তাকে ক্রীতদাসের বংশলতিকা বৃদ্ধি করেই যেতে হবে কেবল। আমি মনিবের কাছে নিজেকে বিক্রি করে দিলে ক্ষুদে ষাঁড় স্কুলে যেতে পারবে এবং পরবর্তীকালে সে পৃথিবীতে নিজের জায়গা করে নিতে পারবে।'

পেঙের চোখ লাল হয়ে উঠল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে আবার

বলে চলল, "আমার মনে আছে বাবা কি বলেছিলেন, এবং মৃত্যুর আগে পর্যন্ত কখনো তা ভুলব না। অবশ্য তোমার বোঝার সুবিধার জন্যে আমি তাঁর ভাষার কিছু অদল-বদল করেছি। তবু তাঁর কথার নিহিতার্থ বুঝতে তোমার খুব অসুবিধা হবে না।

"আমার মা বেশি কিছু বলেন নি, কেবল বাবাকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে বলেছিলেন, 'আমি তোমাকে ছাড়া কি করে বাঁচব?' কি ঘটেছে না বুঝেও আমি কাঁদছিলাম।

"পরদিন সকালে যখন বাবার খোঁজে পুলিশ এল, তখনো আমরা বিছানায় শুয়ে। আমার মা বাবার জামার আস্তিন কষে ধরে থাকলেন, মায়ের সঙ্গে আমিও কান্না জুড়ে দিলাম। পূর্বদিন বিকেলে কাউকে হত্যার দায়ে তাঁকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। আমি বিশ্বাস করতে পারলাম না। তিনি ওই সময় যে আমার সঙ্গে আগুনের পাশে বসে আগুন পোহাচ্ছিলেন! যখন বাইরে গণ্ডগোল হচ্ছিল, তখন তিনি আমাকে তাঁর দুই বাহুর মধ্যে নিয়ে বসে ছিলেন এবং আমাকে ছেড়ে কোথাও যাননি—সুতরাং কিভাবে তিনি বাইরে কাউকে হত্যা করলেন? বাবা আত্মপক্ষ সমর্থন করলেন না, যখন তাঁকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন তিনি মাথা নুইয়ে ছিলেন। আমি উন্মত্তের মতো তাঁর জামার আস্তিন ধরতে ছুটে গেলাম, মা কিছুই বললেন না। তারা আমাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিল এবং বাবাকে নিয়ে চলে গেল।

"সেই বাবাকে আমার শেষ দেখা। ক-মাস বাদে তিনি জেলে অসুস্থ হয়ে মারা যান। সেই সময় থেকে মা মনিব-বাড়িতে কাজ-করা বন্ধ করেন, আমরা বাইরে চলে আসি এবং আমি স্কুলে যেতে থাকি। আমাদের সমস্ত খরচ মনিবই বহন করতেন। তিনি তাঁর ছেলের কৃত দোষের ফলভোগী ব্যক্তি হিসেব বাবাকে কিনে নিয়েছিলেন। পরে আমি জেনেছি তরুণ মালিকই ছিলেন সেই ঘাতক, কিন্তু তিনি তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেন নি।......আমার কি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা উচিত ছিল? না, আমি তাঁকে এবং তাঁর ছেলেকে ঘৃণা করতাম! তাঁরা আমার শত্রু, যাঁরা আমার ঠাকুরদা এবং বাবাকে মৃত্যুর মুখে

লেলিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু আমার বাবার জীবনের মূল্যস্বরূপ যে অর্থ তিনি দিতেন তা আমি কাজে লাগাতাম। আমার বাবা আমাকে যেভাবে তৈরি করার জন্যে তাঁর জীবন দিয়েছিলাম, আজ আমি তাই হতে পেরেছি। তাঁর লক্ষ্য সফল হয়েছে। যাই ঘটুক, আমি আমাদের বংশের ক্রীতদাস-প্রথার পরিসমাপ্তি ঘটাবই……"

সে হঠাৎ ভেঙ্গে পড়ল, রাগের উচ্ছ্বাস দমন করার জন্যে ঠোঁট দুটো কামড়ে ধরায় তার মুখটা ভয়ানকভাবে দুমড়ে গেল। আমি লক্ষ্য করলাম সে পেছনে কিছু-একটা ধরে আছে। আমি তার বিবরণে খুবই বিচলিত হয়েছিলাম। তথাপি দৃঢ়তা সহকারে আমি তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম, যেন জিজ্ঞেস করতে চাইলাম : "আরো কি-সব ভয়ঙ্কর গুপ্ত রহস্য তুমি বলবে ?"

সে নিশ্চয় আমার মনের কথা বুঝতে পেরেছিল, কেননা তার মুখটা লাল হয়ে উঠল—হয় লজ্জায়, না-হয় রাগে। ঘরের মধ্যে কয়েকবার লম্বা লম্বা পা ফেলে পরিক্রমা করে সে আবার বসল, তার মুখটা ভয়ানক হয়ে উঠেছে। "হ্যাঁ, এখানেই গল্পের শেষ নয়। আমি আরো কিছু গোপন করে রেখেছি," সে বলল। "বেশ, আমি তা-ও তোমাকে বলব। একদিন—সেদিন রোজকার চেয়ে আগে আগেই আমি স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে গেলাম এবং বিছানার ওপর মাকে আর একজন পুরুষের সঙ্গে বসে থাকতে দেখলাম। তাঁরা আমাকে লক্ষ্য করেন নি। সুতরাং আমি কাপুরুষের মতো লুকিয়ে ছুটে বাইরে বেরিয়ে গেলাম, আমার ভেতরটা রাগে এবং অপমানে জ্বলে যেতে লাগল। যতোদিন আমি স্কুলে পড়েছি, ততোদিন আমার মা বাড়িতে বেশ্যাবৃত্তি করেছে ? এই চিন্তা আমাকে পিষে ফেলছিল, তবু আমি মাকে ভালোবাসতাম, এবং তাঁকে বেত্রাঘাত করি নি। এছাড়া, আমি লোকটিকেও চিনতে পেরেছিলাম, তিনি—আমাদের তরুণ মনিব। অন্য সব লোক থাকতে—তিনিই আমার ঠাকুরদা এবং বাবাকে মরণের মুখে লেলিয়ে দিয়ে এখন আমার মায়ের সর্বনাশ করছেন। আমি শুনতে পেলাম, মা বলছেন, 'তাড়াতাড়ি করুন, এবং ক্ষুদে ষাঁড় আসার আগেই চলে যান।'

তরুণ মনিব কি বললেন, তার উত্তর মা বললেন, 'ঈশ্বরের দোহাই, আর আসবেন না—এলে আপনাকে ক্ষুদে ষাঁড় দেখে ফেলবে। আমাকে দয়া করুন।'....

"যখন আমি ভেতরে গেলাম, মা বিছানায় একা বসে ছিলেন, চিন্তায় তাঁর মাথা নোয়ানো। আমি তাঁর দিকে ছুটে গেলাম। তিনি চমকে উঠলেন এবং লজ্জায় প্রচণ্ডভাবে রক্তিম হয়ে উঠলেন। 'তুমি তাহলে ফিরে এসেছ ?'

ক্রোধ এবং অবমাননায় ভেঙ্গে যেতে যেতে আমি তাঁর হাঁটু আঁকড়ে ধরলাম। 'কি নির্লজ্জ তুমি, মা !' আমি চেঁচিয়ে উঠলাম। 'একবছরও হয়নি বাবা মারা গেছেন, এবং তুমি পরপুরুষের সঙ্গে রঙ্গ শুরু করেছ !' তিনি কিছু বললেন না। 'আমি স্কুলে কতো কষ্ট সহ্য করি আর তুমি এইসব চালিয়ে যাচ্ছো !' মা চিৎকার করে উঠলেন, "ক্ষুদে ষাঁড়," তারপরই বিছানার ওপর লুটিয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। তাঁর আদর যত্ন, এবং আমি যখন প্রত্যেকদিন সন্ধেবেলায় স্কুলের পাঠ অভ্যাস করতাম তখন যেভাবে তিনি আমাকে সঙ্গ, সান্ত্বনা এবং উৎসাহ দিতেন,—সে সব মনে পাড়ায় আমার মনটা নরম হল। 'আমি দুঃখিত, মা,' দোষ স্বীকার করে বললাম, 'এই ধরনের কথা বলে তোমাকে আঘাত দেওয়া আমার উচিত হয় নি। আমাকে ক্ষমা করো।' কিছুক্ষণ পরে তিনি মাথা তুললেন এবং উঠে বসলেন, আমাকে তাঁর পাশে বসালেন। 'তুমি ন্যায্য কথাই বলেছ, ক্ষুদে ষাঁড়,' তিনি দুঃখিত স্বরে বললেন। 'আমার ক্ষমা চাওয়াই উচিত। তোমার বাবার মৃত্যুর পর তুমিই আমার সব। আমি তোমার জন্যেই বেঁচে আছি। যদি তা না হত, আমি তোমার বাবার পথ অনুসরণ করে কবরেই যেতাম। মৃত্যুকালে তিনি যে কথাগুলো বলেছিলেন—তোমার মনে পড়ে না ? তুমি একজন ক্রীতদাস হও তা তিনি সহ্য করতে পারতেন না। তুমি যাতে পৃথিবীতে সম্মান ও অধিকার পাও তার জন্য তিনি তোমাকে লেখাপড়া শেখাতে চেয়েছিলেন। যে জন্যে তিনি জীবন দিতে পেরেছেন—আমি কেন পারব না। হয়তো পরজন্মে আমাকে পাপ

করেছিলাম ।...একদিন মনিব বাড়িতে আমি মহিলাদের সেবা করছিলাম, তখন তরুণ মনিব আমাকে উত্যক্ত করতে লাগলেন, আমি পালাতে পারলাম না। তোমার বাবার মৃত্যুর পর আমরা তাঁদের বাড়ি থেকে বাইরে চলে এলে তিনিও আমাকে খুঁজে বের করলেন। অন্যত্র যাওয়ার চেয়ে আমার কাছে আসা অনেক সহজ, এবং আমার দুর্ভাগ্য আমি কুৎসিত নই। তাঁদের পরিবার এখন আমাদের প্রতিপালন করছে এবং তুমি লেখাপড়া করতে চাও—কিন্তু তাঁদের পয়সা ছাড়া আমরা কিছুই করতে পারি না। সেই পশুটা সব করতে পারে।.. ক্ষুদে ধাঁড়, আমাকে ক্ষমা করো। আমার ভাগ্যে যাই ঘটুক তা আমি পরোয়া করি না—যদি তাতে তুমি লেখাপড়া শিখে মানুষ হতে পারো এবং তোমাকে ক্রীতদাস না হতে হয়।' অবশ্যই এগুলি তাঁর নিজের কথা নয়, তিনি যা বলেছিলেন তার সংক্ষিপ্তসার।

আমি তাঁকে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরলাম, আগের চেয়ে আরো গভীর ভালোবাসায় আমার হৃদয় ভরে উঠল। 'এ যে তোমার পক্ষে খুবই কষ্টকর, মা,' আমি ঘৃণাপূর্ণ স্বরে বললাম। 'আমি স্কুলে যাওয়া বন্ধ করব। আমি তোমাকে এই দুর্ভোগ সইতে দিতে পারি না। আমার লেখাপড়ায় কাজ নেই, তার চেয়ে আমি বরং ক্রীতদাসই হব।'

"তৎক্ষণাৎ তিনি আমার মুখের ওপর তাঁর হাত রাখলেন। 'বোকার মতো কথা বলো না', তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, 'তুমি নিশ্চয় পড়বে এবং ভালো ফল করে বেরিয়ে আসবে। স্কুলে পড়ছ দেখলে আমি আমার জীবনের সমস্ত দুঃখ হাসিমুখে সহ্য করব।'

"মা সারাটা সন্ধ্যে আমাকে বোঝালেন। এবং শেষে তিনি যা বললেন তাতে আমি সম্মত হলাম। পরদিন থেকে রোজকার মতো স্কুলে যেতে শুরু করলাম এবং 'পড়ব না'—একথা আর ভুলেও উচ্চারণ করলাম না। আমি কঠোর পরিশ্রম করলাম, স্কুলে যাবতীয় পাঠ্যবই গোগ্রাসে গিলে ফেললাম, আমার আত্মবিশ্বাস হল যে এ-তে আমি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাব। আমি স্থির করেছি যে আমি আমার বাবা-মার ইচ্ছা পালন করব এবং আমাদের ক্রীতদাসত্ব ঘোচাব।

"কিন্তু তিক্ত বাস্তব আমার উপর ভারি হয়ে চেপে বসেছিল। অতীতটাকে একটা শয়তান বলে মনে হয়—যে আমাকে অধিকার করে নিয়েছিল। জীবন হয়ে উঠেছিল খুবই ঘৃণ্য, বিশেষ করে আমার মতো লোকের পক্ষে, যে নিজেকে দাসত্ব থেকে উদ্ধার করতে চেয়েছিল। তথাপি আমি আশা ছাড়িনি। আমাকে বেগে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে আমার ওপর মায়ের ভালোবাসা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল। সে-সব আমাকে সবকিছু সহ্য করায় সাহায্য করেছিল।

"অবশ্যই তরুণ মালিক আসা বন্ধ করেন নি। আমি তাঁকে কতো যে ঘৃণা করতাম! কিন্তু আমি তা বুঝতে দিতাম না। তিনি চলে গেলে মা যেন এক অন্য মানুষ। তিনি গমকে গমকে কেঁদে উঠতেন, এবং অনেক সময় ধরে আমি তাঁকে সান্ত্বনা দিতাম। যদি এইভাবেই চলতে থাকে, তাহলে তিনি শীঘ্রই মারা যাবেন। কিন্তু তরুণ মনিব সৌভাগ্য-ক্রমে চার-পাঁচ মাস পরে একটি তরুণীকে উপপত্নী হিসেবে গ্রহণ করলেন এবং আমাদের বাড়ি আসা বন্ধ করলেন। মা আমার সঙ্গে বেশ কয়েক বছর শান্তিতে কাটালেন, আমার কলেজে প্রবেশের সময় পর্যন্ত।

"তিন বছর হল মা মারা গেছেন। আমি একদিনের জন্যেও তাঁকে বা আমার ঠাকুরদা এবং বাবাকে ভুলে যাইনি। আমি তাঁদের নিগৃহীত অস্তিত্বের কথা চিন্তা করি, কিন্তু তার জন্যে আমার লজ্জা হয় না—অথবা কখনো আমি রক্তিম হয়ে উঠি না। আমি গর্বিত যে আমার আত্মীয়-স্বজনেরা সকলেই ক্রীতদাস ছিলেন, হ্যাঁ, সত্যিই গর্বিত। যদিও আমার ঠাকুরদাকে চোরের অপযশ দেওয়া হয়েছিল, আমার বাবাকে অন্যের কৃত দোষের ফলভাগী ব্যক্তি হিসেবে জেলে মরতে হয়েছিল, এবং আমার মাকে বেশ্যাবৃত্তি নিতে হয়েছিল, তথাপি তোমরা তাদের কি কোনো নোংরা আচরণের জন্যে অভিযুক্ত করতে পারো?"··· সে খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল। "আমি জানি তোমরা তাদের দিকে নাক সিঁটকাবে, তাদের ঘৃণা করবে। তোমরা কেউ তাদের মানসিকতা বুঝতে চাইবে না। তোমাদের মতো তাদেরও সোনার হৃদয় ছিল!

'তাঁদের চিন্তা প্রায় রাত্রেই আমাকে বিনিদ্র করে রাখে। একটি

অনুভূতি আমাকে সম্পূর্ণরূপে আবিষ্ট করে রাখে—লজ্জা নয়, ক্রোধ। আমি ভাবি : আমি এখানে আরামদায়ক শয্যায় শুয়ে আছি, আর সর্বত্র লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি ক্রীতদাস তাদের দুর্ভাগ্যের জন্যে বিলাপ করছে। তারাও আমার পিতামহের মতো ঘৃণ্য জীবন যাপন করছে। যখন তাদের মালিকরা মিষ্টি স্বপ্নে বিভোর, তখন কোনো বৃদ্ধ চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত হচ্ছে। পরদিন সকালে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করবে বলে তৈরি হচ্ছে, তাদের কেউ কেউ যুবক বয়সে অন্যের কৃত দোষের ফলভাগী ব্যক্তি হতে বাধ্য হচ্ছে; তাদের মা এবং বোনেদের মালিকদের বাহুবন্ধনের মধ্যে আত্মসমর্পণ করতে হচ্ছে; তাদের শিশুরা বাপেদের আঁকড়ে ধরে আছে, কাঁদছে। আমি বর্বরের মতো তাদের, তোমাকে এবং তোমার মতো ব্যক্তিদের অভিসম্পাত দিই। যদি আমি তোমাদের মতো ব্যক্তিদের সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করতে পারতাম! তোমরাই আমার ঠাকুরদাকে মৃত্যুর মুখে লেলিয়ে দিয়েছিলে, আমার বাবার জীবন কিনে নিয়েছিলে, আমার মাকে ধর্ষণ করেছিলে। তাঁরা সবাই এখন মৃত। কেবল তুমি এখনো বেঁচে আছো। আমি তোমার উপর প্রতিশোধ নিতে চাই……"

সে উঠে দাঁড়িয়ে আমার দিকে অগ্রসর হয়ে আমাকে এখন সন্ত্রস্ত করে তুলল। যখন আমি নিজেকে প্রতিরোধ করার জন্য মানসিকভাবে তৈরি হচ্ছি, তখন সে জানালার কাছে এগিয়ে গেল। সেখানে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে সে হঠাৎ সেইদিকে অঙ্গুলীসংকেত করে ক্রুদ্ধস্বরে বলল, "দেখো!" আমি দেখলাম সে ছোট্ট গলফ্-খেলার মাঠটার দিকে নির্দেশ করছে। মাঠটা আলোর বন্যায় ভাসছে এবং কিছু সাদা-পোশাক পরা পরিচারক প্রবেশপথের সামনে ঘোরাফেরা করছে, যেখানে অপরিচ্ছন্ন পোশাক-পরিহিত একজন বিদেশিনী টিকিট বিক্রি করছে। দামী পোশাক-পরা যুবক-যুবতীরা ভেতরে জোড়ায় জোড়ায় ধীরে সুস্থে হেঁটে বেড়াচ্ছে।

"আমরা বছরের পর বছর হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে চলি, আমাদের ঠাকুরদারা আত্মহত্যা করে, আমাদের বাবারা জেলে পচে মরে, আমাদের

মায়েরা এবং বোনেরা ধর্ষিত হয়, আমাদের শিশুরা কাঁদে। এবং তোমাদের মধ্যে এমন একজনও নেই যার কোনো বিবেক আছে!" তার কণ্ঠস্বরের ক্রোধের মধ্যে যেন সমগ্র একটি শ্রেণীর বহু পুরনো ঘৃণা ফুটতে থাকল। আমার মনে হল কেউ যেন আমাকে কশাঘাত করছে। হঠাৎ আমার চোখের সামনে অসংখ্য করুণ দৃশ্য ভেসে উঠল। আমি খুব ভালোভাবেই জানি যে আমাদের বাড়িতে ষোলোজন ক্রীতদাস আছে এবং মনে আছে আমি সংখ্যাটি দ্বিগুণ করতে চেয়েছিলাম। ষোলো এবং বত্রিশ সংখ্যা দুটি হঠাৎ আমার মনে উদিত হল। যে তার ঠাকুরদার সর্বনাশ করেছে, তার বাবাকে শাস্তি দিয়েছে এবং মাকে ধর্ষণ করেছে সেই তরুণ মালিককে আমি যেন নিজের মধ্যেই সনাক্ত করলাম। আমি ভয়ে গুটিয়ে গেলাম, যেন দুটি শিকারী চোখ আমাকে বলপূর্বক আক্রমণ করতে চায়। আমার শেষ সময় এসে পড়েছে, এই চিন্তা করে আমি ভয়ে আর্তনাদ করে উঠলাম।

"কি হলো, ঝেঙ? তুমি আর্তনাদ করছ কেন?" সে হঠাৎ শান্তভাবে জিজ্ঞেস করল।

কথা বলতে না পেরে, আমি শুধু আমার চোখগুলো মুছলাম।

"তুমি কি আমাকে ভয় পেয়েছ, ঝেঙ? তোমার জানা উচিত যে আমি তোমাকে আঘাত করব না।" সে একটা তির্যক হাসি হাসল।

ইতিমধ্যে আমি নিজেকে সামলে নিয়েছিলাম। আমি অভিনিবেশ সহকারে তার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম এবং সেখানে ভীতি-প্রদর্শনের কোনো চিহ্ন খুঁজে পেলাম না। সে কিভাবে মৃত্যু থেকে আমাকে উদ্ধার করেছিল স্মরণ করে আমি সন্দিগ্ধভাবে জিজ্ঞেস করলাম, "কেন আমাকে বাঁচিয়েছিলে, পেঙ? আমিও একজন ক্রীতদাস-প্রভু, তোমার শত্রু? কেন তুমি আমাকে গাড়িচাপা পড়তে দাও নি?"

আর একটি তির্যক হাসি। তারপর সে শান্তভাবে বলল, "আমার মনে হয় আমার এখ'না দাসসুলভ মানসিকতা কাটে নি।"

আমি দুচোখে জল নিয়ে নিঃশব্দে তার দিকে চেয়ে থাকলাম।

সে নিশ্চয় ভেবেছিল আমি বুঝতে পারিনি, কেন না সে বিশদভাবে

বলতে লাগল, "অপরের সুখের জন্যে নিজের সুখ অস্বীকার করা; অপরের জন্যে দুঃখ না করে নিজের জীবন উৎসর্গ করা—এসবই দাস-সুলভ মানসিকতা। সেই মানসিকতা উত্তরাধিকারসূত্রে চলে এসেছে আমার পূর্বপুরুষদের থেকে আমার ঠাকুরদার মধ্যে, তাঁর থেকে বাবা এবং বাবার থেকে আমার মধ্যে।" সে তার বুকের দিকে নির্দেশ করল, এবং কল্পনায় আমি দেখলাম একটি বৃহৎ উজ্জ্বল হৃদয় সেখানে স্পন্দিত হচ্ছে। আমি আমার বুকের দিকে চাইলাম। ভেতরে যা আছে তা আমার ঝকঝকে ফ্ল্যানেলের জ্যাকেটে আচ্ছাদিত।

"কবে আমি এই দাস-সুলভ মানসিকতা এবং হৃদয় থেকে মুক্তি পাব?" তার ঘৃণাপূর্ণ কণ্ঠস্বর এতো কর্কশ শোনাল যে আমি তাড়াতাড়ি কান দুটো ঢেকে ফেললাম। আমার যে একজন ক্রীতদাসের হৃদয়ও নেই। হয়তো আমি একেবারেই হৃদয়হীন। লজ্জা ভয় এবং দুঃখে অভিভূত হয়ে আমি অজ্ঞান হয়ে গেলাম। সে কখন চলে গিয়েছিল, জানি না।

তারপর থেকে তাকে বার কয়েক দেখেছি, কারণ একটু একটু করে সে ক্রমে উন্নাসিক হয়ে উঠেছিল। কদাচিৎ খেলার মাঠে সে পা দিত এবং তাকে শহরে ধীরে-সুস্থে হেঁটে বেড়াতেও আর দেখা যেত না। আমি অনেকবার তার ঘরে গিয়ে তার দেখা পাইনি। আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম, এবং পরে আমি তার গল্পও ভুলে গেলাম। আমার নিজের বন্ধুবান্ধব এবং আমোদ-প্রমোদ নিয়েই মত্ত ছিলাম। আমি সিনেমায় এবং নাচে যেতাম এবং মেয়ে-বন্ধুর সঙ্গে গলফ্ খেলতাম। যখন আমার বন্ধুরা এবং আমি ক্রীতদাস সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করতাম, তখন আমি সদম্ভে ঘোষণা করতাম, "আমাদের ষোলোজন ক্রীতদাস আছে এবং আমি সেই সংখ্যা বাড়িয়ে বত্রিশ করতে চাই।"

স্নাতক হওয়ার পর কয়েক বছরের মধ্যে আমার আশা সফল হল। আমি বত্রিশজন ক্রীতদাসের প্রভু হয়েছি, তারা বিশ্বস্ততার সঙ্গে আমার পরিবারের সেবা করে। সুখী এবং তৃপ্ত, আমি পেঙের বলা ক্রীতদাস-সম্পর্কিত কাহিনী বেমালুম ভুলে গিয়েছিলাম।

একদিন আমি এবং আমার স্ত্রী পাঁচজন ক্রীতদাস পরিচারকসহ বাগানের শীতলতা উপভোগ করছিলাম। সেদিনের খবরের কাগজটায় চোখ বুলোতে গিয়ে স্থানীয় সংবাদের কলমে একজন বিপ্লবীর প্রাণদণ্ডের বিবরণীর ওপর হঠাৎ আমার চোখ ছুটো আটকে গেল। তার নাম পেঙ। আমি বুঝতে পারলাম এ নিশ্চয় সে, সেই পরোপকারী ব্যক্তি—যে আমার জীবন রক্ষা করেছিল, এবং তারপর যার কথা আমি ভুলে গিয়েছিলাম। আমাকে যে গল্প সে বলেছিল এবং যা আমি এতো বছর পরে ভুলে গিয়েছিলাম—হঠাৎ সে-সবও আমার মনে পড়ল। আমি ভাবলাম, এতোদিনে সে একজন ক্রীতদাসের হৃদয় থেকে মুক্তি পেল। তার ক্রীতদাস-বংশলতিকার এখানেই সমাপ্তি। হয়তো এই বিষয়টাই তার কাছে ছিল সবচেয়ে সুখের বিষয়। কিন্তু কিভাবে সে আমার জীবন রক্ষা করেছিল তা স্মরণ করে নিজেকে তার কাছে বড়ো ঋণী বলে মনে হল। খবরের কাগজের দিকে তাকিয়ে আমি ছ-বার দীর্ঘ নিশ্বাস না ফেলে পারলাম না।

"তুমি হঠাৎ এভাবে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে কেন, প্রিয়তম ?" আমার স্ত্রী আমার হাতে ঝাঁকুনি দিয়ে এবং নরম ও করুণ চোখে তাকিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করল।

"কিছুই না। আমার একজন পুরনো সহপাঠী মারা গেছে," আমি মৃদুস্বরে জবাব দিলাম। আমার স্ত্রীর সুন্দর মুখ এবং প্রেমে উদ্ভাসিত বড়ো বড়ো চোখ ছুটোর দিকে তাকাতেই আমি আবার সব কিছুই ভুলে গেলাম।

অনুবাদ : জগত সাহা

ধানের শীষ



সু-তাও-সেঙ এবং চেন-ওয়েন-সেই

১৯৬৬ সালে চীনে মহান সর্বহারা সংস্কৃতি বিপ্লব শুরু হয় মাও সেতুঙের নেতৃত্বে। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য মুছে ফেলে সমাজতান্ত্রিক চেতনাকে প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম শুরু হয়। এই সংগ্রামকে ভাববাদ ও বস্তুবাদের মধ্যে বিরোধ, ব্যক্তি ও সমষ্টির মধ্যেকার বিরোধ বলে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। শিল্প, সাহিত্য, কাব্য, নাটক প্রভৃতি সংস্কৃতির সমস্ত শাখায় সমাজচেতনাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়, ব্যক্তির বদলে গোষ্ঠী, একের পরিবর্তে সমষ্টি পায় প্রাধান্য। তারই উদাহরণ হিসাবে 'দুটি ধানের শীষ' গল্পটি দেওয়া হল,—এটা যুগ্ম লেখকের রচনা।

১৯৫৯ সাল। ধান কাটার কাজ শুরু হবার মুখে। এমনি এক দিনে দেখা গেল একজন লোক সূর্যাস্তের পরও আপন মনে ঘুরে বেড়াচ্ছে ক্ষেতের মধ্যে, চোখ তার স্থির নিবদ্ধ ধানের ছড়াগুলোর ওপর। লোকটি গরীব চাষী চ্যাঙ, বয়স প্রায় চুয়ান্ন বছর। সাংহাই-এর কাছে "চ্যাঙ পরিবারের উৎপাদন-বিগ্রেডের" সে সভ্য এবং বাছাইয়ে বিশেষজ্ঞ। তার গায়ের রং তামাটে, স্বাস্থ্যে ও শক্তিমত্তায় ভরপুর চেহারা। ঝাঁকড়া তার ভুরু দুটোও। প্রচণ্ড মনের জোর চ্যাঙের।

মাঠে মাঠে ঘুরতে চ্যাঙের খুব ভাল লাগে। এটা তার পুরনো অভ্যাস। হাতে কাজ না থাকলে মাঠের চারদিকে আপনমনে ঘুরে বেড়ায়। কমিউনের সভা শেষ করে অন্যরা বড় রাস্তা ধরে বাড়ি ফেরে, কিন্তু চ্যাঙ বাড়ি যায় আলপথে। কেন? কারণ সে সবসময় খুঁজে বেড়ায় ভাল ধানের শীষ—ভালো বীজের জন্যে। কাজে তার এতো কেন উৎসাহ? তা বলতে গেলে শুরু করতে হয়ে গণ কমিউনের প্রতিষ্ঠা দিনের ঘটনা দিয়ে।

সেদিন ঢাক আর শিঙা বাজিয়ে চ্যাঙ ও অন্যান্য গরীব আর নিম্নমধ্য কৃষকেরা গণকমিউন প্রতিষ্ঠার উৎসব পালন করছিল। সভাশেষে কমিউনের পার্টি সম্পাদক চ্যাঙের কাছে এসে বললেন, "জানেন চ্যাঙ

কাকা, সভাপতি মাও আমাদের ভালো বীজ বাছাই করতে বলেছেন। আমাদের কমিউনের প্রতিষ্ঠা হয়েছে, এখন যৌথ ব্যবস্থায় উৎপাদন বাড়তে থাকবে দ্রুত গতিতে। বীজ বাছাইয়ে আপনি বিশেষজ্ঞ। এ বিষয়ে আরও সময় দিতে হবে আপনাকে। আরও উন্নত বীজ তৈরী করতে হবে আমাদের। এটা তো জানা কথাই যে ভালো বাঁশ পুতলে তার কোঁড়ও হয় তেজী। ভালো বীজ থেকে ভালো ফসল ফলে। ঠিক যেমনি সার দিলে আর জমির পরিচর্যা করলে ফসলের জাতই হয় আলাদা। উৎপাদন বাড়াতে ভালো বীজের ভূমিকা অনেক।" সেই সময় থেকেই চ্যাঙ কার্যত তার সমস্ত অবসরটুকু ব্যয় করে ভালো বীজ খুঁজে বেড়ানোর কাজে। বাড়িতে তার দেখা মেলাই ভার। তার স্ত্রী দোষারোপ করে, "রকম দেখ! বাড়িখানি যেন একটা হোটেল, শুধু খাওয়ার সময় বাড়ি ফেরা। যেন এটা পান্থশালা—ঘুম পেলেই খালি মনে পড়ে বাড়ির কথা। দিনের বেলায় বাড়িতে এলে সেটাও অনেকটা বাস চলারই সামিল। খানিক থেমে আবার চলতে শুরু করার মতো।" মুখে যাই বলুক না কেন ও তার স্বামীর কাজ সমর্থন করে। সে খুব ভাল-ভাবেই জানে যে তার স্বামী কমিউনের কাজেই ডুবে থাকে সারাক্ষণ।

একদিন চ্যাঙ মাঠে মাঠে আপন মনে ঘুরতে ঘুরতে ন' নম্বর ক্ষেতে এসে পড়ল। আশ্চর্যজনক একটি দৃশ্য দেখে থমকে দাঁড়াল ও। ক্ষেতের মাঝ বরাবর অন্যগুলির চেয়ে দু'গুণ বড় দুটি ধানের শীষ ধীরে ধীরে দুলছে। কাছে গিয়ে ভালো করে দেখবে বলে চ্যাঙ তার পরণের কাপড় নিল গুটিয়ে। পুরুষ্ট আর ভারী দুটি ছড়া ধানের শীষের আগায়। চ্যাঙ গুণে দেখল একটায় দুশো চৌষট্টিটা, অন্যটায় তিনশো ছত্রিশ—মোট ঠিক ৬০০টা ধান। কি সুন্দর বীজ! দেখেই তার মন নেচে উঠল। সে স্নেহ ভরে ছড়া দুটোর গায়ে আঙুল বোলালো। তক্ষুণি বীজগুলো তুলে নিতে ইচ্ছে হল ওর। কিন্তু তখনও ভালোভাবে পাকেনি। কিন্তু আজ যদি ফিরে যায় কয়েকদিন পরে হয়তো এতো ধানের মধ্যে এই শীষ দুটো আর খুঁজেই পাবে না। চিন্তিত হয়ে পড়ল চ্যাঙ। কি করবে ভেবেই পায় না। হঠাৎ চোখে পড়ল নদীর ধারে একঝাড় নল-

খাগড়া বাতাসে দুলছে। চ্যাঙ প্রায় ছুটে গিয়ে এক গোছা নলখাগড়া এনে ধানগাছগুলোর চারপাশে ছোট একটা বেড়ার মতো করে ঘিরে দিল। প্রবল অনিচ্ছা সত্ত্বেও ধানের শীষ দুটোকে ছেড়ে চলে যেতে হল, কেন না ব্যাঙ ডাকতে শুরু করেছে আর ইতিমধ্যেই চাঁদ উঠেছে গাছের মাথার অনেক ওপর দিয়ে। শ্রান্ত চ্যাঙ বাড়ির পথে পা বাড়াল ধীরে ধীরে।

প্রায় এক সপ্তাহ পার হয়ে গেল। একের পর এক ক্ষেতগুলোর সোনালী ধান পেকে উঠেছে। কাজ শেষ হলে চ্যাঙ ন' নম্বর ক্ষেতটায় গিয়ে সন্তর্পণে পথ তৈরী করে ক্ষেতের মাঝে এসে দাঁড়াল আর সেই ধানের গুচ্ছ থেকে শীষ দুটো ভেঙ্গে নিল। বাচ্চারা নতুন খেলনা পেলে যেমন খুশী হয় তেমনি খুশীতে সে আপন মনে "ছ'শো বীজ—ছ'শো ভালো বীজ" বলতে বলতে বাড়ী ফিরে এল। বাড়ী ফিরে এসে এক টুকরো পলিথিনে জড়িয়ে শীষ দুটো রেখে দিল। প্রতিদিন সকালে চালে রোদে শুকোতে দেয় আর সূর্য অস্ত যাবার আগে ঘরে এনে রাখে। চ্যাঙ বাঁশের একটা চোঙ তৈরী করে তাতে বীজগুলো ভরে উনুনের পিছনে একটা কোণে ঝুলিয়ে রেখে দিল। সময় বয়ে চলল। শেষ চান্দ্র মাসের চব্বিশ তারিখ। বসন্ত উৎসবের আর মাত্র দু'দিন বাকি। গ্রামের রীতি হল প্রত্যেকটি বাড়ীর গৃহস্থালী এই সময় ভালোভাবে ঝাড়ামোছা করা। চ্যাঙের স্ত্রী একজন আদর্শ গৃহিণী। অন্যান্য বারের তুলনায় এ বছর সে ঝাড়ামোছায় বেশী খাটছে। রান্নাঘরে উনুনের পিছনে বাঁশের চোঙটা নজর পড়তে সেটাকে নামিয়ে উনুনের মধ্যে রেখে ও ঘরদোর পরিষ্কার করতে লাগল।

নয় বছরের ছোট একটি নাতি আছে চ্যাঙের। নাম তার সিয়াও কাঙ। গত বছর থেকে ও স্কুলে যাচ্ছে। গণমুক্তি ফৌজের সৈনিকদের সবাইকে স্কুলের ছেলেরা কাকা বলে ডাকে। তাদের কাছ থেকে শিক্ষা নেবার একটা প্রেরণা ছেলেরা সবাই পেয়েছে। সিয়াও কাঙও তাই এখন একটা বন্দুক বানাতে চায়। শুধু বন্দুকের নল তৈরী করার জন্যে একটা বাঁশের লম্বা নল ছাড়া আর সবই আছে। রান্নাঘরে ঢুকে সিয়াও —

কাঙ বাঁশের টুকরোটা দেখতে পেল। ঠিক এই মাপের জিনিসই ও খুঁজছিল। চোঙটা নাড়াতেই ভেতরে ঝম্‌ঝম্ শব্দ হল। উপুড় করতেই ভেতরের শীষ দুটো পড়ে গেল। কাঙ ভেবে দেখল ধান খুব দামী জিনিস, ফেলে দেওয়া যায় না। বীজগুলো কুড়িয়ে নিয়ে সে স্কুলে যাবার উৎপাদন ব্রিগেডের ধান মাড়ইয়ের উঠোনের ধানের স্তূপের মধ্যে ছুঁড়ে দিল।

চ্যাঙ সভা শেষ করে বাড়ি ফিরে ঘরদোর অতো ঝকঝকে দেখে খুব খুশী হয়ে স্ত্রীকে বলল, "সত্যিই তুমি আদর্শ গিন্নি, কোথাও একটা দাগ পর্যন্ত নেই।" প্রশংসায় খুশীতে গিন্নির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কিন্তু হঠাৎ চ্যাঙ আঁতকে উঠে বলল, "একি !" ভ্যাবাচাকা খেয়ে চ্যাঙের স্ত্রী ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল। "সেই বাঁশের চোঙটা কোথায় জান ?" চ্যাঙের কথা শুনেই তার স্ত্রী উনুনের উপরে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়ল। সে বুঝতে পারল জিনিসটা তার স্বামীর কাছে নিশ্চয় খুবই দামী। ঘর ঝাড়ার সময় ওটাকে নামিয়ে সে একবার উনুনের মধ্যে রেখেছিল মনে পড়ল। কিন্তু গেল কোথায় জিনিসটা ? স্বামীর অবস্থা তো প্রায় ক্ষিপ্ত। চ্যাঙ-এর স্ত্রীর বুকের ধুকধুকানি বেড়ে গেল। ভালো করে মনে করার চেষ্টা করতেই মনে পড়ে গেল যে সেই সময় সিয়াও কাঙ রান্নাঘরে একবার উঁকি দিয়েছিল। "সিয়াও কাঙ এদিকে আয় ! সিয়াও কাঙ।" সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে ডাক দিল।

ইতিমধ্যে সিয়াও কাঙ স্কুল থেকে বাড়ী ফিরে এসেছিল। বাড়ির পড়া শেষ করে বাঁশের চোঙটা নিয়ে বন্দুক তৈরী করতে সে ব্যস্ত। ঠাকুরমার ডাক শুনে একছুটে বাড়ির ভিতরে এল কাঙ। বাঁশের চোঙটা তার হাতে দেখে তার ঠাকুরমা সেটা নিয়ে চ্যাঙের হাতে দিল। চ্যাঙ আর্তনাদ করে উঠল—"এ কী ! চোঙের ভেতর কিছুই নেই।" জিজ্ঞাসাবাদের পর ব্যাপারটা বুঝতে পারল চ্যাঙ। ছয়—ছয়শো উৎকৃষ্ট ধানের বীজ নষ্ট হয়ে গেছে। চ্যাঙ রাগের চোটে বাঁশের চোঙটা ছুঁড়ে ফেলে দিল মাটিতে। চোঙটা মেঝেয় পড়ে গড়িয়ে যেতে ভেতর থেকে

দুটো সোনালী ধান বেরিয়ে এল। ছোঁ মেরে সেই ধান দুটো কুড়িয়ে নিয়ে বাঁশের চোঙটা মেঝেতে ঠুকলো—তাতে আরও চারটে ধান পাওয়া গেল, মোট ধানের একশো ভাগের একভাগ অর্থাৎ ছ'টা দানা পাওয়া গেল। এই মহামূল্যবান বীজ ছ'টি সযত্নে একটা কাঁচের শিশিতে ভরে শিশিটা একটা বাক্সে রেখে দিল সে।

ধান রুইবার সময় এসে গেল আবার। চ্যাঙ শিশিটা বাক্স থেকে বের করে বীজ ছ'টা নিয়ে জানালার ধারে রোদে দেয়। দুপুরের পরে রোদের তেজ ও তাপ কমে গেলে বীজগুলোকে আবার শিশিতে ভরে রাখে। একদিন সবে শিশিটা বাক্সে তুলে রাখতে যাচ্ছে এমন সময় বাইরে কে যেন ডাকল—"চ্যাঙখুড়ো তোমাকে ব্রিগেড অফিসে ডাকছে।" প্রয়োজনটা জরুরী। শিশিটা টেবিলে ফেলে রেখেই চ্যাঙ বেরিয়ে গেল।

একটু পরেই সিয়াও কাঙ ইস্কুল থেকে ফিরে এল। ছেলেরা একটা মুরগী পুষছে। সে রোজ খাঁচা খুলে মুরগীটাকে খাওয়ায়, আবার খাঁচায় ভরে রাখে। মুরগীটা সবে ডিম পাড়তে বসেছে। খাঁচার পাশে তার ছোট্ট মালিকটি হাজির আছে বুঝতে পেরে কঁক কঁক করে ডেকে উঠল। মনে হল বলছে, "আমাকে কিছু দানা দাও" বাড়িতে কেউই নেই। দানা দেবে বলে মুরগীটাকে কোলে নিয়ে সিয়াও কাঙ বাড়িতে ভিতরে এল। দরজায় চাবি দেওয়া। ফলে রান্নাঘরে ঢুকতে পারল না কাঙ। ঠাকুমাকে খুঁজতে ছুটে বেরিয়ে গেল। মুরগীটা ঘরের মেঝেতে ঘুরে ঘুরে এখানে ওখানে খুঁটতে লাগল, তার পরে উড়ে গিয়ে বসল টেবিলটার উপর। শিশিটায় এক ঠোক্কর দিতেই সেটা গড়িয়ে মেঝেয় রাখা একটা পাথরের গামলার ওপর পড়ে ভেঙ্গে চৌচির হয়ে গেল। বীজধান ছটা মেঝেতে ছড়িয়ে ওড়ল। মুরগীটা উড়ে মেঝেয় নেমে এসে ছ'বার খুঁটেই বুড়ো চ্যাঙের শেষ ছটা ধানের বীজও খেয়ে ফেলল।

বীজগুলো নিরাপদ জায়গায় রেখে আসেনি বলে ওদিকে বাইরে বেরিয়েও চ্যাঙের মন বাড়ীতেই পড়েছিল। ব্রিগেড অফিসের লোকটির সাথে কথাবার্তা শেষ হতেই চ্যাঙ বাড়ী ফিরে এল। ঢুকেই দেখল

মেঝেতে ভাঙ্গা শিশিটা পড়ে আছে। তখনও মুরগীটা খুঁটে খুঁটে খাচ্ছিল। রাগের চোটে মুরগীটাকে ধরে তরকারী কাটা ছুরিটার এক পোঁচেই ওটাকে চিরে ফেলল।

"মেরো না দাদু, মেরো না"—সিয়াও কাঙ চীৎকার করতে করতে ছুটে ঘরে ঢুকল। কিন্তু তখন আর কোন উপায় নেই। ডানা ঝাপটে চোখ বন্ধ করে একেবারে স্থির হয়ে গেল মুরগীটা। সিয়াও কাঙ রাগে দুঃখে মেঝেতে বসে গলা ছেড়ে কাঁদতে আরম্ভ করল। সিয়াও কাঙের ঠাকুমা ঘরে ঢুকে চ্যাঙের মৃত মুরগীটার পাকস্থলী হাতড়াতে দেখে অবাক হয়ে বলে উঠল, "ওটাতো ডিম দিচ্ছিল। ওটাকে মেরে ফেলা আর এক চুবড়ি ডিম ভেঙ্গে ফেলা একই কথা।" মুরগীটা হাতে নিয়ে ভেতর থেকে এক গুচ্ছ খুদে খুদে ডিম বার করে দেখিয়ে চ্যাঙের দিকে ফের রেগে বলল, "মারবার ইচ্ছে তো ডিম পাড়া শেষ করা পর্যন্ত তর সইল না।" একটু ভালো করে নজর দিয়ে কিন্তু একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করল চ্যাঙের স্ত্রী। লোকে মুরগী কেটে আগে পালক ছাড়ায়, তার পরে ভেতরের নাড়ি ভুঁড়ি বের করে। চ্যাঙ কিন্তু প্রথমেই পাকস্থলী কেটে বার করে তার মধ্যে হাতড়াচ্ছে। চ্যাঙ মুরগীটার পেটে দুটো ধান পেল, তারপর কণ্ঠনালী চিরে আরও চারটে ধানের দানা দেখতে পেল।

চ্যাঙ খুশীতে চেঁচিয়ে উঠল, 'পেয়েছি, পেয়ে গেছি।" বীজগুলো বার হতে দেখে চ্যাঙের স্ত্রী ব্যাপারটা বুঝতে পারল। মুরগী হারানোর আক্ষেপ দূর হল তার কিন্তু সিয়াও কাঙ তখনও কাঁদছে, "আমার মুরগী ফিরিয়ে দাও, ফিরিয়ে দাও……।"

চ্যাঙ মনে মনে ভাবল, সিয়াও কাঙ এখনও অবশ্য একেবারেই ছোট। তা হোক, আমাদের কাজ যে বিপ্লবের জন্যই, সেটা বুঝতে পারায় ওকে সাহায্য করা দরকার। চ্যাঙ নাতিকে বলল, "কাঁদিস না, সিয়াও কাঙ, আমি তোকে একটা গল্প বলি শোন।" সিয়াও কান্না থামালো কিনা সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করেই চ্যাঙ গল্প শুরু করল—

"বুঝলি কুড়ি বছর আগের কথা। তোর দাদু চেঙ পো জেন-এর

কাছ থেকে খাজনা দেবার শর্তে সোয়া তিন বিঘে জমি নিয়েছিল। চেঙ পো জেন ছিল হাড়কেপ্পন আর ভীষণ নিষ্ঠুর। এক বছর আমি ভালো সোনা ধানের বীজ রুয়েছিলাম, যে বীজে বিঘে প্রতি বিশ মণ ফসল হত। খাজনার জন্যে ধান দিয়েও তখন আমার নিজের জন্য কিছু ফসল থাকত। সেই বীজের খবর ছড়িয়ে পরতেই আশে-পাশের গ্রামে তোর গরীব কাকারা সেই বীজ পাল্টাপাল্টি করতে চাইল, আর তাতে আমারও কোন আপত্তি ছিল না। জমিদার কানাঘুষোয় একথা শুনতে পেয়েই গালাগালি দিল, "হারামজাদা, চুলোয় যা। ঐ হতভাগারা যদি বেশী ফসল কলায়, তাহলে ওরা আর আমার কাছ থেকে কর্জ করবে না। আমি আমার আশি ভাগ সুদ হারবো।" জমিদার ব্যাটার শয়তানির কোন সীমা ছিল না। আমার বাড়ীতে গোটাকয়েক গুণ্ডা পাঠিয়ে দিল। গুণ্ডাগুলো হুমকি দিয়ে বলল যে জমিদার আমার খাজনা বাড়িয়ে দেবে।"

সিয়াও কাঙের কান্না বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সে চোখ বড় বড় করে দাদুর দিকে তাকিয়ে আছে আর দাদু বলে চলেছে, "তোর দাদু তাদের নিজের অভিপ্রায় জানিয়ে দিতেই বদমাইশগুলো আমাকে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে গেল। বাড়ী খুঁজে আমাদের সমস্ত বাড়তি ফসল আর বীজধান নিয়ে গেল তারা। জমিদার আমাকে পুরো একটি রাত ঝুলিয়ে রেখে লাথি মারতে মারতে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বলল, 'একটা বোকা চাষা কিনা পাকা চাষী বনতে চায়! আহা! তুই খোয়াব দেখছিস যে রে!' আমিও এতো রেগে গিয়েছিলাম যে, পুরো একমাস অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। তারপর থেকেই তোর দাদু হাল ছেড়ে দিল, আর ভালো বীজ খোঁজা ও বন্ধ করে দিল।"

সিয়াও কাঙ বলল, "আমি বুঝতে পেরেছি দাদু।" চ্যাঙ বলে চলল, "বিপ্লবের পরে আমরা গরীব লোকেরা অনেক কিছু পাল্টে দিলাম, আর আমরা আমাদের দেশের মালিক হলাম। সভাপতি মাও-এর ডাকে আমাদের অবশ্যই সাড়া দিতে হবে, ভালো বীজ বাছাই করতে হবে এবং আরও ফসল ফলাতে হবে। এই দুটো বীজ খুবই

দামি। আমরা এগুলোকে পুঁতে যত্ন করে চাষ করব। তোরও কি এই ইচ্ছে নয়, সিয়াও কাঙ?" বালকটি বলল, "হ্যাঁ।"

বীজ রুইবার আগের রাত্রে চ্যাঙ সভাপতি মাও-এর শিক্ষা পড়ল, "পৃথিবীতে যা যথার্থ গণনীয় তা হল, বিবেক-বুদ্ধি এবং বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন হওয়ার বিষয়ে কমিউনিস্ট পার্টি বিশেষ মনোযোগী।" তার ছশো বীজ ছিল, আর এখন আছে মোট ছ'টা। বিশেষ যত্ন নিতে হবে এই বীজ কটার—চ্যাঙ ভাবল। রাতে ঘুমতে পারল না চ্যাঙ। এই মূল্যবান বীজগুলো কোথায় রুইবে এই চিন্তাই মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল। ভোর হবার আগেই ব্রিগেডের নেতার সঙ্গে যুক্তি করতে গেল। ব্রিগেডের নেতা একটি সদ্য জলছাঁচা পুকুরের উর্বর পাঁকমাটি দেখাল। এখানে পুঁতলে বীজগুলো শুরু থেকেই তেজী হয়ে উঠবে। সব বীজ ক'টি পোঁতা হল।

চ্যাঙ দিনে বারকয়েক পুকুরটায় গিয়ে দেখে আসত। দিনতিনেক পরে একটা, আরও দিনতুয়েক পরে আরও তিনটে অঙ্কুর দেখা দিল। কিন্তু বাকি তু'টো বীজ আর ফুটল না; মুরগীর পাকস্থলীর চাপে সে তু'টো নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। অতএব, মাত্র চারটে ধানের চারা বেরুল। চ্যাঙ চারা চারটের প্রচণ্ড যত্ন করতে লাগল। সে একটা ফুটো ঝুড়ি দিয়ে চারাগুলোকে ঘিরে দিল। গরুতে খেতে বা মাড়াতে পারবে না, অথচ রোদবৃষ্টি লাগবে। চ্যাঙ যথাসময়ে চারাগুলো তুলে অন্য জায়গায় রুয়ে দিল। দিনে দিনে চারাগুলো চড়চড় করে বেড়ে ওঠে আর বুড়োর বুক আহ্লাদে ভরে যায়।

একদিন তুপুরের পরে কমিউনের সব সভ্যরা তখন মাঠের কাজে গেছে। সিয়াও কাঙ বাড়ীর পড়া শেষ করে দাতুর চারাগুলো দেখতে গেল। দাতুর শোনা গল্প থেকেও শ্রেণীসংগ্রামের একটা ভালো ধারণা পেয়েছে সে। দাতুর এই গবেষণায় ও তাই খুব উৎসাহী। দিনের মধ্যে বারকয়েক চারাগুলোকে দেখে আসে। সিয়াও কাঙ সেদিন বিকেলে দেখল একটা লোক পুকুরটার কাছে ঘুর ঘুর করছে। সঙ্গে সঙ্গে ও সতর্ক হল। ওর দাতু আর শিক্ষকমশাই প্রায়ই বলেন কি না যে

শ্রেণীশত্রুরা চালের বাতায় ঝোলানো পিঁয়াজের মতো—তাদের শিকড় পাতা পচে গেলেও শাঁসটা বেঁচেই থাকে।

এক দৌড়ে পুকুর পাড়ে গিয়ে সিয়াও কাঙ দেখল যে, জমিদার চেঙ পো জেন পাড়ের চারধারে ঘাস কাটছে। গণকমিউন প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এই জমিদারটি হাড়মজ্জায় সাম্যবাদকে ঘেন্না করে। সাম্যবাদ মানে যে তার সর্বনাশ সে তা ভালোই বুঝেছিল। সে একথাও জানত যে বীজ বাছাই ভালো হলে যৌথ উৎপাদন বাড়বে। পুকুরে ধানের চারটে পুরুষ্টু চারা দেখে যেই না লোকটা কাস্তের কোপ মেরেছে, অমনি কার চীৎকার শোনা গেল, "খবরদার, নড়ো না।" লোকটা থমকে গেল। সিয়াও কাঙ তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ধাক্কা মারতেই জমিদারটা চিৎ হয়ে পড়ে গেল।

জমিদার উঠে বসে একটু হামাগুড়ি দিয়ে সিধে হয়ে দাঁড়াল। পরক্ষণেই ছুট লাগাল। ধানগাছগুলোর ক্ষতি দেখে ছেলেটা রেগে আগুন। চীৎকার করতে করতে জমিদারকে তাড়া করল। সিয়াও কাঙের চীৎকার শুনে আরও কিছু কমিউন সভ্য তাড়া করে এসে জমিদারকে ধরে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে ওখানেই সভা ডেকে তার কাজের নিন্দে করে তাকে পাহারাধীনে রাখার ব্যবস্থা নেওয়া হল। জমিদারের প্রতি আগেই চ্যাঙের ঘৃণা ছিল, এখন আবার তার সঙ্গে নতুন করে ঘৃণা যোগ হল। নাতিকে বলল, "সিয়াও কাঙ, পুরনো সমাজে শ্রেণীশত্রুরা বীজ বাছাই ও চাষের কাজে বাধা দিয়েছে এবং আজও তারা এখনো পর্যন্ত একবার মরণ কামড় দেবার চেষ্টা করছে। আমরা কোন দিনও যেন শ্রেণীসংগ্রাম ভুলে না যাই।" আর মাত্র দুটো ধানের চারা আছে। সেগুলোকে সোজা করে দাঁড় করিয়ে আরও কিছু সার দিয়ে চ্যাঙ আরও যত্নে তার এই মহামূল্যবান গাছ দুটি রক্ষা করতে প্রয়াসী হল।

দেখতে দেখতে দিন কেটে যায়। দুটো ধান গাছই ভালোভাবে বেড়ে উঠেছে। হেমন্তে ধান কাটার সময় ধান গাছ দুটো থেকে একশ' তিরিশ গ্রামেরও বেশী বীজ পাওয়া গেল।

কমিউনের পার্টি কমিটি চ্যাঙের কাজে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিল। পরের বছরে চ্যাঙকে একজন অভিজ্ঞ কমিউন সভ্য এবং কয়েকজন ইস্কুলের উঁচু ক্লাশের ছাত্র নিয়ে একটা "ধানচাষের পরীক্ষাদল" তৈরী করতে বলা হল। এই দলটি সেই বীজ রুইতে ও চাষ করতে হাড়ভাঙ্গা খাটল। ধানের ফুল আসতেই চ্যাঙ সঙ্কর ধান তৈরী করে চার বছরের মাথায় একটা নতুন ধান তৈরী করল যাতে বিঘে প্রতি একচল্লিশ মণেরও বেশী ধান ফলে। এই ধানের নাম দেওয়া হল "পয়লা নম্বর দেশপ্রেমিক।" ১৯৬৪ সালে পৌঁছে গোটা কমিউনই নতুন বীজটা ব্যবহার করতে শুরু করল আর আশেপাশের কমিউনগুলো থেকে লোক আসতে লাগল এই অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নেবার জন্য।

১৯৬৪ সালের শীতকালে কমিউন নেতা একদিন চ্যাঙকে মফঃস্বল শহরে "অগ্রবর্তী কৃষি-কর্মীদের" সভায় যেতে বলল। তাকে সেখানকার সভায় বক্তৃতা দিতে হবে। আগের রাতে সে আনন্দে ঘুমোতে পারল না, শুধু বিছানায় শুয়ে ছটফট করল। সে অনুভব করল যে সে যা করতে পেরেছে তা খুবই সামান্য আর সেইজন্যেই আরও ভালো বীজ বাছাইয়ের কাজে ও চাষ করার জন্যে তাকে আরও বেশী খাটতে হবে।

চাঙ যখন পরের দিন সভায় ঢুকল তখন সেখানে অনেক লোকের ভীড়। প্রত্যেকেই একটা ভালো সভা হবে—এই আশায় এসেছে। চ্যাঙ বসার আগেই একজন তাকে ডাকল। ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে পেল হুশি গণকমিউনের বাসিন্দা তার পুরনো বন্ধু চিন কেঙ তি। দু'বছরের ওপর দেখাই হয়নি ওদের। "এই যে, এদিকে চ্যাঙ ভায়া, তুমি নাকি বীজ তৈরীর একটা দারুণ কাজ করেছ শুনলাম।"

"আমি না। সভাপতি মাও ও গণকমিউনের সঠিক নেতৃত্বেই এটা সম্ভব হয়েছে। তাদের ছাড়া আমিই বেঁচে থাকতে পারতাম না।"

"খাঁটি কথা। পুরনো আমলে তুমি তো ভাল বীজ বাছাই করতে গিয়েই বিপদে পড়েছিলে। বেশ মনে আছে জমিদার কি ভাবে তোমাদের পরিবারকে প্রায় উৎখাত করে দিয়েছিল।"

পুরনো সমাজের কথায় জমিদারের সেই আগের বিদ্রূপের কথা

চ্যাঙের মনে পড়ে গেল। জমিদার তার পিঠের যেখানটায় লাথি মেরেছিল, সেই জায়গাটা আবার কনকনিয়ে উঠল। একই সঙ্গে ক্রোধ আর সুখের অনুভূতি জাগল চ্যাঙের মনে। সভায় কথা বলার পালা আসতে চ্যাঙ পুরনো সমাজে তার নিজের গল্প, খারাপ কৃষি উৎপাদন এবং গ্রামাঞ্চলের শ্রেণীসংগ্রামের কথা শোনাল। হাজারো বিষয়ে কথা বলার ছিল, কিন্তু বলতে বলতে এতই উত্তেজিত হয়ে গিয়েছিল যে সহজে আর ভাষা পাচ্ছিল না। অল্পক্ষণ চুপ করে থেকে সে শুধু উচ্চকণ্ঠে বলতে লাগল, "সভাপতি মাও দীর্ঘ দীর্ঘ দিন বেঁচে থাকুন।"

চ্যাঙ সম্পর্কে একথা কি সুন্দর খাটে :

রক্তসূর্য রাঙিয়ে দিল পথ ;
হৃদয় ঢেলে যত্ন নিল বীজে,
জনগণের সেবার ব্রতে প্রতিটি দিন
নিল অবিচল বিপ্লব-শপথ কঠিন।

অনুবাদ : সুজিৎ ঘোষ

একজন গরীব মানুষ



হু ইয়েপিন

হু ইয়েপিন (১৯০৫-১৯৩১) ফুজিয়ান প্রদেশের ফুকৌতে জন্ম গ্রহণ করেন। প্রথম তিনি পুরানো ধরণের একটি স্কুলে পড়াশুনা শুরু করেন। কিন্তু দরিদ্রের জন্য পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে বন্ধকী জিনিসের দোকানে শিক্ষা-নবিসী করতে থাকেন। পরবর্তী সময়ে তিনি সাংহাইতে চলে আসেন। সেখানে তিনি পুড়ং মিড্‌ল্ স্কুলে যোগদান করেন এবং তারপর তিয়ানজিনে নৌ-বাহিনীর একটি স্কুলে চলে যান। এর দু'বছর পর তিনি যেইজিং চলে আসেন। এখানে তিনি নতুন সাহিত্য আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন এবং ১৯২৪ সালে তিনি কবিতা, গল্প লিখতে আরম্ভ করেন এবং সাপ্তাহিক 'জনগণের সাহিত্য' সম্পাদনা করতে শুরু করেন; তাঁর প্রতিনিধি-স্থানীয় রচনা হচ্ছে "আমাদের সম্মুখে উজ্জ্বলতা বর্তমান।"

তিনি বামপন্থী লেখকদের চীনা লীগের কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য ও শ্রমিক-কৃষক-সৈনিক সমাযোজন সমিতির অধ্যক্ষ ছিলেন এই সমিতিগুলি নতুন সাহিত্যের উন্নতিকল্পে নিযুক্ত ছিল, মাত্র ২৬ বছর বয়সে, ১৯৩১ সালে কুওমিনটাঙ কর্তৃক সাংহাইর সংগুপ্তে তাঁর প্রাণদণ্ড হয়।

আজ দু'দিন হলো বো-তাও কোনো খাবার মুখে দেয়নি। মুক্তোর মতন স্বচ্ছ মেঘের পেছন থেকে সূর্য যখন উঁকি মারতে শুরু করে তখন সেই তৃতীয় দিনের প্রত্যুষে প্রবল ক্ষুধার অনুভূতি তাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দিল। ঠাণ্ডা, শক্ত বিছানার উপর সে চুপচাপ শুয়ে ছিল, বাইরের ন্যাড়া খেজুর গাছটার দিকে তার গোল, বসে-যাওয়া চোখ অদ্ভুত এক আলো নিয়ে তাকিয়ে ছিল। তার মন কিন্তু ব্যস্ত ছিল তার নিজের গাঁয়ের সুস্বাদু জিনিসগুলির ছবি আঁকতে—বাতাবি লেবু, আখ, আলু আর ডুমুর; নদীর তাজা রুই মাছ, ব্যাঙ্ আর চিংড়ি

মাছ, ড্রাগন-নৌকার উৎসবে ময়দা মাখা পদ্মফুলের বীজ সেদ্ধ ও মধ্য-শরতে দারুচিনির চন্দ্র-পিঠা……যা কিছু ভক্ষ্য তার প্রতিটির উপরই তার চিন্তা ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছিল। শুধু ভাবনা তার পাকস্থলীর গুড়গুড় শব্দ বন্ধ করতে পারে না, তার মন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রতিটি সুস্বাদু দ্রব্য দেখতে থাকে, কল্পনায় সেগুলিকে তার বিছানার পাশে টেবিলটিতে রাখে, সেটি অতিরিক্ত বোঝায় ভরে যাবার পর আর একটি টেবিল এনে তার উপরও খাবার রাখে এবং সেটি ভর্তি হতেই আর একটি টেবিল যোগ করার দরকার হয়। এইভাবে যখন ঘরের মধ্যে সুস্বাদু দ্রব্যে ঠাসা টেবিলের পর টেবিল খাবারের গভীর আর্তনাদে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে তখনি সে মনে মনে পছন্দসই—অবশ্য তার প্রিয়—খাবারের টুকরো তুলে নেয়, ধীরে ধীরে সে তার মুখের মধ্যে সেটি চালান করে দেয়, আর গলার মধ্যে নাবিয়ে দেবার আগে সে পরিপাটী করে সেটিকে চিবুতে লাগে……

"লজ্জাকর!" সে নিজের উপর না রেগে পারে না।

যখনই সে রাগ করে উঠল তখনি আবার তার চোখে পড়ল সেই পুরোনো ছেঁড়া-খোঁড়া শিলিংটি, আলগা ভাবে ঝুলে আছে কাগজের টুকরোগুলি, মনে হচ্ছে যে কোনো মুহূর্তেই তা খসে পড়তে প্রস্তুত। দেয়ালের কাগজও যেমন নোংরা আর তেমনি হলুদ হয়ে এসেছে, মরা মাছি আর মশার রক্ত লেপটে আছে। কোন অজানা লোক খেয়াল-খুশি মতন দেওয়ালের উপর লিখেছে, "সন্ন্যাসী পত্নী গ্রহণ করেছে," এবং "অমুক অমুক ব্যক্তি হচ্ছে জারজ।" কোন বাচ্চা বা হয়তো কোনো প্রাপ্তবয়স্ক লোক তার উপস্থিতির চিহ্ন রাখার জন্য এটা লিখে রেখেছে।

"সত্যি সত্যি, এটা কোনো মানুষের বাসযোগ্য জায়গা নয়," সে আবার ভাবল।

ধীরে ধীরে দয়ালু সূর্যের আলো গাছের মধ্য দিয়ে, চালের ঝুলে থাকা প্রান্তভাগ দিয়ে, জানালার জাফরির মধ্য দিয়ে তার গায়ের উপর বয়ে যেতে শুরু করে। মৃদু মন্দ বাতাসে ভেসে আসে শিশুর সতেজ গলায় পরিষ্কার গান, "ছোট্ট বোনটি আমার, এই তো জেগে ওঠার

সময়।" বো-তাও শোনে, আর ম্লান হাসির রাশি তার মুখের উপর জড়ো হয়। সে হুম্ করে বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠল, ঘরের কোণে ছিন্ন বই আর কাগজের স্তূপ থেকে একটি ছবি কুড়িয়ে নিল, ছবিটির নাম, 'পশ্চিম সরোবরের বসন্ত-সকাল', তারপর দরজা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে যায়।

গানটি যে গাইছে সে একটি ছোট্ট মেয়ে। স্কুলব্যাগ তার এক কাঁধে ঝুলে আছে, এইপথে সে তার ক্লাসে যাচ্ছে। মাস দুই আগে বো-তাও এই বাচ্চাটির প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়ে, সে কখনো কখনো মেয়েটিকে পোস্টকার্ড ছবি এইসব দিয়েছে। তাদের দুজনের মধ্যেকার ফাঁকটুকু ভেবে, এবং আরো একটা কারণে, সে দ্বিধা করছিল, তার মুখে ছিল লজ্জা আর অপ্রস্তুত মনোভাবের একটি অভিব্যক্তি। "যা আমি করতে চাই তা কিছুতেই হতে পারে না। এর চেয়ে নির্লজ্জ আর জঘন্য আর কী হতে পারে।" তবু তার খালি পাকস্থলীর ভেতরে অগ্নিময় জ্বলন্ত দহনের অনুভূতি ব্যাপক ধ্বংস সাধন করছে, তাকে করছে প্রলুব্ধ আর উত্তেজিত। সে বাচ্চাটির কাছে এগিয়ে যায়।

"দ্যাখো, দ্যাখো, ছোট লেই-টি আমার," তার হাতের ছবিটি দেখিয়ে সে বলল, "তুমি এটা পছন্দ করছ না?"

"দাও, দাও, ওটি আমাকে দাও," খুব খুশীতে ডগ্‌মগ্ হয়ে উঠে সে ছবিটির দিকে হাত বাড়িয়ে দাবী জানায়।

"ওখানে ঐ জায়গায় অমন উঁচু হয়ে রয়েছে কী?" বো-তাও মেয়েটির স্কুল-ব্যাগের বিশেষ জায়গা দেখিয়ে বলে।

"ও-গুলি তো পিঠে।"

"এই ছবিটি নিয়ে ও-গুলি আমাকে দেবে?" ভয়ে ভয়ে সে জিজ্ঞেস করে।

"বেশ তাই হোক্ না কেন।" মেয়েটি খুশীতে নাচতে নাচতে চলে গেল।

হাতের মুঠোর মধ্যে পিঠেগুলি ধরে বো-তাওর নিজেকে খুব ঘৃণার যোগ্য বলে মনে হলো। অতিশয় লোভীর মতন পিঠেগুলি গোগ্রাসে

গিলতে গিলতে নিজেকেই সে বলে ওঠে, "কী নীচু আর জঘন্য কাজ! একি ভাষায় বলা যেতে পারে! ছোট্ট একটা শিশুর সকাল বেলার জল খাবার ভুলিয়ে-ভালিয়ে নেওয়া!" ক্ষুদে পিঠেগুলি দুই পাটি দাঁতের মাঝের জায়গাটুকুন সামান্যই ভর্তি করতে পেরেছিল, আর খুব তাড়াতাড়ি সবগুলি হজম হয়ে গেল। তার খালি পেট আগের থেকে যেন আরো অনেক বেশী খালি করে দিয়ে গেল। মনে হল অগ্নিবৎ জ্বলন্ত ক্ষুধা লেলিহান অগ্নিশিখায় পরিণত হয়ে প্রচণ্ডতায় ফেটে পড়বে। অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ব্যাপার এটি। এটা তো লোকমাত্রেই ভাবে যে আদৌ কোনো কিছু না খাওয়ার থেকে কিছু তো খাওয়া ভালো! তবু অসহ্য খিদের জ্বালা তার অবস্থা আগের থেকে অনেক অনেক মন্দ জায়গায় নিয়ে আসে, তাকে যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট করে। ক্লান্তিকর পাণ্ডুবর্ণ তার উদ্‌ভ্রান্ত মুখমণ্ডল আরো আরো অনুজ্জ্বল করে তোলে। তার ঠোঁট দুটি কেঁপে কেঁপে ওঠে। সারা শরীর যেন থর্ থর্ করে কাঁপে……

"আমি তো অনাহারে মরতে পারতাম," ভীষণ ক্ষেপে গিয়ে সে নিজেকেই নীরবভাবে বলে।

সেই ছোট্ট মেয়েটির কণ্ঠস্বর দূরে কোথায় যেন মিলিয়ে গেছে। ছোট্ট গলিটাতে লোকের ভিড় বাড়ার সাথে সাথে সূর্যের আলো অপরিমিত উষ্ণতায় জমির উপর যেন গালচের আচ্ছাদন বিস্তার করে।

"আমি কিছু লজ্জাজনক কাজ করে ফেলেছি। কিন্তু, হায়, এটা কী ধরনের দুর্ভাগ্য? এই রকম একটা মানুষে আমি পরিণত হলাম, তাই...." একটা ভয়ানক চাপা সুরে সে যোগ করে, "কোন সন্দেহ নেই, আজ আমি মরীয়া, কিছু একটা করবই, শুধু একটা মাত্র সাহসী কাজ··· একটা কিছু···আমি অবশ্য···"তখনো সে কাঁপছে, যেন তার কোন দিশা নেই, সে বড় রাস্তার দিকে যায়।

অন্য একটা গলির দিকে বাঁক নিতেই, একটা ছাই-গাদার পিছন থেকে লাফ মেরে বেরিয়ে এল মোটা কালো রং-এর একটি পাগ্-কুকুর*। তার মোটা গলায় বেড় দিয়ে বাঁধা ছোট ঘন্টি থেকে টনটন শব্দ হচ্ছিল।

* ভোঁতামুখো বামনাকৃতি বুলডগ-জাতীয় কুকুর।

কুকুরটি বো-তাওকে লক্ষ্য করে গোঁ গোঁ শব্দ করতে শুরু করল। আবার লাঞ্ছিতের নিপীড়িতের একটি গভীর ক্রোধও বো-তাও অনুভব করতে লাগল।

"মানুষগুলি এত বেশী বড়লোক-ঘেঁষা যে তাদের পোষা কুকুরগুলিও বড়লোক-ঘেঁষা চালবাজের দল। বাস্তবিকই এটা হচ্ছে একটা চালবাজদের দুনিয়া।"

ছোট্ট কুকুরটি তার পায়ে পায়ে এগিয়ে আসে, বিরক্তিজনকভাবে ততক্ষণই ঘেউ ঘেউ করে চলে যতক্ষণ না শেষ অবধি তার ধৈর্য হারায়। একটা ভাঙা ইঁট কুড়িয়ে নিয়ে সে তার গায়ের সমস্ত শক্তিটুকুন উজাড় করে পাগ্‌টার দিকে ছুঁড়ে মারে। একটি উজ্জল গাঢ় লাল রং-এর গেটের উপর গিয়ে ইঁটটি সশব্দে পড়ে। এই অপ্রত্যাশিত ফলটিতে কিন্তু বো-তাও কোনো না কোনোভাবে কিছুটা সুখবোধ করে। কেননা ঐ গেটের মধ্যে যারা বাস করে তারা হলো ধনীলোক, খিলানের নীচের পথ দিয়ে লম্বা কালো জামা পরা রাঁধুনী প্রায়ই ভারী ভারী খাদ্যের ঝুড়ি বয়ে নিয়ে যায়—শূকর আর ভেড়ার মাংসের বড় বড় মোটা পিণ্ড, রসালো সাদা পাখ্‌না ছাড়ানো মুরগী আর পাতিহাঁস, এছাড়াও কত সব সুস্বাদু খাদ্যদ্রব্য। যে মানুষ দুদিন পেটে কিছু দেয় নি সেই মানুষটাকে বিশ্বাস করাতে এগুলিই তো যথেষ্ট বড় প্রমাণ যে ভেতরের ঐ সুখী বড়লোক মানুষগুলি অবিসংবাদিতভাবে তার শত্রু।

"গ্‌র্‌র্‌র্‌⋯...." ছোট্ট কুকুরটি দু'পায়ের ফাঁকে লেজ খাড়া করে দূর থেকে তার উদ্দেশ্যে গোঁ-গোঁ-শব্দ করে চলে, বো-তাও কিন্তু ইতিমধ্যেই পাগ্-কুকুরটির কথা ভুলে গেছে। তার ভাবনাচিন্তাগুলি একইভাবে শূকর, ভেড়া, হাঁস, মুরগী, আরো সব খাদ্যদ্রব্যের উপরই ক্রমান্বয়ে ঘুরপাক খেয়ে যাচ্ছিল, কিছুতেই সে ভুলতে পারছিল না ঐ সব খাদ্যদ্রব্যের সৌরভ। আবার সে গভীর যন্ত্রণায় বিদ্ধ হয়ে টের পেল তার খালি পেটের কথা, তার দুপায়ের দুর্বলতার কথা।

"কী করব আমি? এ কী ভীষণ ক্ষুধা!" রাস্তা ধরে সে হাঁটতে থাকে, মাথা নীচু করে ভেবে যাচ্ছিল সে।

ঠাণ্ডা শরতের বাতাস তার বুকে এসে বিঁধছিল। সে খানিকটে কেঁপে উঠল। "কী শীত রে বাবা আর কী রাক্ষুসে ক্ষুধা।"

সেই মুহূর্তে কিছু একটা কঠিন জিনিস তাকে ধাক্কা দিল। আর সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ জোরে একটি কণ্ঠস্বর চীৎকার করে ওঠে, "দ্যাখো, দ্যাখো, কোথায় চলেছে লোকটা।"

সে চোখ তুলে তাকিয়ে দেখে তার গায়ে গায়ে লেগে দাঁড়িয়ে আছে চোদ্দ পনের বছর বয়সের একটি অল্পবয়সী ছোকরা, তার চোখে বিরাগ আর ক্রোধ।

"তোমার কী ব্যাপার বলো তো?" ছোক্‌রাটি জিজ্ঞেস করে। "দ্যাখো কী করেছ তুমি?" সে মাটির উপর পড়ে থাকা পিঠে আর ভাজা রুটি দেখিয়ে বলে।

"কী শয়তান···" বো-তাও বিস্ময়ে হতবাক্‌।

ছোকরাটি গলা ফাটিয়ে চীৎকার করে, "আমাকে ক্ষতিপূরণ দাও।"

"গরীব মানুষের কপাল সব সময়ই পোড়া।" বো-তাও ধীরে ধীরে হাঁটতে থাকে। ছোক্‌রা ছুটে গিয়ে বো-তাওর লম্বা সূতীর জামা চেপে ধরে। বেশ কিছুকাল হলো বো-তাওর জামা ধোয়া হয় নি। "পালিয়ে যাচ্ছ, এঁ্যা?" ছোকরা চীৎকার করে। "ও-সব হবে না, আমার পাঁচ পাঁচটি পিঠে আর রুটি তোমাকে ফিরিয়ে দিতেই হবে।"

"যাও যাও।" শেষ অবধি বো-তাও রাগে ফেটে পড়ে। সে প্রচণ্ড জোরে ছোকরাটিকে ঠ্যালা মারে, ধীরে ধীরে সে তার নিজের পথে চলতে থাকে।

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে হামাগুড়ি দিয়ে ছোকরা কাদামাটি লাগা পিঠে আর ভাজা রুটি কুড়িয়ে নিতে থাকে। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে সে শাপ-শাপান্ত করে, "নরকে ঠাঁই হবে তোমার.... একটা দস্যু কোথাকার!"

কিছুক্ষণ 'দস্যু' শব্দটি বো-তাওর দুকানের পর্দায় বেজে চলে। 'দস্যু' শব্দটির নানা অর্থের স্বাদ নিতে নিতে সে নিজের মনেই বিড়বিড়

করে ওঠে। এটি তার মাথায় নিয়ে আসে সম্পূর্ণ পৃথক একটি জীবনের অর্থ। ধীরে ধীরে তার ক্লান্ত চোখের সামনে এসে উপস্থিত হয় বিশাল জনবসতিশূন্য এক বন। সেখানে বসে জনা কুড়ি বেপরোয়া লোক স্ফূর্তি করছে, পান করছে, ধূমপান করছে। তাদের পাশে স্তূপাকারে সাজানো সোনা আর রূপা। শূকর, ভেড়া, মুর্‌গী, হাঁস এগুলি সম্বন্ধে তো বলার কিছু নেই -- যেমন খুশী মারতে পারে, রান্না করে পেটের মধ্যে চালান করে দিতে পারে। কুয়াশা ঢাকা এক চন্দ্রালোকিত রজনীতে বো-তাও এইসব সাহসী লোকগুলির সঙ্গে ওত পেতে লুকিয়ে বসে থাকে লম্বা লম্বা ঘাসের ঘন জঙ্গলে। সে তাক্‌ করে তথাকথিত মর্যাদাপূর্ণ সরকারী কর্মচারী বা ধনীদের একজনকে, তাব দিকে সে গুলি ছোঁড়ে··· দ্রুম্‌!······আর তারপর···তারপর···

ভাবনার মধ্যে এমন নিবিড়ভাবে ডুবে গিয়েছিল সে যে মনে মনে না হেসে পারে না। কিন্তু এর পরে আর একটা মধুরতর পরিস্থিতিতে পা ফেলার জন্য ভাবনাটিকে বয়ে নিয়ে যাবার ক্ষমতা তার ছিল না।

'দস্যু!' সামনের দিকে লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে সে। মনে তার গর্ব আর সন্তোষ। তার পদক্ষেপ এখন অনেক বেশী দৃঢ় আর নিশ্চিত।

তার নাসারন্ধ্রে সেঁকা মিষ্টি আলুর উগ্র সৌরভ পাঠিয়ে ছোট ধূসর বর্ণের একটি মালবাহী গাড়ী সামনের দিকে গড়িয়ে গড়িয়ে চলে গেল। মনের মধ্যে তার যে-ছবিটি তৈরী হচ্ছিল সেটি সেই মুহূর্তে নষ্ট হয়ে গেল।

"ম্‌ম্‌....সুস্বাদু!" আবার সে তার জঠর-জ্বালার তীব্রতা অনুভব করে।

"আজ আমি অবশ্যই দুঃসাহসিক কিছু একটা করব।" সে ভাবে, "শুধু একটা জিনিস, একটা···" এরপরই তার অন্তর বিরক্তিতে ভরে ওঠে, সে যায় রেগে।

"একটা জিনিসই হোক্‌! শুধু একটা জিনিস!" সে তার মন ঠিক করে ফেলল। আবার সন্তোষ আর গর্বের একটি বোধ তার

হৃদয়ের কানায় কানায় ভরে ওঠে। সে সাহসে বুক বেঁধে বড় বড় পা ফেলতে থাকে। এবারে যেদিক থেকে সে এসেছিল সেদিকেই চলতে থাকে।

অল্পক্ষণের মধ্যে সে তার নিজের ঘরে ফিরে আসে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে সে গভীরভাবে ভাবতে লাগল: কত শক্তিশালী, মহানুভব আর সুখী হবে সে। এই ভাবনার সাথে সাথে জোরে শব্দ করে হেসে উঠল সে।

হঠাৎ দোরগোড়া থেকে একটি কণ্ঠস্বর এসে তার হাসি দমিয়ে দেয়, "আপনি কি ভেতরে আছেন?"

বো-তাও জানে এ তার নিঃস্ব, দুঃস্থ বাড়িওয়ালীর গলা। সেই নিঃসঙ্গ পাকা-চুল বুড়ি এসেছে তার কাছে ঘর-ভাড়া চাইতে।

"এসো এসো, ভিতরে এসো", সে ডাকে।

দরজা থেকেই বুড়ি জিজ্ঞেস করে, "মিঃ চেন্, আজ কি আমায় কিছু টাকা দিতে পারবেন?"

"প্রচুর," বো-তাওর কণ্ঠে বেজে ওঠে অতিবিশ্বাস আর আত্ম-পরিতোষের সুর।

বুড়ির চোখে মুখে সন্দেহ আর বিস্ময়। তবু সে হাসিমুখেই বলে, "তা হ'লে তো খুবই ভালো। আমাকে তাহ'লে দয়া করে কিছু দিন। আজ আমাকে অতি অবশ্য ময়দা কিনতে হবে। আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে।"

"সে আর বলতে! যাবো আর টাকা নিয়ে আসব।" তখনো বো-তাওর মুখে কিছু আগের সেই আগ্রহভরা চাউনি।

"তাই বুঝি? তাহ'লে আনবেন আপনি?" একটু বুঝি অল্পক্ষণের জন্য বুড়ির দ্বিধা আসে। "তাহ'লে যান তাড়াতাড়ি ক'রে। হে স্বর্গের অধিপতি, পেটভরার জন্য কিছু না কিছু খাদ্য দরকার আমার। এটা তো একেবারে নিশ্চিত।"

"ঠিক আছে, ঠিক আছে।" বো-তাও দৃঢ়ভাবে বলে, তার সেই গলার স্বরে কোথায় যেন মিশে রয়েছে কিছুটা গর্ব, অহমিকা। বুড়িকে

ছুঁয়ে সে তাড়াতাড়ি সহজ স্বচ্ছন্দ গতিতে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বার হয়ে যায়।

"সেই ঘৃণ্য জুয়াচোর দুরাত্মার কাছে এখনও আমি তিন-মাসের ঘর-ভাড়া পাই," প্রতিবারই বুড়ি বো-তাওর পিছনে ফেলে যাওয়া ছিন্ন বইগুলির স্তূপের দিকে তাকিয়ে অভিশাপ বর্ষণ করে চলে।

অনুবাদ : সিদ্ধার্থ সাহা